পোকা-মাকড়

পোকা-মাকড়

—(*)—

স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়

তৃতীয় সংস্করণ

প্রকাশক
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড্, এলাহাবাদ

১৩৪৩

উৎসর্গ

পরম সাহিত্যানুরাগী

লালগোলাধিপতি

রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ

রায় বাহাদুরের

শ্রীকরকমলে

নিবেদন

পুস্তকখানি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিয়াছি, এজন্য যে-সকল পোকা-মাকড় আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই তাহাদেরি জীবনবৃত্তান্ত ইহাতে বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রাণীদের শ্রেণী-বিভাগ করিবার চেষ্টা ইহাতে আছে, কিন্তু পাছে বইখানি নীরস হয় এই ভাবিয়া বিশেষ শ্রেণীবিভাগে দৃষ্টি রাখি নাই।

যাহাদের জন্য পুস্তকখানি লিখিয়াছি, তাহারা পুস্তকপাঠে আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিলে ধন্য হইব।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, শান্তিনিকেতন,
আশ্বিন, ১৩২৬। } শ্রীজগদানন্দ রায়

দ্বিতীয় সংস্করণ

চারি বৎসর পরে "পোকা-মাকড়ের" দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইল। পুস্তকখানি আমাদের বালক-বালিকা ও সাধারণ পাঠকদিগের নিকটে আদর পাইয়াছে দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি।

পুস্তকখানি তাড়াতাড়ি ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে প্রথম সংস্করণে যে সকল ক্ষুদ্র ত্রুটি ছিল, বর্ত্তমান সংস্করণে তাহা সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন,
ফাল্গুন, ১৩৩১

শ্রীজগদানন্দ রায়

সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক

বিষয় | পত্রাঙ্ক

সপ্তম শাখার প্রাণী

পোকা-মাকড়

—— ০ঃ-ঃ০ ——

প্রথম কথা

আমরা যে-সকল বস্তু দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি জড় এবং বাকি সকলি জীব। জড় ও জীব ছাড়া আর কোনো নূতন জিনিস এই পৃথিবীতে নাই এবং পৃথিবীর বাহিরেও নাই।

বাড়ী-ঘর, পাহাড়-পর্ব্বত, জল-বাতাস এবং মাটি এগুলি জড়। গাছ-পালা. মানুষ-গোরু. পোকা-মাকড়, ইহাদের সকলেই জীব।

আমাদের মনে হয়, যাহারা নড়াচড়া করে না, তাহারাই বুঝি জড় এবং যাহারা চলাফেরা করে, তাহারাই জীব। কিন্তু এই কথাটা ঠিক নয়। যাহারা বাহির হইতে খাদ্য জোগাড় করিয়া নিজেদের দেহ পুষ্ট করে এবং শেষে সন্তান উৎপন্ন করিয়া মরিয়া যায়, এক কথায় বলিতে গেলে

তাহারাই জীব। পশু-পক্ষী, গাছ-পালারা দেহের এক-একটা অংশ দিয়া বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে; আর একটা অংশ দিয়া তাহা পরিপাক করিয়া বড় হয়; তার পরে কেহ ফুল, কেহ বীজ, কেহ ছোটো ছোটো শাবক উৎপন্ন করিয়া মরিয়া যায়। কাজেই, এইগুলিকে জীবের কোঠায় ফেলিতে হয়। মাটি, পাথর, সোনা, রূপা ইত্যাদি আহার করে না, দেহ পুষ্ট করে না, ফল-ফুল বা সন্তান-সন্ততি উৎপন্নও করে না,—কাজেই, এইগুলি জীব নয়,—ইহারা জড়।

আমরা এই পুস্তকে জড়ের কথা বলিব না এবং গাছ-পালা প্রভৃতি যে-সকল জীবকে উদ্ভিদ্ বলা হয়, তাহাদের কথাও আলোচনা করিব না। পোকা-মাকড় ইত্যাদি যে-সকল ছোটো জীবকে আমরা প্রাণী বলি, কেবল তাহাদেরি ক্রমে পরিচয় দিব।

প্রাণীর সংখ্যা

পৃথিবীতে কত রকমের প্রাণী আছে, তোমরা বলিতে পার কি? তুমি হয় ত অনেক ভাবিয়া কুকুর, ঘোড়া, বেজি, কাঠবিড়াল, ব্যাঙ্ প্রভৃতি পঁচিশ-ত্রিশ রকম প্রাণীর নাম করিতে পারিবে। কিন্তু পঁচিশ, পঞ্চাশ বা একশত রকম প্রাণী লইয়া এই পৃথিবী নয়। লোকে যতই খোঁজ করিতেছে, ততই নিত্য নূতন প্রাণীর সন্ধান পাইতেছে। ইংলণ্ড দ্বীপটি কত ছোটো, তাহা তোমরা জান। আমাদের রাজপুতানার চেয়ে ইহা বড় নয়। সেখানে ভয়ানক শীত; আবার শীতকালে বরফ পড়ে। ছোটো প্রাণীরা এই রকম শীতে বাঁচিতে পারে না। কিন্তু তথাপি সেই ছোটো দেশের শীতের মধ্যেও চারি-শত বাষট্টি রকমের পাখী দেখা যায়। সমস্ত পৃথিবীতে অন্ততঃ দশ হাজার রকমের পাখী আছে।

মাছ, ব্যাঙ্, সাপ, গোরু, বানর, মানুষ, এই সব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড অর্থাৎ শির-দাঁড়া আছে। বিছা, কেন্নো, জোঁক, প্রজাপতিদের মেরুদণ্ড নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পৃথিবীতে মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণীই অন্ততঃ পঁচিশ হাজার রকমের আছে।

আমরা হয় ত রুই, কাত্‌লা, কই, মাগুর প্রভৃতি আট-দশ রকম মাছের কথা জানি, কিন্তু পণ্ডিতেরা দেশ-বিদেশে

সন্ধান করিয়া প্রায় আট হাজার রকম মাছের সন্ধান পাইয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকেরই আকার-প্রকার, আহার-বিহার স্বতন্ত্র।

গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসিলে, কত কীট-পতঙ্গ আলোর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহাদের মধ্যে কোনোটা বড়, কোনোটা নিতান্ত ছোটো, কোনোটা কালো, কোনোটা সবুজ, কোনোটা উড়িয়া বেড়ায়, কোনোটা বা লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। আমরা হয় ত ইহাদের দুই-একটির নাম জানি। কিন্তু এই হাজার হাজার রকমের পোকা কোথায় থাকে, কি খায়, কি রকমে জীবন কাটায়, পণ্ডিতেরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া ঠিক করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীতে অন্ততঃ চারি লক্ষ রকমের কীট-পতঙ্গ আছে।

আমরা এখানে কেবল কয়েকটিমাত্র প্রাণিজাতির সংখ্যার কথা বলিলাম। প্রত্যেক জাতিতে প্রাণীরা সংখ্যায় কিপ্রকারে বাড়িয়া চলে, তাহার কথা শুনিলে তোমরা আরো অবাক্ হইয়া যাইবে।

মানুষ খুব বুদ্ধিমান্ প্রাণী; সে বুদ্ধির জোরে অন্য প্রাণীদের উপরে ক্ষমতা দেখায়। কিন্তু তথাপি সাপ, ব্যাঙ্, ফড়িং যেমন এক-একটি বিশেষ জাতীয় প্রাণী, মানুষ তাহার বেশি আর কিছুই নয়। পৃথিবীতে মোট একশত সত্তর কোটি মানুষ আছে। এই কয়েকটি মানুষের মাথা গুঁজিয়া

রাখার জন্য পৃথিবীতে অতি অল্প জায়গারই আবশ্যক হয়। তাই সমুদ্রের উপরে, মরুভূমিতে, মেরুদেশের শীতে এবং আফ্রিকা ও আমেরিকার গভীর জঙ্গলে মানুষ ইচ্ছায় বাস করে না। কিন্তু ঐ-সকল জায়গায় অন্য প্রাণীর অভাব নাই। সেখানকার দু'হাত জমিতে হাজার প্রাণী দেখা যায়। পৃথিবীর জল, স্থল, আকাশ সকলি ছোটো বড় নানা প্রাণীতে পূর্ণ। সমুদ্রের তল এবং পর্ব্বতের গুহা—যেখানে সূর্য্যের আলো কোনো কালে প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানেও অসংখ্য প্রাণী বাস করে। আমাদের সমুদ্রগুলির গভীরতা গড়ে প্রায় আড়াই মাইল। তিন মাইল এবং সাড়ে তিন মাইল গভীর জলের তলে যে-সকল অদ্ভুত প্রাণী আছে, তাহার কথা চল্লিশ-পঞ্চাশখানা বড় বড় বইয়ে লেখা হইয়াছে।

প্রাণীর বংশবৃদ্ধি

যে হারে প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি হয়, তাহাও বড় অদ্ভুত। হাতী ঘন ঘন সন্তান প্রসব করে না। দশ বৎসর অন্তর ইহাদের এক-একটি শাবক হয়। একজন হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, পৃথিবীতে যদি কেবল এক জোড়া হাতী থাকিত, তবে তাহাদের বাচ্চায় এবং বাচ্চাদের বাচ্চায় মিলিয়া সাড়ে সাত শত বৎসরে পৃথিবীতে উনিশ লক্ষ হাতী হইয়া দাঁড়াইত। মাছের বংশ-বিস্তার আরও বেশি। আট-দশ সের ওজনের মাছ পৃথিবীর নদী-সমুদ্রে, খালে-বিলে যে কত আছে, তাহা ঠিক করা যায় না। হয় ত তোমাদের পুকুরেও খুঁজিলে দুই-চারিটি পাওয়া যায়। এই রকম মাছ বৎসরে প্রায় নব্বই লক্ষ ডিম ছাড়ে। একসের আধ-সের ওজনের মাছের কুড়ি হাজার হইতে সাতচল্লিশ হাজার পর্য্যন্ত ডিম হয়। ছোটো ইঁদুর তোমরা দেখিয়াছ। লেপ, বালিশ, কাগজপত্র সকলি কাটিয়া ইহারা ঘরে মহা উৎপাত করে। ইহাদের বংশবৃদ্ধির কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইবে। বৎসরে ইহারা ছয়-সাত বার শাবক প্রসব করে এবং এক-একবারে ইহাদের ছয়টি হইতে উনিশটি পর্য্যন্ত বাচ্চা হয়। বাচ্চা ছোটো অবস্থায় মারা গেলে, কখনো কখনো মাসে মাসেই ইহারা গড়ে দশ-বারোটা বাচ্চা প্রসব করে।

খরগোসের বাচ্চাও বড় কম হয় না। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি সাদা খরগোস পুষিয়া থাক, তবে হয় ত তাহা স্বচক্ষেই দেখিয়াছ। বৎসরে ইহারা চারিবার শাবক প্রসব করে এবং প্রতিবারে প্রায় ছয়টা করিয়া বাচ্চা হয়।

এই ত গেল বড় জানোয়ারদের কথা। ছোটো প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি আরো অধিক হয়। পতঙ্গ খুব ছোটো প্রাণী; ইহারা যেমন বেশি আহার করে, তেমনি বেশি সন্তান প্রসব করে। গোলাপ ফুলের গাছে এবং কফি প্রভৃতি তরকারির গাছে যে এক রকম ডানা-ওয়ালা সবুজ ছোটো পোকা হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। বর্ষার শেষে এবং ফাল্গুনের সন্ধ্যায় এই পোকাদের উৎপাতে ঘরে আলো জ্বালা দায় হয়। দেওয়ালির রাত্রিতে ইহারা আলোকের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া দীপের শিখায় পুড়িয়া মরে। হক্স্লি সাহেব হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন,—এই পোকার একটিতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন করে, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে তাহারা গ্রীষ্মের তিন-চারি মাসে চীন দেশের জনসংখ্যার সমান হইয়া দাঁড়ায়। পৃথিবীর সকল দেশের চেয়ে চীন দেশে বেশি লোক বাস করে। চীনে এখন প্রায় চল্লিশ কোটি লোকের বাস। একটা পোকায় যদি এত সন্তান প্রসব করিতে পারে, তবে তোমাদের বাগানের সমস্ত পোকারা মোট কত পোকা জন্মায় বলিতে পার কি? ইহার হিসাবই হয় না। তার পর মনে রাখিয়ো,—পৃথিবীতে যে কেবল তোমাদেরি বাগান

আছে তা নয়। কত দেশের কত লক্ষ লক্ষ বাগানে ও কত বন-জঙ্গলে, কোটি কোটি সবুজ পোকা আছে, তাহাদেব প্রত্যেকটি ঐ-রকমে সন্তান জন্ম দিয়া যাইতেছে।

মাছিরা গ্রীষ্মকালে কি-রকম উৎপাত করে, তাহা তোমরা জান। একটু বিশ্রাম করিতে গেলে মুখে চোখে ও কানে বসিয়া বিরক্ত করে, আহারের সময়ে খাবারের উপবে বসিয়া উৎপাত করে। ইহারা যে পরিমাণে সন্তান জন্মায় তাহাও অদ্ভুত। একটিমাত্র মাছি গ্রীষ্মের কয়েক মাসে এত ডিম প্রসব করে যে, সেগুলি হইতে নূতন মাছি জন্মিয়া পুত্র-পৌত্রাদিতে এক বৎসরে পাঁচ শত কোটি হইয়া দাঁড়াইতে পারে। পাখীদের বংশবৃদ্ধিও বড় অল্প নয়। এক জোড়া পাখী যদি চারিটি করিয়া শাবক শত্রুর হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে, তবে পনেরো বৎসর পরে তাহাদেরি বংশে দুই শত কোটি পাখী হইয়া দাঁড়ায়।

এত প্রাণী কোথায় যায়?

তোমরা বোধ হয় এখন মনে করিতেছ, যদি প্রাণীদের সত্যই এই প্রকারে বংশবৃদ্ধি হয়, তবে পোকা-মাকড় ইঁদুর, বিছে, ব্যাঙ, হাতী, ঘোড়াতে আজও পৃথিবী পূর্ণ হয় নাই কেন? এই রকম প্রশ্ন মনে হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু ইহার উত্তর কঠিন নয়। তোমরা যদি একটু খোঁজ কর, তবে দেখিবে,—যে-প্রাণী অধিক সন্তান প্রসব করে, তাহার সন্তান-গুলির অধিকাংশই বড় হইবার পূর্ব্বে নানা রকমে মরিয়া যায়। সবুজ-পোকারা কত বেশি সন্তান উৎপন্ন করে তাহা তোমরা শুনিয়াছ। সেই সকল সন্তানদের অধিকাংশই অন্য পোকা এবং পাখীরা খাইয়া ফেলে; পরে কতক আবার শীতে, রৌদ্রে, বৃষ্টিতে ও ঝড়ে নষ্ট হইয়া যায়। এই প্রকার ক্ষয়ের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের অনেকেই জলে বা আগুনে পড়িয়া মারা যায়; শেষে দেখা যায়, মোটের উপরে পোকার সংখ্যা বাড়ে নাই,—পুরানো পোকার দল মরিয়া গেলে, তাহাদের জায়গা পূরণ করিবার জন্য যতগুলি নূতন পোকার দরকার, কোটি কোটি নূতন পোকার মধ্যে কেবল ততগুলিই বাঁচিয়া আছে। কেবল সবুজ-পোকাদের মধ্যেই যে ইহা দেখা যায় তাহা নয়। এক-একটা মাছে কত ডিম প্রসব করে, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। প্রত্যেক ডিম হইতেই যদি

মাছ জন্মিত, তাহা হইলে পৃথিবীর নদী, সমুদ্র, খাল, বিল এক বৎসরেই মাছে পূর্ণ হইয়া যাইত। তোমরা জলে ডুব দিয়া যে স্নান করিবে, তাহারও উপায় থাকিত না। কিন্তু তাহা দেখা যায় না। ডিমের অধিকাংশই জলে থাকিয়া নষ্ট হইয়া যায়; কাজেই, সেগুলি হইতে মাছ জন্মে না। আবার ডিম ফুটিয়া যে ছোটো ছোটো মাছ বাহির হয়, তাহাদেরও সকলগুলি শেষ পর্য্যন্ত বাঁচে না। নানা রকম বড় মাছ এবং অন্য জলচর প্রাণীরা সেগুলিকে খাইয়া ফেলে। শেষে দেখা যায়,—মোটের উপরে মাছের সংখ্যা বাড়ে নাই।

এত প্রাণিহত্যা কেন হয় ?

পৃথিবীতে প্রাণিশূন্য স্থান নাই ; জল, স্থল, আকাশ সকলি প্রাণীতে পূর্ণ। তবুও বিধাতা যে কেন এই প্রকারে বহু প্রাণীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দেন, তাহা হঠাৎ বুঝা যায় না। কিন্তু তোমরা যদি একটু চিন্তা করিয়া দেখ, তাহা হইলে বিধাতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। বিধাতা নিষ্ঠুর নয়,—সমস্ত প্রাণীর মঙ্গলের জন্যই জন্ম-মৃত্যু পৃথিবী জুড়িয়া চলিতেছে।

জল, বাতাস ও মাটির সার অংশ খাইয়া গাছপালা বাঁচিতে পারে, কিন্তু প্রাণীরা তাহা পারে না। তাহাদের বাঁচিয়া থাকার জন্য লতাপাতা চাই, পোকা-মাকড় চাই এবং কাহারো কাহারো জন্য মাংসও চাই। অধিকাংশ পাখীই কীট-পতঙ্গ খাইয়া বাঁচে। বাঘ, সিংহ ইত্যাদির প্রধান খাদ্য মাংস। কাজেই, বংশ-রক্ষার জন্য যত নূতন কীট-পতঙ্গের দরকার, ঠিক্ ততগুলি সন্তানই যদি জন্মিত, তবে পাখীরাই সেগুলিকে খাইয়া শেষ করিয়া দিত,—ইহাতে কীট-পতঙ্গের বংশ লোপ পাইয়া যাইত। ইহা নিবারণের জন্যই কীট-পতঙ্গের দল অসংখ্য ডিম্ব প্রসব করিয়া অসংখ্য নূতন পতঙ্গ উৎপন্ন করে। ইহাতে পাখীরা পেট ভরিয়া খাইতে পায়, অথচ আহারের পর, যে-সকল নূতন পতঙ্গ অবশিষ্ট থাকে, তাহারাই বংশ রক্ষা করে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পতঙ্গদের বংশ-রক্ষা হউক, বা না হউক, তাহাতে পৃথিবীর কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—ঐ আপদ্‌গুলা সমূলে মরিয়া গেলেই ভালো। কিন্তু যিনি জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি এই কথা ভাবেন না,—তিনি অতি ছোটো প্রাণীর বাঁচিয়া থাকার জন্য যেমন ব্যবস্থা করেন, খুব বড় বড় বুদ্ধিমান্ প্রাণীদের জন্যও সেই রকম ব্যবস্থা রাখেন। সিংহ বা ব্যাঘ্র সংসারের কি উপকার করে, জানি না। কিন্তু মানুষের ন্যায় সিংহ-ব্যাঘ্রেরাও জগদীশ্বরের সৃষ্ট প্রাণী। মানুষের যদি পৃথিবীতে থাকিবার দাবী থাকে, তবে বাঘ, ভালুক, সিংহেরও দাবী আছে। খুঁটি পুঁতিয়া, প্রাচীর উঠাইয়া পৃথিবীর জমি ভাগ করিয়া মানুষ বলে,—এই জমি আমার, এই দেশের রাজা আমি। সিংহের দল যদি জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া বলিতে আরম্ভ করে,—এই জঙ্গল আমাদের, ইহাতে মানুষের কোনো দাবী নাই; তবে তাহা-দিগকে অপরাধী করা যায় না। সকল প্রাণীই বিধাতার স্নেহের পাত্র। সিংহ-ব্যাঘ্র, লতাপাতা বা ফলমূল খায় না, দুর্ব্বল পশুদের মাংসই ইহাদের প্রধান খাদ্য। কাজেই, সিংহ-ব্যাঘ্রের খাদ্যের আয়োজন এবং তাহাদের বংশরক্ষার উপায় বিধাতাকে করিতে হয়; আবার ইহাও তাঁহাকে দেখিতে হয়, যেন এই সকল বলবান্ প্রাণীর উৎপাতে দুর্ব্বলেরা হঠাৎ প্রাণ হারাইয়া নির্ব্বংশ হইয়া না যায়। এই দুই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য দুর্ব্বল প্রাণীরা যাহাতে বহু সন্তান প্রসব করে,

জগদীশ্বর তাহার বিধান করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যে সকল দুর্ব্বল প্রাণীরই বংশ রক্ষা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। প্রবলের উৎপাত অধিক হওয়ায় এবং আবহাওয়ার সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে না পারায়, অনেক দুর্ব্বল প্রাণী নির্ব্বংশ হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাণিহত্যার অন্য কারণ

প্রাণীদের ঐরকম জন্ম-মৃত্যুর ইহাই একমাত্র কারণ নয়। যে-সকল পণ্ডিত প্রাণীদিগের জীবনের ব্যাপার লইয়া অনেক পরীক্ষা ও চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে এই সম্বন্ধে আর একটি কথা শুনা যায়। তোমাদিগকে তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি। তাঁহারা বলেন,—আজকাল আমরা যেমন কোনো প্রাণীকে বুদ্ধিতে, কাহাকে দেহের শক্তিতে, কাহাকে আবার চতুরতায় প্রধান দেখিতে পাইতেছি, প্রথম সৃষ্টির সময়ে তাহাদের কেহই এই সকল গুণ লইয়া জন্মে নাই। জগদীশ্বর প্রথমে কোটি কোটি প্রাণী সৃষ্টি করিয়া এই পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে খাবার লইয়া, আরামের সামগ্রী ও বাসস্থান লইয়া তাহাদের মধ্যে ঘোর মারামারি হানাহানি হইয়াছিল। এই যুদ্ধে যাহারা একটু বুদ্ধি খাটাইয়া বা নানা রকম ফন্দি আঁটিয়া জিতিতে পারিয়াছিল, তাহাদেরই বংশধর যুগযুগান্তর ধরিয়া সেই সকল গুণের উন্নতি করিতে করিতে, এখন প্রাণীদের মধ্যে প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা হারিয়া আসিতেছিল, তাহাদেরই বংশধর এখন নিকৃষ্ট প্রাণী।

এখন সেই নিকৃষ্ট প্রাণীরা প্রবলের নিকটে হার মানিয়াই জীবন শেষ করিতেছে, অথবা পৃথিবী হইতে তাহাদের বংশলোপ হইতেছে। সুতরাং বলিতে হয়, ক্ষুদ্র প্রাণীদের জন্ম এবং তাহাদের পরস্পরের মারামারি হানাহানি প্রাণি-জাতিকে মোটামুটি উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্যই হইয়াছে।

প্রাণীদের উন্নতি

যে কথাগুলি বলিলাম, বোধ হয় তাহা তোমরা ভালো করিয়া বুঝিলে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে তোমাদের স্কুলে পুরস্কার দেওয়া হয়। ক্লাসে ছেলে অনেক, সকলেই পুরস্কার পাইবার জন্য পরিশ্রম করে। শেষে তোমাদের মধ্যে যে তিন চারিটি ছেলে পরীক্ষায় সকলকে হারাইয়া বেশি নম্বর রাখে, তাহারাই পুরস্কার পায়। মনে কর, তোমাদের স্কুলের নিয়ম হইল,—ভালো-মন্দ প্রত্যেক ছেলেই পুরস্কার পাইবে এবং লোকে সকলকেই আদর করিবে। এই অবস্থায় তোমরা কি করিবে, ভাবিয়া দেখ দেখি। তখন তোমরা কেহই পরীক্ষায় ভালো হইবার জন্য চেষ্টা করিবে না; তোমাদের মনে হইবে, যখন সকলেই সমান পুরস্কার ও সমান আদর পাইতেছে, তখন মিছামিছি খাটিয়া কষ্ট পাই কেন?

আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক। চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিলে মানুষ জীবনে সুখ পায় না। সকলকেই খাটিয়া টাকাকড়ি, মানসম্ভ্রম ও বিদ্যাজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হয়। যে যত বুদ্ধি করিয়া খাটিতে পারে, সে জীবনে ততই সুখী হয়। মনে কর, পৃথিবীটা এমন হইয়া গেল, যেন, লোকজনের খাওয়া-দাওয়া ও সুখভোগের ভাবনা থাকিল

না—যখন যেটি দরকার তাহা ভগবানের আদেশে হাতের গোড়ায় ও মুখের উপরে আসিতে লাগিল। তখন পৃথিবীর এই লোকগুলা কি করিবে, বলিতে পার কি? ঘুমাইয়া, গড়াগড়ি দিয়া, হাঁই তুলিয়াই জীবন কাটাইবে না কি? তখন কলকারখানা ট্রাম্-রেলওয়ে, স্কুল-কলেজ, সকলি বন্ধ হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় মানুষ একেবারে মাটি হইয়া যাইবে, তখন দুই পা চলিয়া বেড়াইতে বা একটু নড়িয়া বসিতেও তাহাদের কষ্ট হইবে।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে, যে-সকল জিনিস পাইলে মানুষ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইতে পারে এবং মনের সুখ পাইতে পারে, তাহা সহজে হাতের গোড়ায় পাওয়া যায় না। এই জন্যই লোকে যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখে, জ্ঞান-বুদ্ধির উন্নতি করে। তাহার পর যে দেশের লোক পরিশ্রম ও বুদ্ধির বলে, শিল্পের বলে এবং টাকার জোরে বড় হয়, সেই দেশই পৃথিবীতে সম্মান পায়।

মানুষের সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা বলিলাম, ছোট প্রাণীদের সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা চলে। পৃথিবীর উপরে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পোকা-মাকড় চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকেও মানুষের মত চেষ্টা করিয়া খাবার জোগাড় করিতে হয়। বলবান্ শত্রুরা যখন তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তখন জোর দেখাইয়া বা কৌশল করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। তা-ছাড়া সন্তানদিগকে বাঁচাইয়া

রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় এবং মাথা গুঁজিবার মত বাসা না থাকিলে নিরাপদ জায়গায় বাসা প্রস্তুত করিতে হয়। তোমাদের ঘরের কোণে বা বাগানের গাছের ডালে মাকড়সারা কত কষ্ট করিয়া জাল বুনে, তাহা অবশ্যই দেখিয়াছ. ক্ষুধা লাগিলেই যদি মোটা মোটা মাছি ও পোকা আসিয়া মাকড়সার কাছে ধরা দিত, তাহা হইলে কোনো মাকড়সা কি জাল পাতিয়া মাছি ধরিতে যাইত? কিন্তু কোনো মাছিই মাকড়সার কাছে ধরা দিতে চায় না; তাই তাহারা মাকড়সা দেখিলেই কৌশলে পলাইয়া যায় এবং মাকড়সারা আরো কৌশল খাটাইয়া জালের ফাঁদ পাতে ও সেই ফাঁদে মাছিদিগকে ফেলিয়া খাবারের জোগাড় করে।

ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিবে, মাকড়সার জাল বুনিবার কৌশল এবং মাছির সতর্কভাবে চলাফেরার অভ্যাস, পরস্পরকে হারাইয়া দিবার চেষ্টা হইতে জন্মিয়াছে। ইহা যেন তোমাদের ক্রিকেট খেলা। তুমি চাও, তুমি যাহাতে “আউট্” না হও, আর তোমার বন্ধু চায়, তোমাকে “আউট্” করিতে। দুই দশ দিন এই প্রকারে খেলা করিতে করিতে তুমি “বল্” মারিবার কৌশল এমন সুন্দর শিখিয়া যাও যে, কেহ তোমাকে সহজে “আউট” করিতে পারে না; সঙ্গে সঙ্গে তোমার বন্ধুও “বল্” দিবার এমন কৌশল শিখিয়া যায় যে, সে একজন পাকা “বোলার” হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা হউক, আমরা মাকড়সা ও মাছি সম্বন্ধে যে-কথা

বলিলাম, পৃথিবীর অনেক প্রাণীর সম্বন্ধেই সেই কথা বলা খাটে। শত্রুকে হারাইয়া নিজের ও সন্তানদের জীবন রক্ষা করিতে হইবে বলিয়াই উঁচু গাছের পাতার আড়ালে পাখীরা ক্রমে এমন বাসা বাঁধিতে শিখিয়াছে। শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই শামুক ও কচ্ছপের শরীর কঠিন আবরণে ঢাকা থাকে এবং ছুঁচোর গায়ে এমন বিশ্রী দুর্গন্ধ মাখানো থাকে। আবার আর এক দিকে দেখ, —বড় বড় প্রাণীদিগকে মারিয়া আহার করিবার জন্য বাঘ, ভালুক ও সিংহের মুখে এমন ধারালো দাঁত এবং থাবায় এমন ছুঁচলো নখের সৃষ্টি হইয়াছে।

কেবল শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং খাবার সংগ্রহের জন্যই যে, প্রাণীরা এইরকম বিচিত্র আকার পাইয়াছে, তাহা নয়। বাসের জায়গা লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইলে অনেকে দেহের পরিবর্ত্তন করিয়া ধীরে ধীরে নানা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। গ্রামে বসতি বেশি হইলে বা সেখানে চোর-ডাকাতের উৎপাত ঘটিলে লোকে কি করে, তোমরা অবশ্যই জান। তখন লোকে গ্রাম ছাড়িয়া নদীর ধারে, মাঠের মধ্যে নূতন বাড়ী-ঘর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। ক্রমে দূরদূরান্তর হইতে আরো লোকজন আসিয়া সেখানে বাড়ী করে। ইহাতে এক নূতন গ্রামের পত্তন হইয়া যায়। ছোট প্রাণীদের মধ্যে বাসস্থানের এই প্রকার নড়াচড়া যে কত দেখা যায়, তাহা বলিয়া শেষ করা

যায় না। জলেই প্রথম প্রাণীর জন্ম হইয়াছিল। তার পরে সমুদ্রের ও নদীর জল এককালে যখন প্রাণীতে প্রাণীতে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তখন জলের প্রাণী ডাঙায় আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শামুক, গুগ্‌লি জলের প্রাণী, যখন তাহারা নানা কারণে জলে টিঁকিয়া থাকিতে পারিল না, তখন তাহাদেরি মধ্যে কতকগুলি ডাঙায় আসিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে আরম্ভ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দেহেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। আমরা এখন যে-সকল ডাঙার শামুক দেখিতে পাই, তাহারা জলের শামুকদেরই জ্ঞাতি। আবার ডাঙায় থাকিয়া আত্মরক্ষা করা যাহাদের কঠিন হইয়াছিল, তখন তাহারা স্থলের প্রাণী হইয়াও জলে আশ্রয় লইয়াছিল। তিমি মাছ ইঁহাদের একটা উদাহরণ। ইহারা গোড়ায় স্থলচর প্রাণী ছিল। যাহাদের জলে বা স্থলে কোনোখানেই থাকার সুবিধা হইল না,—তাহারা উভচর হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাঙ্, কচ্ছপ এবং আরো অনেক প্রাণী উভচর। ইহারা সুবিধামত কখনো জলে এবং কখনো স্থলে বাস করিয়া বাঁচিয়া আছে। যে সকল দুর্ব্বল প্রাণীর উপরে শত্রুর উৎপাত বেশি ছিল, তাহারা জলের উপরে বা ডাঙায় প্রকাশ্যভাবে বাস করিতে পারে নাই,—সমুদ্রের পাঁকের তলায় কিংবা অন্ধকার পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় লইয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এই সকল প্রাণীর সন্তান-সন্ততি এখন অনেক আছে,—সমুদ্রের

উপরকার জলে বা ডাঙ্গায় তাহারা বেড়াইতে পারে না,—সূর্য্যের আলো তাহাদের সহ্যই হয় না।

এপর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা হইতে তোমরা বোধ হয় বুঝিয়াছ—জগদীশ্বর যে কোটি কোটি প্রাণীর জন্ম দিয়া জলে, স্থলে, আকাশে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহারা দলে দলে মরিয়া নির্ব্বংশ হউক, ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। স্থান লইয়া, খাদ্য লইয়া ও আবাস লইয়া পরস্পরের মধ্যে কাটাকাটি মারামারি চলুক, এবং সকলে এই লড়াইয়ে যোগ দিয়া পরস্পরকে উন্নত করুক, এবং যাহারা এই লড়াইয়ে যোগ দিবার অনুপযুক্ত, কেবল তাহারাই মরুক্—ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। এই লড়াইয়ে যোগ দিয়া কিছুকাল জিতিয়াছিল বলিয়াই, পিপীলিকা ও মৌমাছিরা এত বুদ্ধিমান্।

প্রাণীদের দেহের বৃদ্ধি

ছেলেবেলায় যখন তোমাদেরি মত ছোট ছিলাম, তখন কেবলি মনে হইত—বাগানে ঐ যে ছোট চারা গাছটি পুঁতিয়াছিলাম এবং খাঁচায় ঐ যে পাখীর বাচ্চাটি রাখিয়া যত্ন করিতেছিলাম,—দুই মাস পরে তাহারা এত বড় হইল কেন? মনের এই প্রশ্নটির উত্তর তখন কাহারো কাছে পাই নাই,—হয় ত কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস হয় নাই। তোমাদের মধ্যে কাহারো কাহারো মনে হয় ত এই রকম প্রশ্ন উপস্থিত হয়। তাই কোন্ কোন্ সামগ্রী দিয়া প্রাণীদের শরীর গড়া হইয়াছে, এবং দিনে দিনে তাহারা কি প্রকারে বাড়ে, তাহার একটু পরিচয় দিব।

মাটি দিয়া পুতুল গড়া হয়, ইট-কাঠ, চূণ-বালি দিয়া ঘর-বাড়ী গাঁথা হয়। যে জিনিস দিয়া গাছপালা এবং প্রাণীদের দেহ প্রস্তুত, তাহাকে কোষ বলে। ইট-কাঠের আকৃতি হাতে নাড়িয়া চাড়িয়া এবং চোখে দেখিয়া আমরা সহজে জানিতে পারি। কিন্তু প্রাণীদের শরীরের কোষ এত ছোট যে, তাহা খালি-চোখে দেখা যায় না; দেখিতে হইলে খুব বড় অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। তোমরা হয় ত মনে করিতেছ,

কোষগুলির আকার ইটের মত চৌকা রকমের, না হয় ভাঁটার মত গোল; কিন্তু তাহা নয়। দেহের সকল জায়গার কোষের আকৃতি একই রকম হয় না। চৌকা, লম্বা, গোল, চেপ্টা সকল রকমের কোষই প্রাণীর শরীরে আছে। মানুষের গায়ের মাংসপেশীর কোষ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কি রকম দেখায়, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। দেখ, এই কোষ লম্বা। তার পরের ছবিটি প্রাণীর লিভার অর্থাৎ যকৃতের কোষের আকৃতি। যকৃতের কোষগুলি যেন মৌমাছির চাকের এক একটা কুঠারি। কোষের আকৃতি কত বিচিত্র হয়, ছবি দুইটি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে।

১ম চিত্র

ছবির প্রত্যেক কোষের মধ্যে তোমরা এক একটি কালো বিন্দু দেখিতে পাইবে,—ইহাকে কোষ-সামগ্রী বলে। কিন্তু ইহাই কোষের একমাত্র বস্তু নয়। ঐ জিনিসটাকে ঘিরিয়া আর একটি বস্তু থাকে, ইহাকে জীব-সামগ্রী বলে। প্রাণী ও গাছপালার শরীরে ইহাই সজীব দ্রব্য। যাহা

আমাদের খুব আদরের ও কাজের জিনিস, তাহাকে আমরা অনেক যত্ন করিয়া রাখি; সর্ব্বদা ভয় হয়, পাছে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। প্রাণীর দেহের সেই ছোট কোষের ভিতরকার কোষ-সামগ্রী এবং জীব-সাগ্রীর মত আদরের দ্রব্য আর নাই। এইগুলিই প্রাণীকে বাঁচাইয়া রাখে। তাই যাহাতে হঠাৎ নষ্ট না হয়, তাহার জন্য ঐ দুইটি জিনিসের চারিদিক্ প্রায়ই খুব মজবুত প্রাচীর দিয়া ঘেরা থাকে। ছোট কৌটার মধ্যে যেমন তোমরা সোনার আংটি সাবধানে রাখিয়া দাও, কোষ-সামগ্রী কোষের প্রাচীরের মধ্যে ঠিক সেই প্রকার সাবধানে থাকে। এই ব্যবস্থায় বাহিরের আঘাত কোষের ভিতরকার আসল জিনিসটাকে নষ্ট করিতে পারে না। আমরা কোষের যে নানা আকৃতির ছবি দিয়াছি, তাহা কোষ-প্রাচীরেরই ছবি। কোষ-সামগ্রী অতি ছোট এবং তরল জিনিসের মত। আমিবা প্রভৃতি এক-কোষ প্রাণীর কোষে কিন্তু কোষ-প্রাচীর দেখা যায় না।

এখন প্রাণীদের শরীর কি রকমে বৃদ্ধি পায়, তাহা বলিব। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রাণিদেহের কোষ-সামগ্রী যখন পুষ্ট হইয়া পড়ে, তখন তাহা একটি কোষের মধ্যে আটক থাকিতে চায় না। এই অবস্থায় তাহা আপনা হইতেই দুই ভাগে ভাগ হইয়া পড়ে। এই রকমে গোড়ার একটি কোষ দুইটি হইয়া দাঁড়ায় এবং পরে সেই দুইটি কোষই বড় হইয়া চারিটি হয়। প্রাণীরা যতদিন সবল থাকে, ততদিন এই

প্রকার নূতন নূতন কোষ জন্মে। কাজেই, প্রাণীর দেহের বৃদ্ধি হইতে থাকে। নূতন ইট-কাঠ জুড়িলে যেমন ছোট ঘর বড় হয়, দেহে নূতন নূতন কোষ জড় হইলে ঠিক সেই রকমেই দেহ বড় হইয়া পড়ে। কিন্তু এই রকম নূতন কোষ-সৃষ্টির একটা সীমা আছে। তাই প্রাণী বা গাছপালার দেহ কিছু দিন বাড়িয়াই আর বাড়ে না। ঐ রকম কোষ-সৃষ্টি যদি বুড়া বয়স পর্য্যন্তই চলিত, তোমরা তাহা হইলে একটা ছোট পোকাকে হাতীর মত বড় হইতে দেখিতে।

অতি সংক্ষেপে তোমাদিগকে দেহের বৃদ্ধির কথা বলিলাম। কিন্তু প্রাণিদেহের বৃদ্ধির ইহাই কারণ। মাতার গর্ভে যখন সন্তান জন্মে এবং ডিম হইতে যখন শাবকের সৃষ্টি হইতে থাকে, তখনো গোড়ার একটি কোষই নিজেকে ভাঙিয়া চুরিয়া ঐ প্রকারেই কোটি কোটি নূতন কোষের উৎপত্তি করে। শেষে সেইগুলিই পৃথক্ হইয়া গিয়া সন্তানের হাড়, রক্ত, মাংস ইত্যাদির সৃষ্টি করে।

কোষ-সামগ্রী কোন্ কোন্ পদার্থ দিয়া প্রস্তুত, তাহা জানা গিয়াছে। তাহা কি প্রকারে পুষ্ট হয়, কোন্ শক্তিতে তাহা আপনা হইতেই ভাঙিয়া চুরিয়া পৃথক্ কোষের সৃষ্টি করে, এই সকল বিষয়ে বড় বড় পণ্ডিতেরা বড় বড় কথা বলিয়াছেন ; কিন্তু ঠিক ব্যাপারটি কি, তাহা আজও স্পষ্ট জানা যায় নাই। তা-ছাড়া গাছপালা ও প্রাণীরা পূর্ণ আকার পাইলে, তাহাদের দেহে কেন আর নূতন কোষের সৃষ্টি হয় না, তাহাও ভালো

করিয়া জানা যায় নাই। এই সকল শক্ত বিষয়ের কোনো কথা তোমাদিগকে এখন বলিব না। তোমরা বড় হইয়া যখন জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে বড় বড় বই পড়িবে, তখন এই সম্বন্ধে অনেক খবর পাইবে।

প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ

সংসারের জিনিস-পত্র ঠিক গুছাইয়া না রাখিলে, কোনোটাই কাজের সময়ে হাতের গোড়ায় পাওয়া যায় না। তখন বড় মুস্কিলে পড়িতে হয়। মনে কর, যেন তোমাদের রান্নাঘরের হাতা-বেড়ি, ভাণ্ডার-ঘরের চালদালের পাত্র, শুইবার ঘরের বিছানা-বালিশ এবং পড়িবার ঘরের কাগজ-পত্র, সকলি এলোমেলো করিয়া একটি ঘরে গাদা করিয়া রাখা হইয়াছে। এই অবস্থায় কোনো একটা জিনিস খুঁজিতে গেলে অনেক সময় কাটিয়া যায়। বামুন ঠাকুর হাঁড়িকুঁড়ি, চাল-দাল হাতের গোড়ায় না পাইয়া তখন চীৎকার আরম্ভ করে,—ঠিক সময়ে খাওয়া হয় না। পড়ার বই খুঁজিতে গেলে সমস্ত সকালটা কাটিয়া যায়,—তোমাদের পড়া তৈয়ারি হয় না। ঘুমাইবার সময়ে বালিশ-কম্বল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না,— তখন হয় ত ঘরের মেজের উপরে শুইয়াই রাত্রি কাটাইতে হয়। জিনিস-পত্র গুছাইয়া না রাখার এমনই বিপদ। তোমাদের বাড়ীতে কতগুলি বই আছে, তাহা জানি না। হয় ত দুই তিনটা আল্‌মারিতে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজি ভাষার গল্পের বই, ব্যাকরণ, অভিধান—কত কি আছে। এই সকল বই তোমরা যদি থাকে-থাকে আল্‌মারিতে সাজাইয়া না রাখ, তাহা হইলে কোনো একখানি বই খুঁজিতে গেলে

গোলযোগে পড়িতে হয় না কি? তখন একখানি সংস্কৃতের বই বাহির করিতে গেলে, হয় ত এক ঘণ্টা খুঁজিয়া মরিতে হইবে এবং শেষে অঙ্কের বইয়ের কাছে সেখানির সন্ধান পাইবে।

এই পৃথিবীতে নানা রকমের প্রাণী আছে। কাহারো দু'খানা পা, কাহারো চারিখানা পা, কাহারো কাহারো আবার ছ'খানা, আটখানা এবং একশতখানা পা; কাহারো আবার পা নাই, তাহারা বুকে হাঁটিয়া চলে। কেহ উড়িয়া বেড়ায়, কেহ জলে ডুব দিয়া চলাফেরা করে; কাহারো শরীরে হাড় নাই, কাহারো শরীর আবার হাড়ের মত শক্ত আবরণে ঢাকা। কাজেই, যাঁহারা প্রাণীদের শরীরের এবং তাহাদের জীবনের কথা জানিতে চাহেন, হাজার হাজার রকমের প্রাণীদের মধ্যে পড়িয়া তাঁহাদিগকে দিশাহারা হইতে হয়। তাই, কাজের সুবিধার জন্য আমরা যেমন ঘরকন্নার জিনিস-পত্র ও আল্‌মারির খাতা-পত্র রকমে রকমে সাজাইয়া রাখি, পণ্ডিতেরাও সেই প্রকারে শরীরের গঠন প্রভৃতি অনুসারে সমস্ত প্রাণীকে কয়েকটি বড় বড় দলে ভাগ করেন। কিন্তু এই রকমে ভাগ করিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন না। ইহার পরেও প্রত্যেক দলের প্রাণীদের শরীরের ছোটখাটো প্রভেদ এবং চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির খুঁটিনাটি, পার্থক্য জানিয়া লইয়া, তাঁহারা প্রত্যেক বড় বড় দলের প্রাণীগুলিকে আরো ছোট ছোট দলে ভাগ করেন।

একটা উদাহরণ দিলে প্রাণীদের বিভাগের কথা তোমরা ভালো করিয়া বুঝিবে।

মনে কর,—আমরা গোরুর শ্রেণী-বিভাগ করিতেছি। দেখিলেই বুঝা যায়, গোরুর দেহে শিরদাঁড়া অর্থাৎ মেরুদণ্ড আছে; সুতরাং গোরু যে, মেরুদণ্ডী প্রাণী, তাহা সহজেই স্থির হইয়া যায়। কিন্তু কেবল গোরুই মেরুদণ্ডী প্রাণী নয়,—সাপ, ব্যাঙ্, মাছ, বানর, মানুষ সকলের মেরুদণ্ড আছে। কাজেই, গোরু যাহাতে সাপ-ব্যাঙের দলে না পড়ে, তাহা দেখা প্রয়োজন হয়। এই জন্য ইহার জীবনের কাজ-কর্ম্ম ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল করিয়া দেখিতে হয়। গোরুর দেহ লোমে ঢাকা থাকে; ইহারা সাপ বা ব্যাঙের মত ডিম প্রসব না করিয়া শাবক প্রসব করে, এবং শাবকগুলিকে স্তনের দুধ খাওয়াইয়া বড় করে। অনুসন্ধান করিলে গোরুর এই সকল ব্যাপার আমাদের নজরে পড়িয়া যায়। সুতরাং গোরুকে স্তন্যপায়ী প্রাণী বলা যাইতে পারে,—কাজেই, ইহা মেরুদণ্ডীদের গণের স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণী হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এই বিভাগকেই শেষ বিভাগ করিলে চলে না। যাহাদের মেরুদণ্ড আছে, আবার যাহারা স্তনের দুধ খাওয়াইয়া শাবকদিগকে বাঁচায়, এই রকম প্রাণী গোরু ছাড়া আরো অনেক আছে। মানুষ, বানর, শূকর, বাঘ, ভালুক সকলেই এই রকম প্রাণী; সুতরাং গোরুর জীবনের আরো কিছু কিছু বিষয় জানিয়া তাহাকে মানুষ, বানর, বাঘ, ভালুক ইত্যাদি

হইতে পৃথক্ করা দরকার। গোরুরা কি রকমে খায় এবং কি রকমে খাদ্য চিবায়, মনে করিয়া দেখ। একগাদা টাট্কা ঘাস সম্মুখে রাখিলে গোরু তাহা পাঁচ মিনিটে খাইয়া শেষ করে, কিন্তু ইহাতে ঘাসগুলি পেটে যায় না। পেটের ভিতরে পাক-যন্ত্রের কাছে যে একটা থলি থাকে, উহা প্রথমে সেখানে জমা হয়। পরে গাছের ছায়ায় বা গোয়াল-ঘরে শুইয়া যখন গোরুরা ঝিমাইতে থাকে, তখন সেই ঘাসই আবার তাহাদের মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন উহারা সেই ঘাস অনেকক্ষণ ভালো করিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে। এই রকমে দ্বিতীয়বার চিবাইয়া গিলিলে খাদ্য পাকযন্ত্রে অর্থাৎ পেটে পেঁছে। এই প্রকার দ্বিতীয়বার চিবানোকে "জাবরকাটা" বলে,—ভালো কথায় তাহাকেই "রোমন্থন" করা বলা হয়। সুতরাং গোরু রোমন্থক প্রাণীদের বর্গে (Order) পড়ে। এই বর্গের প্রাণীদের পায়ের খুর জোড়া নয়। ঘোড়ার খুর জোড়া,—তাহারা গোরুদের মত জাবর কাটে না,—তাহারা যাহা খায় তাহা একবারে গিলিয়া পাকযন্ত্রে লইয়া যায়।

যাহা হউক, দেখা গেল—গোরু মেরুদণ্ডী, স্তন্যপায়ী এবং রোমন্থক প্রাণী। কিন্তু এই রকম ভাগ করাতেও গোরুর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না,—কারণ উট, হরিণ, মহিষ প্রভৃতি জন্তুরাও গোরুদের মত দুইবার গিলিয়া খায়। কাজেই, উট ও হরিণের সঙ্গে গোরুদের গোলযোগ বাধার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং আরো কোনো নূতন পরিচয়ে গোরুকে

ঐ সকল জন্তু হইতে পৃথক্ করা দরকার। এইরূপ স্থলে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাণীদিগকে এক একটা বিশেষ নাম দিয়া এই কাজটি শেষ করেন। তাঁহারা গোরুকে বৃষগোষ্ঠীর (Bos) অন্তর্গত করেন। এই রকমে প্রাণি-বিভাগে গোরুর সহিত আর কোনো জানোয়ারের মিল থাকিতে পারে না।

সুতরাং আমরা যে-রকমে গোরুর স্থান নির্দ্দেশ করিলাম, সেই অনুসারে গোরুরা মেরুদণ্ডীদের গণের স্তন্যপায়ীদের শ্রেণীতে পড়িল। তার পরে খাদ্য দুইবার গিলিয়া খায় বলিয়া ইহারা রোমন্থক প্রাণীদের বর্গে গেল এবং অন্য রোমন্থক প্রাণী হইতে পৃথক্ করিবার জন্য তাহাদিগকে শেষে বৃষ-জাতিতে ফেলা হইল।

কেবল গোরু নয়, সকল প্রাণীকেই বৈজ্ঞানিকেরা এই রকমে শরীরের মোটামুটি গড়ন দেখিয়া প্রথমে বড় বড় শাখায় ভাগ করেন। তার পরে তাহাদের চালচলন ও দেহের ভিতরকার কাজ খোঁজ করিয়া, সেইগুলিকেই আরো কতকগুলি ছোট ছোট দলে ফেলেন। ইহাতে প্রাণীদিগকে চিনিয়া লইয়া তাহাদের জীবনের সকল বিষয় সন্ধান করার সুবিধা হয়।

আমরা প্রাণীদের ছোট দলগুলির কথা বলিব না। পৃথিবীর সমস্ত পোকা-মাকড়কে কয়েকটি প্রধান শাখায় ভাগ করা হইয়াছে, তাহাদেরি অল্প পরিচয় দিব এবং সেই সকল শাখার যে প্রাণীদের সহিত তোমাদের জানাশুনা আছে, তাহাদের জীবনের কথা বলিব।

প্রথম শাখা

এক-কোষ প্রাণী

আমরা আগেই বলিয়াছি, জীব-মাত্রেরই শরীর কোষ দিয়া প্রস্তুত। একটি ছোট গাছের বা পিঁপড়ার মত একটি ছোট প্রাণীর শরীরে কোটি কোটি কোষ থাকে। এই সকল কোষের প্রত্যেকটি পুষ্ট হইয়া আপনা হইতেই ভাঙিয়া দুইটি কোষের উৎপত্তি করে। ক্রমে সেই দুইটি হইতে চারিটি এবং চারিটি হইতে আটটি ইত্যাদি করিয়া অসংখ্য নূতন কোষের সৃষ্টি হয় এবং ইহাতে পিঁপড়াটি পূর্ণাকার পায়। কিন্তু তোমরা যদি কোনো জন্তুর শরীর হইতে একটি কোষ পৃথক্ করিয়া পরীক্ষা কর, তাহা ঐ রকমে ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন কোষ প্রস্তুত করিবে না ; শরীর হইতে তফাৎ করিলেই কোষ সাধারণতঃ মরিয়া যায়।

আমরা যে প্রাণীদের কথা বলিব, তাহারা এক একটা কোষ লইয়াই জন্মে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের দেহে একটার বেশি কোষ থাকে না। ইহারাই সৃষ্টির সকল জীবজন্তুর আগেকার প্রাণী। ইহাকে ইংরাজিতে আমিবা (Amœba) বলে। বাংলায় ইহাদের নাম নাই ; আমরা উহাদিগকে এক-কোষ প্রাণী বলিব।

এক-কোষ প্রাণী ডাঙায় থাকে না; জলেই ইহাদের বাস। পুকুরের শেওলার গায়ে এক রকম আঠালো জিনিস লাগিয়া থাকে, ইহা বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। এই আঠালো জিনিসের মধ্যেই উহারা বাস করে। তা'ছাড়া নর্দ্দমা ও চৌবাচ্চার জলেও উহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, আজই চৌবাচ্চার ভিতরকার শেওলায় এক-কোষ প্রাণীদের খোঁজ করিবে এবং তাহাদিগকে পিঁপড়ের মত বা উকুনের মত বেড়াইতে দেখিবে। কিন্তু ইহারা সে-রকমের প্রাণী নয়। ইহাদের মুখ, চোখ, কান, মাথা, পা কিছুই নাই; তার উপরে আবার আকারে এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া একেবারে দেখাই যায় না। অণুবীক্ষণে ইহাদিগকে বেশ পরিষ্কার বাব্‌লার আঠার মত দেখায়, কেবল তাহারি মাঝে এক একটা গাঢ় জমাট রকমের অংশ নজরে পড়ে। বলা বাহুল্য, উহা আঠা নয়; পাখীর ডিমের ভিতরকার সাদা অংশটায় যে-সকল জিনিস থাকে, ইহা তাহা দিয়াই প্রস্তুত। প্রথমে দেখিলে এক-কোষ প্রাণীকে জীবিত বস্তু বলিয়া মনেই হয় না; অনেকক্ষণ পরে যখন তাহারা নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়, তখনি তাহাদিগকে প্রাণী বলিয়া বুঝা যায়। তোমরা যদি বাড়ীতে বসিয়া এক-কোষ প্রাণী দেখিতে চাও, তবে ছোটখাটো অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিয়ো।

এক-কোষ প্রাণীদের নড়াচড়া বড় মজার ব্যাপার।

আমরা চলিতে গেলে, পা দিয়া চলি ; সাপ ও কেঁচো বুকে হাঁটিয়া চলে। এক-কোষ প্রাণীদের পা, বুক, মাথা, পেট কিছুই নাই। জলের মধ্যে চলিতে গেলে, ইহারা শরীর হইতে আঙুলের মত কতকগুলি লম্বা অংশ বাহির করে এবং সমস্ত শরীরটাকে অতি ধীরে ধীরে সেই দিকে টানিয়া লইয়া যায়। যখন ইহাদের শরীর হইতে আঙুল বাহির হয়, তখনি আন্দাজ করা যায় যে, ইহারা চলিতে আরম্ভ করিবে। চলিবার সময়ে তোমার শরীর হইতে যদি দুখানা পা বাহির হয় এবং স্থির হইয়া বসিবার সময়ে পা দুখানি শরীরের সঙ্গে মিশিয়া যায়, ইহা যেমন আশ্চর্য্য, চলিবার পূর্ব্বে এক-কোষ প্রাণীদের দেহ হইতে আঙুল গজাইয়া উঠাও ঠিক্ সেই রকম আশ্চর্য্য।

এখানে এক-কোষ প্রাণীর একটি ছবি দিলাম। ইহার প্রকৃত আকার অপেক্ষা ছবির আকার অনেক হাজার গুণ বড়। দেখ ইহা কেমন লম্বা লম্বা আঙুল বাহির করিয়াছে।
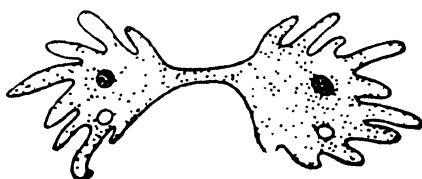
২য় চিত্র—আমিবা

এক-কোষ প্রাণীরা জড়ের মত বস্তু হইলেও তাহারা প্রাণী। প্রাণীরা আহার করিয়া সবল ও পুষ্ট হয় এবং তার পরে সন্তান উৎপন্ন করিয়া মরিয়া যায়। এই কথা

তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কাজেই এক-কোষ প্রাণীদেরও আহার করিতে হয় ও সন্তান উৎপন্ন করিতে হয়।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, যাহাদের মুখ নাই, গলা নাই, পেট নাই, তাহারা কি রকমে খাইবে। কিন্তু তাহাদের সত্যই ক্ষুধা পায় এবং তাহারা খাবার খায়। তাহাদের আহার বড় অদ্ভুত ব্যাপার। তোমাকে যদি রসগোল্লা-বোঝাই একটা বড় টবের মধ্যে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখা যায়, তাহা তাহা হইলে তোমার পেট ভরে কি? নিশ্চয়ই পেট ভরে না; কারণ, লোকে গা দিয়া খায় না; মুখ দিয়াই খায়। কিন্তু এক-কোষ প্রাণীরা সত্যই সর্ব্বাঙ্গ দিয়া খায়। আশ্চর্য্য নয় কি?

এখানে একটা ছবি দিলাম। দেখ,—এক-কোষ প্রাণী সর্ব্ব শরীর দিয়া গাছের বীজের মত একটা খাদ্য জিনিসকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। এই রকমে ধরিয়া ইহারা খাদ্যের সমস্ত সার ভাগ শরীর দিয়া চুষিয়া খায় এবং আমরা আম খাইতে গেলে যেমন আঁটিটাকে ফেলিয়া দিই, সেই রকমেই খাদ্যের অসার ভাগটাকে ইহারা শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলে। ছবির দ্বিতীয় অংশ দেখিলে বুঝিবে, এক-কোষ প্রাণীটি খাদ্যের অসার অংশ পিছনে ফেলিয়া দূরে সরিয়া আসিয়াছে।

চিত্র—৩

এই প্রাণীর দল কত, ছোট তাহা তোমাদিগকে আগেই

বলিয়াছি। ইহাদের চেয়ে ছোট যে-সকল উদ্ভিদ্ জলে জন্মে, তাহা খাইয়াই ইহারা বাঁচে। মানুষ মানুষকে খুন করে, ইহা আমরা জানি। লড়ায়ের সময়ে মানুষ যে কত মানুষকে মারিয়াছে, তাহার হিসাব হয় না। কিন্তু একজন মানুষের পেট ক্ষুধায় জ্বলিয়া উঠিলে, সে আর একটা মানুষকে ধরিয়া কামড়াইয়া খাইতেছে,—এ রকম কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই না। কিন্তু এক-কোষ প্রাণীরা কাছে খাবার না পাইলে তাহাদের জাত-ভাইদের ধরিয়া খাইয়া ফেলে। এই রকমে পরস্পর খাওয়া-খায়ি করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে প্রায়ই লড়াই বাধে। গুগ্‌লি এবং শামুক বড় প্রাণী। ক্ষুধা পাইলে এক-কোষ প্রাণীরা এই সকল বড় বড় প্রাণীদিগকেও ছাড়ে না,—ইহাদের গায়ে লাগিয়া শরীরের রস চুষিতে আরম্ভ করে।

বাতাস না পাইলে কোনো প্রাণীই বাঁচে না। বাতাসে কি কি জিনিস আছে, তোমরা জান কি? ইহাতে নাইট্রোজেন্ নামে এক রকম বাষ্প আছে এবং অক্সিজেন্ নামে আরো একটা বাষ্প আছে। মোটামুটি এই দুইটা জিনিস লইয়াই বায়ু প্রস্তুত। নাইট্রোজেনের কোনো রকম রঙ্ নাই, অক্সিজেনেরও কোনো রঙ্ নাই। যদি রঙ্ থাকিত, তাহা হইলে আমরা যেমন কুয়াসার আসা-যাওয়া চোখে দেখিতে পাই, তেমনি বাতাসেরও আসা-যাওয়া চোখেই দেখিতে পাইতাম। যাহা হউক, বাতাসে যে নাইট্রোজেন্ বাষ্প আছে, তাহা প্রাণীর

জীবন-রক্ষার জন্য প্রত্যক্ষ কোনো কাজে লাগে না—বাতাসের অক্সিজেন্‌টাই প্রাণীর শরীরের জন্য সর্ব্বদা দরকার। এইজন্যই বাতাস না পাইলে প্রাণীরা বাঁচে না। আমরা কি রকমে বাতাসের অক্সিজেন্ শরীরের ভিতরে লই,—তোমরা জান না কি? আমরা নাক-মুখ দিয়া বাতাস টানিয়া, তাহা শরীরের ভিতরকার ফুস্‌ফুসে লইয়া যাই, সেখানে বাতাসের অক্সিজেন্ শরীরের রক্তের সঙ্গে মিশিয়া যায়। ইহাতে রক্ত পরিষ্কার হয়, শরীরে বল হয়, জীবনের কাজ নির্ব্বিঘ্নে চলে এবং আরো কত কি হয়। নাক-মুখ দিয়া বাতাস লওয়া বন্ধ করিলে, ঐ-সকল কাজও বন্ধ হইয়া যায়, তখন মানুষ মারা যায়। তোমরা ইতিহাসে অন্ধকূপ-হত্যার কথা নিশ্চয়ই পড়িয়াছ। একটা খুব ছোট ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া সেখানে অনেক লোককে কয়েদ করা হইয়াছিল,—এক রাত্রিতেই কয়েদীদের অনেকেই মরিয়া গিয়াছিল। বাতাস না পাওয়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, বাতাস যদি প্রাণীদের এত দরকার, তবে জলের মাছ ও গুগ্‌লিরা বাতাস না টানিয়া কি রকমে বাঁচে? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। বাতাস যে, কেবল মাটির উপরে ও আকাশেই আছে, তাহা নয়। জলও অনেক বাতাস শুষিয়া রাখিতে পারে; এই জন্য নদী, সমুদ্র ও খালবিলের জলের সঙ্গে অনেক বাতাস মিশানো থাকে। মাছ ও অন্য জলচর প্রাণীরা জলে-মিশানো

বাতাসের অক্সিজেন্ বাষ্প টানিয়া লইয়া বাঁচিয়া থাকে। এক-কোষ প্রাণীদেরও বাঁচিয়া থাকার জন্য অক্সিজেনের দরকার। ইহারাও ঠিক্ মাছের মত করিয়া জলে-মিশানো বাতাস হইতে অক্সিজেন্ টানিয়া লয়। কিন্তু অক্সিজেন্ টানিয়া লইবার জন্য যেমন মানুষ ও বড় বড় স্থলচর প্রাণীদের শরীরে ফুস্‌ফুস্ আছে এবং জলচর প্রাণীদের "কান্‌কো" আছে, এক-কোষ প্রাণীদের শরীরে সে-রকম কিছুই নাই। ইহাদের যেমন নাক, কান, মুখ, পেট কোনো অঙ্গই নাই, সেই রকম নিশ্বাস লইবারও যন্ত্র নাই। ইহারা সকল শরীর দিয়া জলের বাতাসের অক্সিজেন্ টানিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই অক্সিজেন্‌ই তাহাদের খাদ্য পরিপাক করে এবং শরীর পুষ্ট করে। এক-কোষ প্রাণীদের দেহে এক বিন্দু রক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, কাজেই, হৃদ্‌পিণ্ডের দরকার হয় না।

প্রাণীদের মধ্যে কেহ স্ত্রী, কেহ পুরুষ হইয়া জন্মে। কিন্তু এক-কোষ প্রাণীদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। ইহাদের সকলি অদ্ভুত। যে-রকমে ইহাদের সন্তান জন্মে, তাহা আরো অদ্ভুত। ভালো করিয়া খাওয়া-দাওয়া করার পরে শরীর মোটা ও পুষ্ট হইলেই, এই প্রাণী নিজের দেহটিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ফেলে। এই রকমে একটি প্রাণী দুইটি হইয়া দাঁড়ায় এবং পরে আবার এই দুইটি প্রাণীই শরীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া আরো নূতন প্রাণীর সৃষ্টি করিতে থাকে। এক-কোষ প্রাণীর সেই আঠার মত দেহটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া তোমরা যদি

তাহার কোষ-সামগ্রীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দাও, তবে দেহের প্রত্যেক খণ্ড হইতে এক-একটা নূতন প্রাণীর সৃষ্টি হইবে। তোমরা দ্বিতীয় চিত্রটিকে আর একবার দেখ। একটি আমিবা কি প্রকারে নিজের দেহ বিভক্ত করিয়া দুইটি হইয়াছে, চিত্র দেখিলে তাহা বুঝিবে। ইহারা যেন রক্ত-বীজের ঝাড়,—মৃত্যু নাই। কিন্তু মাছ বা অন্য ছোট জলচর প্রাণীদের কাছে ইহাদের হার মানিতে হয়। মাছেরা কাছে পাইলেই এক-কোষ প্রাণীদিগকে গিলিয়া ফেলে,—তখন তাহাদের আর রক্ষা থাকে না।

যাহাই হউক, এক-কোষ প্রাণীদের জীবনের কাজ এবং তাহাদের সন্তান-উৎপাদন সকলি অদ্ভুত।

খড়িমাটির পোকা

যে-সব প্রাণীর শত্রু বেশি, তাহারা ক্রমে নিজের শরীর বদ্‌লাইয়া শত্রুকে ফাঁকি দেয়। সজারু শরীরকে বড় বড় কাঁটা দিয়া ঢাকিয়া রাখে। কোনো শত্রু যদি তাহাকে ধরিতে আসে, তবে গায়ের কাঁটা দেখিয়া কাছে ঘেঁষিতে পারে না। শত্রু আসিতেছে জানিলেই, শামুক তাহার সমস্ত শরীর পিঠের উপরকার সেই শক্ত খোলের ভিতরে টানিয়া লয়। ইহাতে শত্রুর মুখে ছাই পড়ে। এ সম্বন্ধে আগেই তোমাদের কিছু বলিয়াছি।

এক-কোষ প্রাণীদের শত্রু অনেক। নিজেরা কাম্‌ড়া-কাম্‌ড়ি করিয়া মরে, তার পরে জলের অন্য জন্তুরা কাছে পাইলেই তাহাদিগকে গিলিয়া ফেলে। শত্রুর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এক-কোষীদের মধ্যে কয়েক জাতি এক মজার ফন্দি আঁটিয়াছে। এখানে সেই চালাক এক-কোষ প্রাণীর কতকগুলি ছবি দিলাম।

চিত্র—৪

ছবিগুলি দেখিলে মনে হইবে, যেন কেহ অনেক কারু-গিরি করিয়া এইগুলি আঁকিয়াছে। কিন্তু তাহা নয়—শামুক

বা গুগ্‌লির যেমন খোলা থাকে, ঐগুলি সেই রকমের জিনিস এবং আপনা হইতেই উহা এক-কোষীদের গায়ে জন্মে। এই প্রাণীরা কত ছোট, তাহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ; ইহারা হাজারে হাজারে একত্র না হইলে এক ইঞ্চির মতও ছোট জায়গা জুড়িতে পারে না। খালি চোখে ইহাদিগকে দেখাই দায়। তাই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে দেখিলে যে-রকম দেখায়, ছবিতে তাহাই আঁকিয়া দিলাম। দেখ,—ইহাদের গায়ে কত রকম খোলা।

খোলা-ওয়ালা এই সকল প্রাণী সমুদ্রে থাকে। কাজেই, তোমাদের পুকুরের জলে, খালে বা নদীতে ইহাদের সন্ধান পাইবে না। সমুদ্রের জলে যে চূণ মিশানো থাকে, তাহা টানিয়া লইয়া উহারা গায়ের খোলা প্রস্তুত করে। ইহাদেরি এক জ্ঞাতি-ভাইকে তোমরা চেষ্টা করিলে দেখিতে পাইবে। পরিষ্কার কাচের গ্লাসে জল রাখিয়া তাহাতে কতকগুলা লতা-পাতা কয়েক দিনের জন্য রাখিয়া দিয়ো। সেগুলি যখন একটু পচিতে আরম্ভ করিবে, তখন গ্লাসের পরিষ্কার জল লাল্‌চে হইয়া পড়িবে এবং উপরে একটা পাত্‌লা সর পড়িবে। এই জল যদি তোমরা অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে সুবিধা পাও, তবে খোলা-ওয়ালা এক-কোষ প্রাণীদের জ্ঞাতি-ভাইদের দেখিতে পাইবে। তখন এক বিন্দু জলে হাজার হাজার এই প্রাণী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিবে। ইহাদের প্রত্যেকের দেহে শুঁয়ো লাগানো থাকে; সেই শুঁয়ো

নাড়িতে নাড়িতে তাহারা আনন্দে ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্ব্বে যে আমিবা অর্থাৎ এক-কোষ প্রাণীর কথা বলিয়াছি, তাহারা ইচ্ছা করিলে শরীর হইতে আঙুলের মত শুঁয়ো বাহির করিতে পারে; কিন্তু ইহাদের শুঁয়ো স্থায়িভাবে গায়ে আঁটা থাকে। কাচের বোতলে শুক্‌নো খড় বা পাতা রাখিয়া তাহাতে খানিকটা গরম জল ঢালিয়া রাখিলে, কয়েক দিন পরে জলে এই রকম শুঁয়োওয়ালা এক-কোষ প্রাণী অনেক দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের গায়ের উপরে কখনই খোলা হয় না,—খোলা কেবল সমুদ্রের এক-কোষীদের গায়ের উপরে দেখা যায়।

তোমরা ছবিতে যে খোলা-ওয়ালা এক-কোষ প্রাণী দেখিলে, তাহার প্রত্যেকটি এক একটি প্রাণী, ইহাই বোধ হয় মনে করিতেছ। কিন্তু তাহা নয়; একটা খোলাতে একটা প্রাণী থাকে না। প্রথমে একটি প্রাণী সমুদ্র-জল হইতে চূণ টানিয়া লইয়া খোলা গড়িতে আরম্ভ করে; কিন্তু সেটি যখন বড় হইয়া নিজের শরীর ভাঙিয়া দুইটি প্রাণী হইয়া দাঁড়ায়, তখন একটি খোলায় দুইটির স্থান হইতে পারে না। এই অবস্থায় খোলার উপকার ছোট ছিদ্র দিয়া সেই নূতন প্রাণীটি বাহির হইয়া পড়ে এবং পুরাণো খোলার গায়ে নিজের জন্য নূতন খোলা প্রস্তুত করে। এই রকমে একই প্রাণীর পুত্রপৌত্রাদি মিলিয়া, প্রথম খোলার চারিদিকে থাকে-থাকে অনেক ছোট কুঠারি গড়িয়া বাস করে। সুতরাং, তোমরা

ছবিতে যে-সব খোলা দেখিতেছ, তাহার প্রত্যেকটি হাজার হাজার এক-কোষ প্রাণীর ঘর।

এই সকল ছোট প্রাণীরা সমুদ্রের তলায় কাদার মধ্যে বা শেওলার গায়ে জন্মিয়া কিছু দিন বাঁচিয়া থাকে এবং তাহার পর মরিয়া যায়। ইহাদের জন্মমৃত্যুর সঙ্গে মানুষের কোনো সম্বন্ধ নাই, হঠাৎ এই কথাই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। মানুষ ইহাদের দ্বারা যে উপকার পায়, তাহার কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে। তোমরা চূণের পাথর দেখিয়াছ কি? পাহাড়ে এই পাথর অনেক পাওয়া যায়। আমাদের দেশের আসাম অঞ্চলে চূণের পাথর অনেক আছে। ইহা খুব ভালো করিয়া আগুনে পোড়াইয়া জলে ফেলিয়া দিলে সুন্দর চূণ হয়। এই পাথুরে-চূণ আমরা পাণের সঙ্গে খাই এবং তাহা দিয়া ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করি। এই চূণের পাথর জিনিষটা কি, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়াছেন, ইহা এক-কোষ প্রাণীদেরই গায়ের জমাট খোলা ব্যতীত আর কিছুই নয়। সেগুলি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া সমুদ্রের তলে জমা হইয়া চূণের পাথরের সৃষ্টি করিয়াছে। হিমালয় ও আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত খুব উঁচু, তাহা বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। এই সকল পর্ব্বত এককালে সমুদ্রের তলে ছিল, ক্রমে জল ছাড়িয়া এখন সেগুলি এত উঁচু হইয়াছে। আল্‌প্‌স্ পর্ব্বতের মাথাতেও চূণের পাথর পাওয়া যায়। ভাবিয়া দেখ, কতকাল

ধরিয়া এক-কোষ প্রাণীরা সমুদ্রের তলায় বাস করিয়া আসিতেছে! তার পর ভাবিয়া দেখ, যাহাদের গায়ের খোলায় চূণের পাথরের হাজার হাজার পাহাড় হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাই বা কত? কেবল ইহাই নয়। যে খড়িমাটি দিয়া তোমরা বোর্ডে অঙ্ক লেখ এবং দাঁত মাজো, তাহাও এক-কোষ প্রাণীদের গায়ের খোলা দিয়া প্রস্তুত; তাহাতে মাটির নাম-গন্ধ নাই। খড়িমাটিরও পাহাড় আছে,—শত শত মাইল জুড়িয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়। সুতরাং বলিতে হয়, খড়িমাটির পাহাড়ও এককালে সমুদ্রের তলায় ছিল, এখন জল হইতে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে।

নানা রকম এক-কোষ প্রাণীর মধ্যে আমরা তোমাদিগকে কেবল কয়েকটির সামান্য পরিচয় দিলাম। ইহা ছাড়া আরো যে সকল এক-কোষ প্রাণী আছে, তাহাদের নানা রকম কাজ দেখা যায়। তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ, সমুদ্রের স্থির জলে রাত্রিতে অনেক মাইল জুড়িয়া এক রকম আলো দেখা যায়। নানা লোকে ইহার নানা নাম দেয়। কেহ কেহ ইহাকে বাড়বানল বলেন। এক রকম এক-কোষ প্রাণী এই আলো উৎপন্ন করে। জোনাকি পোকার শরীর হইতে যেমন আলো বাহির হয়, ইহাদের শরীর হইতে সেই রকম আলো বাহির হয়; ইহাই সমুদ্রের জল আলো করিয়া রাখে। যে-সকল ছোট প্রাণী শত শত মাইল জুড়িয়া সমুদ্রের জল আলোকিত করে, তাহাদের সংখ্যা কত, ভাবিয়া দেখ।

দ্বিতীয় শাখার প্রাণী

স্পঞ্জ্

তোমরা স্পঞ্জ্ দেখিয়াছ কি? পাঁউরুটীর ভিতরে যেমন অনেক ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, ইহা সেইরকম ছিদ্রযুক্ত একটা জিনিস! ইহার রঙ্ কিন্তু পাঁউরুটীর মত সাদা নয়, —কতকটা বাদামী ধরণের। হাতে লইয়া চাপ দিলে রবারের জিনিসের মত ইহা ছোট হইয়া যায়, ছাড়িয়া দিলে আবার আগেকার মত বড় হয়। যদি তোমরা স্পঞ্জ্ না দেখিয়া থাক, তবে তোমাদের পাড়ার ডাক্তারখানায় গিয়া দেখিয়া আসিয়ো। গায়ে জল লাগিলে বা কোনো স্থানে জল পড়িলে, আমরা শুক্‌নো কাপড় বা গামছা দিয়া জল শুষিয়া লই; স্পঞ্জ্ শুক্‌নো কাপড়ের চেয়েও তাড়াতাড়ি জল শুষিয়া লইতে পারে। এইজন্য ডাক্তারেরা ইহা নানা কাজে ব্যবহার করেন এবং অনেক দেশের লোকে স্নানের সময়ে গামছার পরিবর্ত্তেও ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চিত্র ৫—স্পঞ্জ্

আমরা আগে যে আঠার মত প্রাণীদের কথা বলিয়াছি, স্পঞ্জ্ সেই রকমেরই প্রাণী, কিন্তু ইহারা এক-কোষ প্রাণী

নয়। মানুষ, গোরু প্রভৃতি জন্তুদের দেহ যেমন অনেক কোষে প্রস্তুত, ইহাদের শরীরও সেইরকম অনেক কোষ দিয়া নির্ম্মিত। কিন্তু বড় বড় জন্তুদের মত ইহাদের হাত, পা, মুখ, চোখ, কান নাই, এমন কি, খাদ্য হজম করিবার জন্য পেটও নাই। এক-কোষ প্রাণীদের চেয়ে ইহারা একটু উন্নত, এইজন্য স্পঞ্জ্-প্রাণীকে দ্বিতীয় শাখায় ফেলা গেল।

এক-কোষ প্রাণীর মধ্যে কয়েক জাতি যেমন হাড়ের মত শক্ত খোলা তৈয়ার করিয়া তাহার মধ্যে নিরাপদে বাস করে, ইহারাও সেই রকম এক ফন্দি করিয়া শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার পায়। ইহারা খোলা প্রস্তুত না করিয়া অনেক ছিদ্রযুক্ত স্পঞ্জ্ তৈয়ার করিয়া তাহাতে লুকাইয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেছ, যে-জিনিসটাকে আমরা 'স্পঞ্জ্ বলি, তাহা এই প্রাণীদের হাড় বা মাংস নয় ;—নিরাপদে বাস করিবার জন্য ঘর-বাড়ীর মত একটা জিনিস। বাহির হইতে ইট্-কাঠ জোগাড় করিয়া আমরা ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করি ; কিন্তু ইহারা তাহা করে না। নিজেদের শরীর হইতে এক রকম লালার মত জিনিস বাহির করিয়া ইহারা স্পঞ্জ্ প্রস্তুত করে,—ঐ লালাই এই প্রাণীদের ইট ও কাঠ। সমুদ্র হইতে যখন সদ্য সদ্য স্পঞ্জ্ উঠানো যায়, তখন সেই আঠার মত প্রাণী স্পঞ্জের সর্ব্বাঙ্গে মাখা থাকে। যে প্রাণীর মুখ নাই, চোখ নাই, পা নাই, বিশেষ আকারও নাই, তাহারা যে-কৌশলে ঘরগুলি নির্ম্মাণ করে, তাহা খুব আশ্চর্য্যজনক নয়

কি ? তোমরা যদি স্পঞ্জের একটু টুক্‌রা খুব পাতলা করিয়া কাটিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, রেশমের সূতার মত অনেক সরু সূতা দিয়া স্পঞ্জ্ প্রস্তুত হইয়াছে। সূতাগুলি গায়ে গায়ে এমন জমাটভাবে লাগানো থাকে যে, খালি-চোখে সেগুলিকে দেখাই যায় না। গুটি-পোকারা যে জিনিস দিয়া রেশমের সূতা প্রস্তুত করে, স্পঞ্জ্‌ও ঠিক সেই জিনিস দিয়া প্রস্তুত হয়।

এখন স্পঞ্জ্-প্রাণী ও তাহাদের ঘর-বাড়ীর কথা একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাউক।

তোমরা এক টুক্‌রা স্পঞ্জ্ যদি ভালো করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, তাহাতে কয়েকটি বড় বড় ছিদ্র আছে এবং অনেক ছোট ছিদ্রযুক্ত সুড়ঙ্গ বাহির হইতে আসিয়া সেই বড় ছিদ্রে শেষ হইয়াছে। স্পঞ্জের প্রাণী ঐ সকল ছিদ্রের গায়ে জিউলির আঠার মত লাগিয়া থাকে। বড় ছিদ্রে প্রাণীর দেহের যে অংশ থাকে, তাহা হইতে অনেক গুলি শুঁয়ো বাহির হয়। ইহারা যত দিন জীবিত থাকে, ততদিন ঐ শুঁয়োগুলি নাড়িতে থাকে। যেদিন ভয়ানক গরম এবং একটুও বাতাস নাই, তখন আমরা তালের পাখা নাড়িয়া বাতাস খাই। পাখা নাড়া পাইলেই খানিকটা বাতাস ঠেলিয়া দূরে লইয়া যায়। এই রকমে যে-জায়গাটা খালি হয়, পাশের বাতাস জোরে আসিয়া সেই জায়গা জুড়িয়া বসে। বাতাসের এই রকম যাওয়া-আসাতে পাখার কাছে একটা

বায়ুর প্রবাহ উৎপন্ন হয়। স্পঞ্জ্ প্রাণীরা যখন ছিদ্রের ভিতরে থাকিয়া তাহাদের শুঁয়ো নাড়িতে থাকে, তখন সেখানেও একটা জলের প্রবাহ হইয়া পড়ে। ইহাতে ছোট সুড়ঙ্গগুলি দিয়া জল প্রবেশ করিয়া, তাহা বড় সুড়ঙ্গ দিয়া বাহির হইতে আরম্ভ করে। স্পঞ্জের প্রাণীরা খুব অধম জীব হইলেও তাহারা প্রাণী। সুতরাং বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ইহাদের বাতাসের অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়, আবার কিছু খাদ্যেরও দরকার হয়। আমরা আগেই বলিয়াছি, জলের সঙ্গে যে বাতাস মিশানো থাকে, তাহা হইতে অক্সিজেন্ টানিয়া লইয়া অনেক জলচর প্রাণী বাঁচিয়া থাকে। স্পঞ্জ্ প্রাণীরাও জলে-মিশানো বাতাসের অক্সিজেন শুষিয়া বাঁচিয়া থাকে। তাহাদের ঘরের সেই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া যখন জলের স্রোত চলিতে থাকে, তখন তাহারা সেই স্রোতের জল হইতে অক্সিজেন্ টানিয়া লয় এবং জলের সঙ্গে সঙ্গে যে ছোট প্রাণী বা উদ্ভিদ্ ছিদ্রে প্রবেশ করে, নিজের আঠালো দেহে আট্‌কাইয়া সেগুলিকেও খাইয়া ফেলে।

সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ, কেবল নিরাপদে থাকার জন্য স্পঞ্জ্ প্রাণীরা সুড়ঙ্গযুক্ত ঘর নির্ম্মাণ করে না, ইহাতে খাদ্যও কাছে আসে।

প্রাণিমাত্রেই সন্তান রাখিয়া মরিয়া যায়। এই ব্যবস্থা না থাকিলে কোনো প্রাণীর বংশ থাকে না। স্পঞ্জ্ প্রাণীরা একটু উন্নত হইলেও, পশুপক্ষীদের মত উন্নত নয়। ইহারা

এই জন্য ডিম বা সন্তান প্রসব করে না। বয়স বেশি হইলে ইহাদের শরীর হইতে ডিমের মত কতকগুলি অংশ খসিয়া পড়ে। ইহাই বড় হইয়া নূতন প্রাণী হয় এবং তাহারাই আবার স্পঞ্জের ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে।

আমাদের দেশের খালবিলের বদ্ধ জলে এক রকম স্পঞ্জের মত প্রাণী দেখা যায়। তোমরা ইহা দেখিয়াছ কি না জানি না। জলের মধ্যে যে-সকল গাছের ডাল-পালা পচিতে থাকে, তাহারি উপরে ইহারা ছোট ছোট মৌ-চাকের মত বা বোলতার চাকের মত ঘর করে। ইহাদেরও দেহ ঠিক স্পঞ্জ্ প্রাণীদের মত আঠালো। ইহারা স্পঞ্জের জ্ঞাতি হইলেও ঠিক স্পঞ্জ্ নয়। প্রকৃত স্পঞ্জ্-প্রাণী আমাদের দেশের জলাশয়ে জন্মে না, নিকটের সমুদ্রেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই তোমরা এদেশে জীবন্ত স্পঞ্জ্-প্রাণী দেখিতে পাইবে না। এই কারণে এই প্রাণীদের সকল কথা তোমাদিগকে বলিলাম না। সকল স্পঞ্জ্-প্রাণীই যে রবারের মত ঘর প্রস্তুত করে, তাহা নয়। সমুদ্রের জল হইতে চূণ টানিয়া লইয়া ইহাদের কয়েক জাতি পাথরের মত শক্ত ঘর নির্ম্মাণ করে। এই সকল ঘরের উপরে ছুঁচের মত কাঁটা বাহির করা থাকে বলিয়া কোনো প্রাণীই কাছে ঘেঁষিতে পারে না।

যাহা হউক স্পঞ্জ্-প্রাণীদের যে-সকল কথা শুনিলে, তাহা হইতে বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, ইহারা প্রথম শাখার

এক-কোষ প্রাণীদের চেয়ে অনেক উন্নত। ইহাদের বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই সত্য, কিন্তু তথাপি শরীর এক-কোষ প্রাণীদের মত নয়। ইহাদের দেহের কতকগুলি কোষ শুঁয়োর আকার পাইয়া খাদ্য সংগ্রহ করে। আবার কতকগুলি কোষ খাদ্য হজম করে। মানুষ, গোরু, পাখী প্রভৃতি বড় প্রাণীদের শরীরে যেমন কতকগুলি কোষ মিলিয়া পাকযন্ত্র নির্ম্মাণ করে, আবার কতকগুলি দলে দলে ভাগ হইয়া কেহ চোখ, কেহ কান এবং কেহ বা নাকের সৃষ্টি করে—স্পঞ্জ্-প্রাণীতে আমরা তাহারি সূত্রপাত দেখিতে পাইলাম। এই জন্যই ইহাদিগকে দ্বিতীয় শাখার প্রাণীদের দলে ফেলা হইল।

তৃতীয় শাখার প্রাণী

হাইড্রা

হাইড্রা জলচর প্রাণী, এবং স্পঞ্জ-প্রাণীদের চেয়েও উন্নত। ইহাদের রঙ্ কখনো সবুজ এবং কখনো বাদামীও দেখা যায়। তোমরা পুকুরের জলে খোঁজ করিলে ইহাদিগকে শেওলা বা জলের লতাপাতার গায়ে দেখিতে পাইবে। হাইড্রা খুব বড় প্রাণী নয়,—আধ ইঞ্চির বেশি প্রায়ই লম্বা হয় না। তোমরা হয় ত পুকুরের জলে ইহাদিগকে দেখিয়াছ; শেওলা বা জলের গাছপালার শিকড় ভাবিয়া সেগুলিকে লক্ষ্য কর নাই। খালি চোখে ইহা-

চিত্র ৬—হাইড্রা
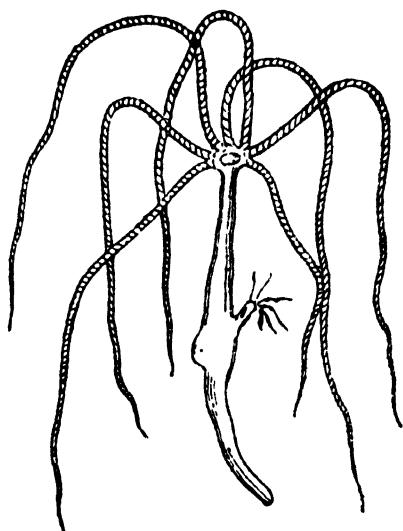
দিগকে বেশ ভালোই দেখা যায়, কিন্তু শরীরটা ঠিক্ কি রকম, তাহা জানিতে হইলে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। অণু-বীক্ষণে হাইড্রাকে বড় করিয়া দেখিলে, তাহার আকৃতি যে রকম হয়, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম।

হাইড্রাদের চোখ, কান বা নাক নাই, কিন্তু মুখ আছে, উদর আছে এবং খাদ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ফন্দিও জানা আছে। দেহ একটা নল বলিলেই হয়,—কারণ তাহার আগাগোড়া ফাঁপা। কিন্তু এই নলের মত শরীরের একটা দিক্ বন্ধ। এই বন্ধ দিক্টাই টোপা-পানার তলায় বা শেওলার গায়ে লাগাইয়া এবং খোলা দিক্টা নীচে রাখিয়া ইহারা জলের মধ্যে ঝুলিতে থাকে। যে-দিক্টা ঝুলিতে থাকে, সেইটি তাহাদের মুখ, কিন্তু চিবাইবার জন্য মুখে দাঁত নাই এবং চাকিয়া খাইবার জন্য জিহ্বাও নাই। দাঁত পড়িয়া গেলে, বুড়ো মানুষেরা যেমন সব জিনিস চুষিয়া খায়, ইহারাও সেই রকমে খায়।

তোমরা ছবিতে দেখিতে পাইবে, হাইড্রার মুখের গোড়ায় ডালপালার মত অনেকগুলি লম্বা লম্বা অংশ রহিয়াছে। মাগুর মাছের মুখে যেমন শুঁয়ো থাকে, এগুলিও সেই রকমের জিনিস। এগুলিকে শিকার ধরিবার ফাঁদ বলিলেই হয়। হাইড্রারা খুব তাড়াতাড়ি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না, অথচ পেটে যথেষ্ট ক্ষুধা আছে। তাই ভগবান ইহাদের মুখের গোড়ায় শুঁয়োর মত অনেকগুলি লম্বা হাত লাগাইয়া রাখিয়াছেন। জলের পোকা বা ছোট মাছ কাছে আসিলেই উহারা সেগুলিকে ঐ শুঁয়ো দিয়া চাপিয়া ধরে। পোকারা পালাইবার জন্য ঝট্পট্ করে, কিন্তু শুঁয়োর শক্ত বাঁধন ছিঁড়িবার সাধ্য থাকে না। এই রকমে জখম হইয়া আসিলে হাইড্রারা শিকার মুখে পূরিয়া দেয়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, কয়েকটি সরু শুঁয়ো দিয়া শিকার ধরিতে গেলে, হাইড্রাদের বুঝি খুব বুদ্ধি খরচ করিতে হয়। কিন্তু তাহা নয়,—আমাদের মত উহাদের বুদ্ধি-সুদ্ধি একটু নাই। শিকার ধরিবার জন্য ইহা ছাড়া আরো যে-সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে শিকার আপনিই ধরা পড়ে।

তোমরা ঠগী ডাকাতদের কথা বোধ হয় শুনিয়াছ। এই ডাকাতের দল সত্তর-আশী বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের পথিকদের উপরে ভয়ানক অত্যাচার করিত। সে-সময়ে রেল বা ষ্টীমারের রাস্তা ছিল না, ব্যবসায়ের জন্য বা তীর্থ করার জন্য লোকে দলে দলে হাঁটা পথে চলিত। ঐ ডাকাতেরা ভালো মানুষের মত এক-এক গাছি দড়ির ফাঁস কোমরে বাঁধিয়া পথিকদের দলে মিলিত। দড়ির ফাঁস ছাড়া আর কোনো অস্ত্র ডাকাতেরা সঙ্গে লইত না। পথিকেরা যখন নিশ্চিন্ত হইয়া গল্প করিতে করিতে রাস্তা দিয়া চলিত, ঠগ্ ডাকাতেরা চক্ষের নিমেষে পথিকদের গলায় সেই ফাঁস লাগাইত। এই রকমে হাজার হাজার পথিককে খুন করিয়া ঠগেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লইয়া যাইত। ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের কড়া শাসনে এখন আমাদের মধ্যে ঠগ্ ডাকাত নাই কিন্তু হাইড্রারা আজও ফাঁস লাগাইয়া প্রাণিহত্যা করিতেছে।

হাইড্রার শুঁয়োগুলি সাধারণতঃ চিকণ চুলের চেয়ে অধিক মোটা হয় না। এজন্য ইহার খুঁটিনাটি সব দেখিতে

হইলে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। তোমরা যদি পুকুরের হাইড্রার একগাছি শুঁয়ো লইয়া অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে উহার গায়ে গাঁটের মত কতকগুলি উঁচু উঁচু অংশ দেখিতে পাইবে। এইগুলি এক রকম বিষে পূর্ণ থাকে এবং তাহারি মধ্যে হাইড্রারা এক রকম সরু ফাঁস, ঘড়ির স্প্রীঙের মত গুটাইয়া রাখে। এই ফাঁসগুলিও নলের মত, ইহাদের ভিতর ফাঁপা।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এই বিষের কোষগুলিও বুঝি খুবই বড় জিনিস। কিন্তু তাহা নয়, এই কোষের তিন চারি শত সারি করিয়া সাজাইলে, তবে সকলগুলিতে মিলিয়া কেবল এক ইঞ্চি লম্বা হইতে পারে। সুতরাং এত ছোট কোষের মধ্যে যে-সকল ফাঁস লুকানো থাকে, সেগুলি কত সরু, তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখ।

আমরা এখানে হাইড্রার শুঁয়োর গায়ের বিষ-কোষের একটা ছবি দিলাম। ছবিটি অনেক বড় করিয়া আঁকা হইয়াছে। বিষের মধ্যে ফাঁস কেমন গুটানো আছে, ছবি দেখিলেই তোমরা বুঝিবে।

চিত্র—৭

এখন এই বিষ ও ফাঁস দিয়া হাইড্রারা কি রকমে ছোট প্রাণী শিকার করে তাহা বলিব। জলে হাইড্রারা শেওলার গায়ে বা জলের গাছ-পালার গায়ে দেহ আটকাইয়া চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু

অন্য জলচর প্রাণীরা সে-রকমে থাকে না, তাহারা তাড়াতাড়ি সাঁতরাইতে পারে; কাজেই, জলের ভিতরে তাহারা ক্রমাগত ছুটাছুটি করে। এই রকম ছুটাছুটি করিতে করিতে যদি হঠাৎ তাহারা হাইড্রার গায়ে ধাক্কা দেয়, তবে আর রক্ষা থাকে না। খাবার জিনিস গায়ে ঠেকিলেই হাইড্রাদের শুঁয়োর গায়ের সেই কোষের বিষ ফাঁসের নলের ভিতরে প্রবেশ করে। ইহাতে সেগুলি খাড়া হইয়া উঠে। তার পরে, বিষে-ভরা ফাঁসগুলি শিকারকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গায়ে এমন বিষ ঢালিতে আরম্ভ করে যে, শিকার জখম হইয়া পড়ে, তখন তাহার আর পালাইবার উপায় থাকে না।

শিকার ধরিয়া খাইবার এমন সুব্যবস্থা আছে বলিয়াই, খাদ্য জোগাড় করার জন্য হাইড্রাদের বেশি চলা-ফেরা করিতে হয় না। তাহারা টোপা-পানা পদ্মের পাতা, শেওলার গায়ে শরীর আট্‌কাইয়া প্রায় ঝুল খাইয়াই জীবন কাটায়।

আমরা আগেই বলিয়াছি, হাইড্রাদের শরীর এক একটা প্রকাণ্ড নলের মত; তাহার সমস্তটাই ফাঁপা। খাদ্য পাইলেই তাহারা ফাঁপা শরীরের ভিতরে প্রবেশ করায় এবং সেখানে তাহা পরিপাক করে। আমরা পর পৃষ্ঠায় হাইড্রার উদরের একটা ছবি দিলাম। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে-রকম দেখা যায়, ছবিটি সেই রকমের। ছবিটি দেখিলেই বুঝিবে, হাইড্রার পেট অনেক ছোট ছোট কোষে আচ্ছন্ন। খাদ্য পেটে পড়িলেই

ঐ-সকল কোষ হইতে এক রকম রস বাহির হয় এবং তাহাই খাদ্য হজম করে। তার পরে মাছের কাঁটা বা পোকাদের
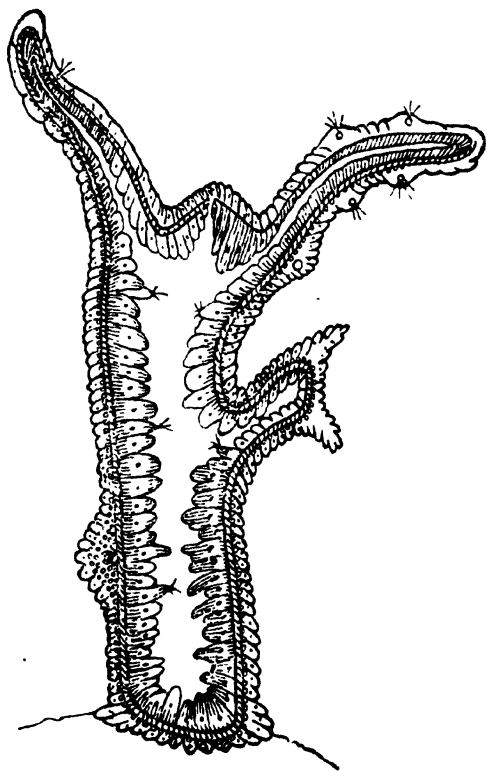
চিত্র—৮

গায়ের খোলা প্রভৃতি যে সকল অখাদ্য জিনিস পেটের ভিতরে যায়, তাহা হাইড্রারা মুখ দিয়া উগ্‌রাইয়া ফেলে। ইহাদের শরীরে মুখ ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই।

দেখ, খাদ্য হজম ব্যাপারেও ইহারা কত উন্নত। গোরু, ছাগল, মানুষ প্রভৃতি বড় বড় প্রাণীদেরও পেটের ভিতরটা ঐরকমেই কোষে আচ্ছন্ন থাকে এবং তাহা হইতে নানা রকম রস বাহির হইয়া খাদ্য হজম করে। বড় প্রাণীদের শরীরের কাজের সহিত ইহাদের জীবনের কাজের অনেক মিল আছে বলিয়াই, হাইড্রারা তৃতীয় শাখার প্রাণী হইয়াছে।

বড় বড় প্রাণীদের মধ্যে যেমন কতকগুলি পুরুষ এবং কতক স্ত্রী হইয়া জন্মে, হাইড্রারা সে-রকমে জন্মে না। ইহাদের সকলেই সন্তান উৎপন্ন করে। গ্রীষ্মকালে ইহারা খুব সতেজ থাকে। তেজালো গাছে যেমন শীঘ্র শীঘ্র ডালপালা গজাইয়া উঠে, সতেজ হাইড্রাদের দেহ হইতে সেই রকমে ফুলের কুঁড়ির মত অনেক কুঁড়ি ঐ সময়ে আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। সেগুলি কিছু দিন উহাদের গায়েই আট্‌কাইয়া থাকে, তার পরে আপনিই জলের তলায় পড়িয়া যায়। এই ঝরা কুঁড়িগুলিই হাইড্রাদের সন্তান। ইহারাই শরীর হইতে ক্রমে শুঁয়ো বাহির করে এবং শেষে হাইড্রা হইয়া দাঁড়ায়।

খুব শীতের সময়ে হাইড্রারা যখন মড়ার মত নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের আবার আর এক রকমে সন্তান হয়। এই সময়ে ইহাদের প্রত্যেকের শরীরের গোড়ার একটা জায়গা ফুলিয়া উঠে এবং সেখানে অনেক ডিম জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে মুখের কাছে একটা জায়গা ফুলিয়া উঠে এবং সেখানেও এক রকম জিনিস জমিতে থাকে। পরে কোনো গতিকে

ইহা শরীরের গোড়ার ডিমে আসিয়া ঠেকিলে, ডিমগুলি বাড়িতে আরম্ভ করে। শীতে হাইড্রারা মরিয়া যায়, কিন্তু ডিমগুলি মরে না। শীতের শেষে একটু গরম পড়িলেই সেগুলি ফুটিয়া উঠে এবং ইহাতে অনেক নূতন হাইড্রা জন্মে।

হাইড্রাদের জন্মের সঙ্গে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছে ফল জন্মানোর অনেকটা মিল আছে। তাল, পেঁপে প্রভৃতি গাছের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। এই-সকল গাছের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ এবং কতক স্ত্রী হইয়া জন্মে। পুরুষ-গাছে যে-সকল ফুল ধরে, তাহাতে ফল হয় না ; স্ত্রী-গাছের ফুলই শেষে ফল হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু স্ত্রী-গাছের ফুলে ফল হইতে হইলে, পুরুষ-গাছের ফুলের রেণু স্ত্রী-ফুলের উপরে আসিয়া পড়া দরকার। পুরুষ-গাছের রেণু স্ত্রী-গাছের ফুলে বাতাসে উড়িয়া আসিয়া পড়ে, বা প্রজাপতিতে বহিয়া আনে। ইহাতে স্ত্রী-ফুলে ফল হয়। লাউ, কুমড়া, শশা প্রভৃতি গাছের স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই। ইহাদের প্রত্যেক গাছেই স্ত্রী-ফুল ও পুরুষ-ফুল ফোটে। তার পরে, পুরুষ-ফুলের রেণু স্ত্রী-ফুলে আসিয়া ঠেকিলেই তাহাতে ফল ধরিতে আরম্ভ করে। হাইড্রাদের সন্তান হওয়া, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির ফল ধরার মত নয় কি ? দেহের গোড়ার ডিমগুলিতে তাহার মুখের কাছে সঞ্চিত সেই জিনিসটা আসিয়া না ঠেকিলে, ডিম হইতে সন্তান হয় না।

রাবণচ্ছত্র

আমরা এ-পর্য্যন্ত যে-সকল প্রাণীর জীবনের কথা বলিলাম, তাহারা লোনা জলে থাকে না। পুকুর, খাল, বিল এবং নালাতেই ইহাদের বাস। কিন্তু সমুদ্রের লোনা জলেও এই শাখার প্রাণীর অভাব নাই। নানা আকার ধরিয়া এই প্রাণীদেরই নানা জাতি সমুদ্রের সকল অংশে চলাফেরা করে। ইহাদের কাহাকেও জেলি মাছ, কাহাকেও মেডুসা ইত্যাদি নানা নাম দেওয়া হয়। পুরীর সমুদ্রের ধারের লোকেরা এই রকম এক প্রাণীকে রাবণচ্ছত্র নাম দিয়াছে। শুঁয়োগুলিকে জলের নীচে রাখিয়া ইহারা মাথায় দিবার ছাতির মত সমুদ্রের জলে ভাসিয়া বেড়ায়। তার পরে, কাছে ছোট মাছ বা জলের পোকা পাইলেই শুঁয়ো জড়াইয়া সেগুলিকে মুখে পূরিয়া দেয়। এক-একটি প্রাণী লইয়া এই ছত্র হয় না; একই জাতির অনেক প্রাণী মিলিয়া এক একটা ছত্র নির্ম্মাণ

করে। এখানে রাবণচ্ছত্রের একটা ছবি দিলাম। দেখিতে ঠিক ছাতার মত নয় কি? তোমরা যদি কখনো কলিকাতার মিউজিয়াম্ অর্থাৎ যাদুঘর দেখিতে যাও, তবে সমুদ্রের এই সকল প্রাণীদের চেহারা দেখিতে পাইবে। নানা জায়গা হইতে
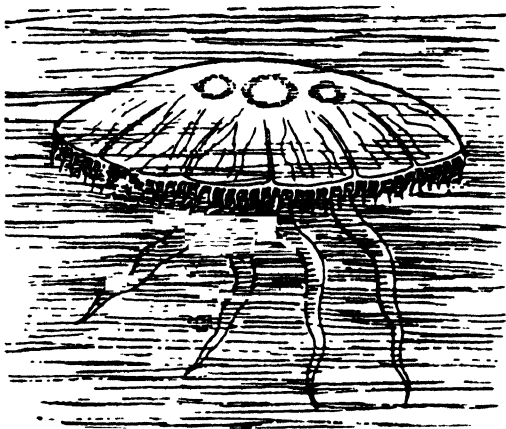
চিত্র—২

এই শাখার অনেক প্রাণী জোগাড় করিয়া সেখানে বোতলের মধ্যে পূরিয়া রাখা হইয়াছে। সমুদ্র হইতে আমরা অনেক দূরে বাস করি, কাজেই, জীবন্ত অবস্থায় এই প্রাণীদিগকে দেখা আমাদের ভাগ্যে হঠাৎ ঘটিয়া উঠিবে না।

—— ——

প্রবাল

তোমরা হয় ত প্রবাল দেখিয়া থাকিবে। জিনিসটা দেখিতে সিঁদুরের মত লাল এবং পাথরের মত শক্ত। লোকে প্রবালের মালা গাঁথিয়া গলায় পরে এবং সৌখিন লোকেরা ইহা সোনার আংটিতে বসাইয়া ব্যবহার করে। কিন্তু সকল প্রবালই লাল নয়; হাড়ের মত সাদা প্রবালও দেখা যায়। এই জিনিসটা কোথায় ও কি প্রকারে উৎপন্ন হইল, তাহা খোঁজ করিলে দেখা যায়, হাইড্রার মত এক জাতি প্রাণীই ইহা উৎপন্ন করে। স্পঞ্জ্ যেমন এক রকম প্রাণীর বাসা, প্রবালও আর এক রকম প্রাণীর বাসা।

এখানে প্রবাল-প্রাণী ও তাহাদের ঘরের একটা ছবি দিলাম। এক একটি হাইড্রা যেমন পৃথক্ হইয়া বাস করে, প্রবাল-প্রাণীদের সে-রকমে থাকিতে দেখা যায় না। একই জায়গায় ইহারা হাজারে হাজারে একত্র বাস করে, এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি সেই জায়গা ছাড়িয়া দূরে যায় না। ছবিতে যেগুলিকে গাছের ডালের মত দেখিতেছ, তাহাদের প্রত্যেকটিই এক একটি প্রবাল-প্রাণার বাসা। জীবন্ত প্রাণীগুলি ছবির ডালের মাথায় শুঁয়ো বাহির করিয়া আছে।

চিত্র—১০

এক-কোষ প্রাণীরা কি-রকমে গায়ের চারিদিকে খোলা প্রস্তুত করে, তাহা আগে শুনিয়াছ। ইহারাও সেই প্রকারে সমুদ্রের জল হইতে চূণ টানিয়া লইয়া পাথরের মত শক্ত বাসা তৈয়ার করে। এই রকমে অনেক প্রাণী গায়ে গায়ে বাসা করিতে থাকিলে, সেগুলি কিছুকাল পরে প্রবালের মোটা থামের মত হইয়া পড়ে। তার পরেও যখন হাজার হাজার প্রাণী তাহারি উপরে বাসা করিতে আরম্ভ করে, তখন সমস্ত জিনিসটা সমুদ্রের তলায় প্রকাণ্ড গাছের মত হইয়া দাঁড়ায়।

চিত্র—১১

লাল প্রবালের চেয়ে সমুদ্রের তলায় সাদা প্রবাল অধিক পাওয়া যায়। সাদা প্রবালের প্রাণীরা নানা রকম আকৃতির ঘর প্রস্তুত করে। এখানে ইহাদের এক রকম ঘরের ছবি দিলাম।

ইহা দেখিলে, মনে হইবে, যেন, জিনিসটা বাতাস খাইবার হাতপাখা। কিন্তু ইহার আগাগোড়া সাদা প্রবালে তৈয়ারি এবং পাথরের মত শক্ত।

ঠাণ্ডা দেশের সমুদ্রে প্রবাল জন্মে না। যে-সকল দেশে শীত কম, সেখানকার সমুদ্রতলে গাছের মত অসংখ্য প্রবাল-প্রাণীর বাসা দেখা যায়। আমাদের ভারত-মহাসাগর এবং ভূমধ্য-সাগর ইহাদের প্রধান বাসস্থান। শত শত বৎসর ধরিয়া একই জায়গায় বাসা করায়, প্রবাল-প্রাণীদের ঘরগুলি এক একটি ছোট-খাটো পাহাড়ের মত হইয়া পড়ে। তার পরে এই সকল প্রবালের পাহাড়ের গায়ে মাটি জমিতে আরম্ভ করিলে, সেগুলি এক একটি দ্বীপ হইয়া দাঁড়ায়। এই রকম প্রবালের দ্বীপ পৃথিবীতে অনেক জায়গায় দেখা যায়। আমাদের ভারতবর্ষের কাছে যে মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ আছে, তাহার কথা হয় ত তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ। এই দ্বীপ-গুলি গোড়ায় প্রবাল-প্রাণীদের বড় বড় বাসা ছিল; পরে তাহারি গায়ে মাটি জমিয়া এখন বড় বড় দ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল দ্বীপের উপরে এখন চাষ-আবাদ হইতেছে—মানুষ, পশু বাস করিতেছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, প্রবাল-প্রাণীরা সমুদ্রের মধ্যে নূতন নূতন ডাঙা জমি প্রস্তুত করিয়া মানুষের অনেক উপকার করে।

চতুর্থ শাখার প্রাণী

এ-পর্য্যন্ত যে-সব প্রাণীর কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে প্রথম প্রাণীদের শরীরে এক একটি করিয়া কোষ থাকে, ইহা তোমরা শুনিয়াছ। ইহার পরে যে-সকল প্রাণীর কথা বলিয়াছি, তাহারা অনেক কোষ দিয়া শরীর নির্ম্মাণ করে, ইহাদের জীবনের কথা তোমরা শুনিয়াছ। এই দুই শাখার প্রাণীর উদর বা পাকযন্ত্র নাই. জলের ভিতরে শেওলার গায়ে ইহারা জড়ের মত বাস করে। কাছে যদি খাদ্য আসে, তবে সর্ব্বশরীর দিয়া তাহার সার অংশ চুষিয়া খায়। ইহাদের চোখ, কান, নাক কিছুই নাই ; কাজেই, কিছু দেখিতে বা শুনিতে পায় না। কিন্তু তৃতীয় শাখার প্রাণীরা এই রকম জড়ের মত বাস করে না। তাহাদের দেহে অনেক কোষ। আমাদের দেহের কতক কোষ একত্র হইয়া যেমন শরীরের জায়গায় জায়গায় চোখ, কান, নাক ইত্যাদি তৈয়ার করে, তৃতীয় শাখার প্রাণীদের শরীরের কোষ সেই রকমে ভাগ ভাগ হইয়া কেহ শুঁয়ো, কেহ পাকযন্ত্র গড়িয়া তোলে, আবার কতকগুলি মিলিয়া সন্তান উৎপাদনের জন্য ডিমও নির্ম্মাণ করে। ইহাও তোমরা শুনিয়াছ।

এই সকল কথা যদি তোমরা একটু ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে প্রাণীরা কেমন ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে চলিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। আমরা চতুর্থ শাখার যে দুই-একটি প্রাণীর পরিচয় দিব, তোমরা তাহাদের দেহের আরো উন্নতিরা কথা শুনিবে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই প্রাণীদের প্রায় সকলেই সমুদ্রে থাকে। আমাদের দেশে সমুদ্র নাই, কাজেই তাহাদিগকে খোঁজ করিয়া লইয়া তোমরা পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাইবে না। যাহারা সমুদ্রের ধারে বাস করে, এই সকল প্রাণী তাহারা সর্ব্বদাই দেখিতে পায় এবং দেখিয়া শুনিয়া পরীক্ষা করিতে পারে।

তারা-মাছ

চতুর্থ শাখার প্রাণীদেব মধ্যে তারা-মাছই প্রধান। আমি জ্যান্ত তারা মাছ কখনো চোখে দেখি নাই, তোমরাও হয়ত দেখ নাই। ইহারা সমুদ্রের জলে বাস করে। মান্দ্রাজের উপকূলে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। আটলান্টিক্ মহাসাগরের ঠাণ্ডা জলেই কিন্তু তারা-মাছ অনেক থাকে। এই প্রাণীদের বাংলায় কোন নাম নাই। ইংরাজীতে Star Fish বলে, তাই আমরা ইহাদিগকে তারা-মাছ বলিলাম।

তারা-মাছের মুখ আছে, পেট আছে, নিশ্বাস টানিয়া লইবার যন্ত্র আছে, পা দিয়া চলিয়া যাইবার শক্তি আছে, আবার বাহির হইতে কোনো আঘাত পাইলে তাহা বুঝিয়া নড়াচড়া করিবার ক্ষমতাও আছে। ইহারা নিতান্ত ছোট প্রাণী নয়। তাহা হইলে দেখিতেছ, কুকুর, বিড়াল, মানুষ প্রভৃতি জন্তুরা দেহের নানা অংশ দিয়া যেমন জীবনের নানা কাজ করে, ইহারাও কতকটা সেই রকমেই জীবন কাটায়। কিন্তু তথাপি ইহারা বড় বড় জন্তুদের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। যে-সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকিলে প্রাণীরা খুব উন্নত হয়, তাহারি একটু একটু আভাস ইহাদের শরীরে পাওয়া যায় মাত্র।

এখানে একটি তারা-মাছের ছবি দিলাম। আকাশের নক্ষত্র হইতে যেমন আলোর রেখা বাহির হয়, ইহার শরীর হইতে সেই রকম হাতের মত পাঁচটি অংশ বাহির হইয়াছে। শরীরের আকৃতি কতকটা তারার মত। এই জন্যই ইহা-দিগকে তারা-মাছ বলা হয়। ইহারা সমুদ্রের তলে, সমুদ্রের অল্প জলে, পাথরের গায়ে বা পাথরের ফাটালে লুকাইয়া
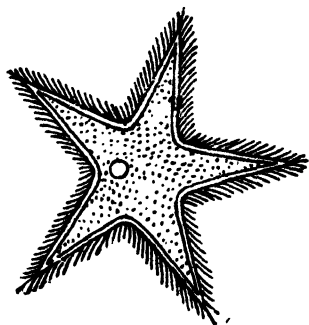
চিত্র—১২

বাস করে। শরীরটা এক-কোষ প্রাণীদের মত নয়, ইহাতে মাংস এবং হাড়ের মত শক্ত চূণো পাথর দুইই আছে। চূণো পাথবগুলি শরীরের মধ্যে মাংস দিয়া ঢাকা থাকে। কিন্তু সেগুলি পরস্পর জোড়া থাকে না, কাজেই ইহারা যেমন ইচ্ছা সাপের মত শরীরটা নোয়াইতে পারে; একটুও আড়ষ্ট ভাব নাই। তা ছাড়া, গায়ের উপরে সজারুর কাঁটার মত অনেক কাঁটাও লাগানো থাকে; শত্রুরা এই কাঁটার ভয়ে কাছে ঘেঁষিতে পারে না। শুঁয়ো পোকারা যেমন অনেক ছোট ছোট পায়ের মত অংশ দিয়া চলিয়া বেড়ায়, ইহারাও সেই রকমে চলে। কিন্তু ইহাদের পা দেহের নীচে লুকানো থাকে। চলিবার সময় সেগুলিকে বাহির করিয়া ইহারা চলা-ফেরা করে।

অনেক প্রাণীরই মুখ শরীরের উপরের দিকে বা পাশে থাকে। কিন্তু তারা-মাছের মুখ একেবারে দেহের তলায় দেখা যায়। ছোট মাছ, গুগ্‌লি বা শামুক কাছে পাইলে ইহারা সেই ছোট পা বাহির করিয়া অতি ধীরে ধীরে শিকারের কাছে যায় এবং তাহাকে শরীরের তলায় ফেলিয়া তাহার সার ভাগ চুষিয়া লয়। খাওয়া শেষ হইলে দেখা যায়, শিকারের হাড়গোড়, খোলা সব পড়িয়া আছে, কিন্তু শরীরের সারবস্তুটা নাই।

যখন তারা-মাছ বড় বড় শামুক বা সমুদ্রের শঙ্খ শিকার করে তখন ইহাদের ছোট মুখের ভিতরে ঐ রকম বড় শিকারের জায়গা হয় না। এই অবস্থায় তারা-মাছ যা করে, তাহা বড় মজার। ইহাদের পাঁচটা হাতের ভিতরে পাক-যন্ত্রের পাঁচটা থলি থাকে। বড় শিকারের গায়ের উপরে উঠিয়া ইহারা সেই পাঁচটা হাত হইতে থলি বাহির করে এবং সেইগুলি দিয়া শিকারকে জড়াইয়া ধরে। শিকারের দেহে যে সারবস্তু থাকে, তারা-মাছেরা শিকারকে না গিলিয়াই এই রকমে হজম করিয়া ফেলে।

যাহার পাঁচটা অঙ্গে পাকযন্ত্রের থলি, সে জানোয়ার কি রকম ভয়ানক, একবার ভাবিয়া দেখ। ইহাদের এই রকম পাকযন্ত্রের উৎপাতে সমুদ্রের শামুক-ঝিনুকের দল সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে।

আগে যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা তারা-মাছের

উপর পিঠের চিত্র। এই পিঠে মুখ থাকে না। প্রত্যেক হাতে শিকড়ের মত যে শুঁয়ো বাহির হইয়াছে, ঐ গুলি ইহার গায়ের কাঁটা। তার পরে, দুইখানি হাতের মাঝামাঝি যে কালো দাগটি দেখিতেছ তাহা জল-প্রবেশের পথ। তোমাদের বাগানের গাছে জল দিবার বোমার নলে যেমন ঝাঁঝরি লাগানো থাকে, তারা-মাছের দেহে জল-প্রবেশের পথে সেই রকম ঝাঁঝরি আছে। এই ব্যবস্থায় জলের কাঁটাকুটা শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না।

তারা-মাছ কি রকমে তাহার পা নড়াইয়া চলাফেরা করে, এখন তাহার কথা বলিব। ইহারা যে উপায়ে চলিয়া বেড়ায়, তাহা অন্য কোনো প্রাণীতে দেখা যায় না, এই জন্যই তাহার কথা বলিতেছি। ইহাদের সকলি অদ্ভুত।

রবারের সরু নল যদি ভালো করিয়া গুটানো যায়, তবে তুমি তাহা হাতের মুঠার মধ্যে বা বাক্সের মধ্যে অনায়াসে রাখিতে পার। কিন্তু সেই নল যখন জলে ভর্ত্তি করা যায়, তখন তাহাকে আর মুঠার মধ্যে রাখা যায় না,—তখন নল ফুলিয়া খাড়া হইয়া উঠে। তারা-মাছদের সেই ছোট পা-গুলি এক একটা খুব সরু নলের মত জিনিস, সেগুলির আগাগোড়াই ফাঁপা। কিন্তু নলের দুই মুখই বন্ধ থাকে না। ইহার যে দিক্‌টা গায়ে লাগানো থাকে, সেটা খোলাই থাকে এবং অন্য মুখটা একেবারে বন্ধ দেখা যায়।

এখানে তারা-মাছের আর একটা ছবি দিলাম। ইহা দেখিলে তাহার হাত ও মুখের চারিদিকের অবস্থা জানিতে পারিবে। ছবির ঝাঁঝরিওয়ালা অংশটা জলপ্রবেশের পথ। তার পরে, মাছের কাঁটার মত আর যে-সব অংশ দেখিতেছ,—সেগুলি সত্যই কাঁটা নয়,—জলের নল। কলিকাতা বা ঢাকার মত বড় সহরের মাটীর তলা যেমন নর্দ্দমা ও জলের নলে আচ্ছন্ন থাকে,—তারা মাছের সর্ব্ব শরীর সেই রকম নলে নলে ঢাকা আছে। ছবির দুই পাশে চিরুণীর দাঁতের মত অংশগুলি তারা-মাছের পা।
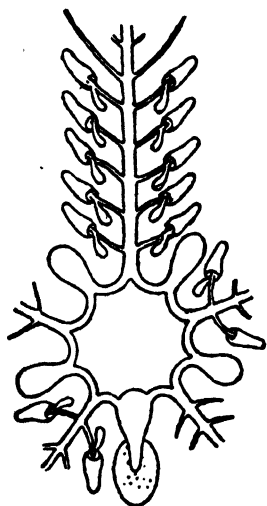
চিত্র—১৩। তারা মাছের একটা হাত

আগেই বলিয়াছি, এগুলি ফাঁপা নল, কেবল বাহিরের মুখটা বন্ধ। ঝাঁঝরি-ওয়ালা পথ দিয়া জল দেহে প্রবেশ করে এবং তার পরে ঐ সকল নল দিয়া তাহা শরীরে চলাফেরা করে। কাজেই, বাহিরের জল যখন ঝাঁঝরি দিয়া আসিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া পায়ের নলে পৌঁছে, তখন পা খাড়া হইয়া উঠে এবং যখন জল না আসে, তখন উহা গুটানো অবস্থায় থাকে।

প্রত্যেক পায়ের গোড়ায় এক একটি গাঁটের মত যে অংশ দেখিতে পাইতেছ, সেগুলি জলের থলি। তারা-মাছ

ঐ সকল থালিতে জল জমাইয়া রাখে এবং যখন এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইবার দরকার হয়, তখন জল টানিয়া পায়ের নল খাড়া করে এবং চলিতে আরম্ভ করে। এই রকমে চলিয়া বেড়াইবার উপায়, আর কোনো প্রাণীর শরীরে দেখা যায় না।

অক্সিজেন্ বাষ্প দেহে না লইলে প্রাণীরা বাঁচে না। জলে যে বাতাস মিশানো থাকে, তাহাতে অনেক অক্সিজেন্ বাষ্প থাকে—ইহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। শরীরের নলের ভিতর দিয়া যে জল যাওয়া-আসা করে, তারা-মাছেরা তাহা হইতে অক্সিজেন্ বাষ্প চুষিয়া লইয়া জীবিত থাকে। গোরু, ভেড়া, মানুষ প্রভৃতি প্রাণীরা বাহিরের বাতাস নাক দিয়া দেহের মধ্যে টানিয়া লয় এবং শেষে শরীরের ভিতর-কার ফুস্‌ফুস্ সেই বাতাসের অক্সিজেন্ শুষিয়া লয়। মাছ ও কাঁকড়াদের নাক বা ফুস্‌ফুস্ নাই; কান্‌কো দিয়া ইহারা ফুস্‌ফুসের কাজ চালায়। ইহারা কান্‌কো দিয়াই জলে-মিশানো বাতাসের অক্সিজেন্ টানিয়া লয়। তারা-মাছদের দেহের উপরে কান্‌কোর মত কতকগুলি অংশ আছে, ইহারা কখনো কখনো সেই পথেও অক্সিজেন্ টানিয়া লইতে পারে।

আমরা এ-পর্য্যন্ত যে-সকল প্রাণীর কথা বলিয়াছি, তাহাদের মধ্যে কোনোটিরই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ দেখা যায় নাই। কিন্তু তারা-মাছদের কতক স্ত্রী এবং কতক পুরুষ হইয়া জন্মে।

স্ত্রী-মাছের প্রত্যেক হাতের গোড়ায় ডিম রাখিবার জায়গা আছে। সেখানে ডিম জন্মিয়া বড় হইলে, তাহা হইতে ছোট ছোট তারা-মাছ বাহির হয়।

মানুষ, বানর, শিয়াল, কুকুর প্রভৃতি বড় জন্তুদের যদি হাত, পা বা অপর কোনো অঙ্গ নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহার জায়গায় আর নূতন অঙ্গ গজায় না। আমাদের চুল বা নখ কাটা পড়িলে, সেইগুলিকেই কেবল নূতন করিয়া গজাইতে দেখা যায়। কিন্তু খুব নিকৃষ্ট প্রাণীর কোনো বিশেষ অঙ্গ নষ্ট হইলে, শূন্য স্থানে আপনা হইতেই নূতন অঙ্গ উৎপন্ন হয়। কোনো রকম আঘাত পাইলে টিকটিকির লেজ খসিয়া যায়—ইহা তোমরা দেখ নাই কি? কিন্তু একবার লেজ খসিলে টিক্‌টিকি চিরদিনই লাঙ্গুলহীন থাকে না। কিছুদিনের মধ্যেই তাহার নূতন লেজ গজাইতে আরম্ভ করে। তারা-মাছেও ঠিক্ তাহাই দেখা যায়। কোনো রকমে যদি ইহাদের একটা হাত নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে কয়েক দিনের মধ্যেই শূন্য জায়গায় আবার নূতন হাত গজাইয়া উঠে। কেবল ইহাই নয়,—তোমরা যদি একটি তারা-মাছকে ধরিয়া তাহার শরীরের কিছু অংশের সহিত একখানা হাত কাটিয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দাও, তবে তাহার সেই হাত হইতে একটি নূতন তারা-মাছের সৃষ্টি দেখিবে। ইহাদের যেন মৃত্যু নাই!

যাহা হউক, আমরা তারা-মাছের যে অল্প পরিচয় দিলাম, তাহা হইতে তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ,—ইহারা খুব

নীচু শাখার প্রাণীদের চেয়ে অনেক উন্নত। ইহাদের শরীরে পাকযন্ত্র, ডিম্বাশয় শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র ইত্যাদির এক-একটু চিহ্ন আছে। প্রাণীদের রক্তে সাদা এবং লাল, এই দুই রকমের কণিকা ভাসিয়া বেড়ায়। রক্তের লাল-কণিকা-গুলির দ্বারাই তাহার রঙ্ লাল হয়। তারা-মাছদের শরীরেও রক্ত আছে, কিন্তু তাহাতে লাল-কণিকা নাই। এইজন্য ইহাদের রক্ত সাদা। যখন ছোট পা-গুলি বাহির করিয়া ইহারা সমস্ত শরীর দোলাইয়া চলিতে আরম্ভ করে, তখন চলার আন্দোলনে সেই সাদা রক্ত সমস্ত শরীরের ভিতরে চলাফেরা আরম্ভ করে। শরীরের সকল জায়গায় রক্ত চালাইবার জন্য বড় বড় প্রাণীদের দেহে হৃদ্‌যন্ত্র আছে। তোমরা যেমন পিচ্‌কারী দিয়া রঙ্ ছিটাও, বড় প্রাণীদের দেহের হৃদ্‌পিণ্ড সেই প্রকারে শরীরের শিরা-উপশিরা দিয়া সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চালাইয়া থাকে। কিন্তু তারা-মাছদের দেহে হৃদ্‌পিণ্ড পাওয়া যায় নাই।

স্নায়ুমণ্ডলী

প্রাণীদের মৃতদেহ কাটিয়া পরীক্ষা করিলে, তাহার সকল অংশে খুব সরু সূতার জালের মত একটি জিনিস দেখা যায়। বড় বড় প্রাণীদেরও শরীর এই সূতার জালে আচ্ছন্ন থাকে। এই জালকে স্নায়ুমণ্ডলী বলে। চোখ দিয়া আমরা দেখি, কান দিয়া আমরা শুনি, নাক দিয়া আমরা গন্ধ পাই, জিভ দিয়া স্বাদ পাই, গায়ে চিম্‌টি কাটিলে বেদনা পাই—এই সকল বোধ স্নায়ুমণ্ডলীই উৎপন্ন করে। বড় প্রাণীদের মাথার ভিতরে যে মগজ অর্থাৎ মস্তিষ্ক আছে, শরীরের সকল স্নায়ুই সেই মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে। শরীরের কোনো অংশে কোনো রকমে আঘাত লাগিলে সেই আঘাতের উত্তেজনা স্নায়ুর সূতা বহিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছে এবং ইহাতে সেই আঘাত প্রাণীরা বুঝিতে পারে।

মনে কর, তোমার পায়ের এক জায়গায় আস্তে চিম্‌টি কাটা গেল এবং ইহাতে একটু বেদনা বোধ করিলে। কি রকমে এই বেদনার সৃষ্টি হইল, তাহা খোঁজ করিলে দেখা যায়—চিম্‌টির আঘাত পাইলেই আহত জায়গার স্নায়ুগুলি উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং আঘাতের উত্তেজনাটা মস্তিষ্কে বহিয়া লইয়া যায়। তার পরে মস্তিষ্কই তোমাকে চিম্‌টির বেদনা জানাইয়া দেয়। কেবল চিম্‌টির বেদনা বহন করা

স্নায়ুর কাজ নয়। ভালো রসগোল্লা খাইলে তোমরা যে সুস্বাদ পাও, নাকের কাছে ফুল বা অপর জিনিস রাখিলে যে গন্ধ পাও, গায়ে হাত বুলাইলে যে আরাম পাও, ছেলেরা চীৎকার করিলে যে শব্দ শুনিতে পাও,—তাহাদের প্রত্যেকটি স্নায়ুই তোমাদের জানাইয়া দেয়। স্নায়ুর সূতাগুলি যেন টেলিগ্রাফের তার। এগুলি ঠিক টেলিগ্রাফের তারের মতই শরীরের এক জায়গার খবর আর এক জায়গায় বহিয়া লইয়া যায়। তার ছিঁড়িলে টেলিগ্রাফের খবর চলে না, সেই রকম স্নায়ুমণ্ডলী কোনো প্রকারে খারাপ হইয়া গেলে, মস্তিষ্কে খবর যায় না। পা চাপিয়া অনেকক্ষণ এক জায়গায় বসিয়া থাকিলে পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরে। তখন পা-খানা যেন অসাড় হইয়া পড়ে, পায়ে জোরে চিম্‌টি কাটিলে ব্যথা লাগে না; পায়ে হাত বুলাইয়া দিলেও সাড়া পাওয়া যায় না। পায়ের স্নায়ু কিছুকালের জন্য বিগ্‌ড়াইয়া যায় বলিয়াই এই সকল ব্যাপার হয়। এই অবস্থায় পায়ের স্নায়ু চিম্‌টির উত্তেজনা বা হাতের স্পর্শ মস্তিষ্কে বহিয়া আনিতে পারে না; কাজেই, তখন আমরা চিম্‌টির বেদনা বা হাতের স্পর্শ জানিতে পারি না। পক্ষাঘাত প্রভৃতি অনেক রোগে শরীরের স্নায়ু বিগ্‌ড়াইয়া যায়, তখন গায়ে হাত দিলে বা চিম্‌টি কাটিলে রোগী কিছুই বুঝিতে পারে না।

কেবল এইগুলিই যে স্নায়ুর কাজ, তাহা নয়। তোমার স্মৃতিশক্তি, তোমার স্নেহভক্তি, দয়ামমতা সকলি স্নায়ুমণ্ডলী

তোমার মনে জাগাইয়া রাখে। তুমি কোনো খারাপ লোককে দেখিলে যে ঘৃণা কর, ভালো কথা শুনিলে যে আনন্দ পাও, অন্ধকারে সাপ বা বিছে দেখিলে যে ভয় পাও,—তাহাও স্নায়ুর কাজ।

মনে কর, তোমার মুখের উপরে একটি মাছি বসিয়া মনের আনন্দে একবার নাকের ডগায়, একবার ওষ্ঠের উপরে এবং একবার চোখের পাতায় বেড়াইতেছে। এই অবস্থায় তুমি কি হাত গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পার? কখনই পার না। তোমার হাত আপনা হইতে মাছির কাছে যায় এবং তুমি হাত দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দাও। ইহাও স্নায়ুর আর এক রকম কাজ। মাছির উৎপাতের খবর, মুখের স্নায়ুজাল মস্তিষ্কে বহিয়া লইয়া যায়। তার পরে মস্তিষ্ক সেই খবর আর এক রকম স্নায়ু দিয়া হাতের পেশীর উপরে চালান করে। হাতের পেশী মস্তিষ্কের হুকুম অমান্য করিতে পারে না; কাজেই, সব কাজ ফেলিয়া সে মাছি তাড়াইতে আরম্ভ করে।

কোনো দুর্গন্ধ পাইলে তোমরা নাকে কাপড় দাও। এখানেও স্নায়ুর কাজ দেখিতে পাওয়া যায়। খারাপ গন্ধ প্রথমে নাকের স্নায়ু উত্তেজিত করে এবং স্নায়ু সেই উত্তেজনা মস্তিষ্কে বহিয়া লইয়া যায়। কিন্তু মস্তিষ্ক এই খবর পাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; সে নাকে কাপড় গুঁজিবার জন্য নিকটের একপ্রকার স্নায়ুকে হুকুম করে। এই হুকুম

হাতের মাংসপেশীতে পৌঁছিলে, তুমি নাকে কাপড় গুঁজিতে আরম্ভ কর। মজার গল্প শুনিলে আমরা হাসিয়া গড়াগড়ি দিই; হাতে আগুন ঠেকিলে হাতখানা সরাইয়া লই। আমাদের এই রকম সকল কাজই শরীরের দুই রকম স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের সাহায্যে চলে।

যাহা হউক স্নায়ুসম্বন্ধে আমরা এ-পর্য্যন্ত যে-সকল কথা বলিলাম, তাহা হইতে বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিতেছ,—স্নায়ুই প্রাণীকে সজাগ ও বুদ্ধিমান্ করে। আমিবা, স্পঞ্জ্ বা প্রবাল-প্রাণীর দেহে স্নায়ু নাই, এইজন্য, তাহারা জড়ের মত পড়িয়া থাকে; যদি খাবার কাছে আসে তবেই খায়, নচেৎ ক্ষুধায় মরিয়া যায়। গায়ের কোনো অংশ কাটিয়া ফেলিলেও তাহারা সাড়া দেয় না। কিন্তু যে তারা-মাছদের কথা বলিয়াছি, তাহারা এই-রকম নয়। ইহাদের গায়ের চামড়ার নীচে অল্প পরিমাণে স্নায়ু দেখা যায়; তাই বড় বড় প্রাণীর মত ইহারা চলা-ফেরা করিতে পারে এবং নিজের বিপদ-আপদ বুঝিতে পারে।

তারা-মাছদের মত আরো কয়েক জাতির প্রাণী চতুর্থ শাখায় আছে। ইহাদের মধ্যে কাহারো দেহ গোলাকার, তাহা খোলা ও কাঁটা দিয়া ঢাকা থাকে, কেহ লম্বা দেহ লইয়া গুঁড়ি মারিয়া জলের তলায় চলে। ইহাদের সকলেরি শরীরের কাজ তারা-মাছদের মতই দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্রের তলায় খোঁজ না করিলে এই সকল প্রাণীর

সন্ধান মেলে না। তোমাদের মধ্যে হয় ত অনেকেই সমুদ্র দেখ নাই, কাজেই, এই সকল প্রাণীর কোনো কথা তোমাদিগকে বলিব না। যদি কখনো কলিকাতায় যাদুঘর দেখিতে যাও, তাহা হইলে সেখানে বোতলের ভিতরে তারা-মাছ এবং এই শাখার অন্য প্রাণীদিগের আকৃতি দেখিতে পাইবে। সেখানে এই রকম আরো অনেক মরা-প্রাণীর দেহ বোতলের ভিতরে আরক দিয়া রাখা হইয়াছে এবং বোতলের পাশে সেই সকল প্রাণীর ভালো ছবিও আছে।

পঞ্চম শাখার প্রাণী

এ-পর্য্যন্ত আমরা জলের প্রাণীদের কথা বলিয়া আসিয়াছি। এইবারে ডাঙার প্রাণীর কথা আরম্ভ করিব। তোমাদের বাগানে গাছে গাছে যে-সব প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কথা এখন বলিব না। ইহাদের সকলেই উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী; অনেক যন্ত্র ও ইন্দ্রিয় লইয়া ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে; তাহার উপরে আবার ইহারা স্বাভাবিক বুদ্ধি লইয়া জন্মে। যে-সকল ডাঙার প্রাণী শরীরের বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই এবং যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করি, প্রথমে তাহাদেরি মধ্যে কয়েকটির পরিচয় দিব।

কেঁচো

তোমরা সকলেই কেঁচো দেখিয়াছ। কি বিশ্রী প্রাণী! হাত, পা, চোখ, নাক, কিছুই নাই। বাদলের দিনে জল-কাদায় যখন বুকে হাঁটিয়া চলে, তখন তাহাদের দেখিলেই যেন গা ঘিন্-ঘিন্ করে। কিন্তু ইহারা অতি নিরীহ প্রাণী,—

সাপের মত কামড়ায় না এবং কখনো কাহারো অনিষ্টও করে না ; নিজের আহারের চেষ্টায় লুকাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

জলে কেঁচোরা স্থান পায় না ; নিশ্চিন্ত হইয়া যে, ডাঙায় ঘুরিয়া বেড়াইবে তাহারো উপায় নাই। কেঁচো দেখিলে পিঁপ্‌ড়েরা দল বাঁধিয়া তাহাকে আক্রমণ করে ; মাছেরা কেঁচো পাইলে পরম আনন্দে ভোজ লাগায়। এই সকল উপদ্রবের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কেঁচো মাটীর তলায় লুকাইয়া বাস করে। রাত্রি আসিলে, তাহারা চুপি চুপি গর্ত্ত হইতে বাহির হয় এবং খাবার চেষ্টায় একটু এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়ায়। কেবল বাদলের সময়ে ইহারা দিনের বেলায় গর্ত্তের বাহিরে আসে। অল্প জল গায়ে লাগিলে ইহাদের খুব আনন্দ হয়।

কেঁচোর দেহটা কি রকম, তোমরা বোধ হয় ভালো করিয়া দেখ নাই। বড় বড় গাছের তলায় বা অন্য ভিজে জায়গায় মাটির নীচে প্রায়ই অনেক কেঁচো থাকে। এই রকম জায়গায় মাটি খুঁড়িয়া দুই একটা বড় কেঁচো সংগ্রহ করিয়ো এবং তাহাদের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। পরীক্ষার জন্য যদি ইহাদিগকে জীবন্ত রাখিতে চাও, তবে একটি ছোট পাত্রে কিছু ভিজা মাটি ও পচা পাতা মিশাইয়া তাহাতে তিন চারিটি কেঁচো ছাড়িয়া দিয়ো। এই রকমে তাহারা বেশ আরামে থাকিবে। তার পরে যখন দরকার হইবে, দুই-একটাকে পাত্র হইতে উঠাইয়া তোমাদের ঘরে মেজের উপরে

বা কাগজের উপরে ছাড়িয়া দিয়ো। এই রকমে ইহাদের দেহের খুঁটিনাটি ও তাহাদের চলাফেরা ভালো করিয়া দেখিতে পাইবে। ছোট জিনিসকে বড় করিয়া দেখার জন্য এক রকম কাচ আছে; ইহাকে আতসী কাচ (Magnifying Glass) বলে। সেই রকম কাচ দিয়া পরীক্ষা করিলে, তোমরা কেঁচোর শরীরের ছোটখাটো অংশও বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

এখানে কেঁচোর একটা ছবি দিলাম। দেখ; মুখটা কত সরু। এই রকম ছুঁচ্‌লো মুখ আছে বলিয়াই ইহারা

চিত্র ১৪—কেঁচো

সহজে মাটিতে গর্ত্ত করিতে পারে। তার পরে দেখ, শরীরের আগাগোড়ায় খুব ঘন ঘন দাগ কাটা আছে। গুণিলে এই দাগের সংখ্যা একশত পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়। ছবিতে কিন্তু ততগুলি দাগ দেওয়া হয় নাই। এক-একটি দাগ আংটির মত কেঁচোর দেহ ঘেরিয়া থাকে। বাচ্চা কেঁচোর গায়ে তোমরা হয়ত এই রকম দাগ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু আতসী কাচ দিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই দাগ নজরে পড়িবে। পিঁপ্‌ড়ে, প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি পোকার শরীরের উপরটা নরম হাড়ের মত একটা জিনিস দিয়া ঢাকা থাকে এবং তাহা

আংটির আকারে সাজানো থাকে। কেঁচোর গায়ের আংটিগুলি সে-রকম শক্ত জিনিসে প্রস্তুত নয়। সেগুলিতে কেবল রবারের মত মাংসপেশীই আছে। প্রজাপতি প্রভৃতি প্রাণীরা প্রথমে ডিমের আকারে জন্মে। তার পরে উহারা ডিম হইতে বাহির হইয়া শুঁয়ো-পোকার মত হয়; তার পরে কিছুদিন নির্জ্জীবভাবে অনাহারে পড়িয়া থাকে; এবং সকলের শেষে তাহারা ডানা-ওয়ালা প্রাণী হইয়া দাঁড়ায়। পতঙ্গদের শরীরের এই সব পরিবর্ত্তনের কথা তোমাদিগকে পরে বলিব। কেঁচোর শরীরের এই রকম পরিবর্ত্তন হয় না,—ইহারা চিরজীবনই বুকে হাঁটিয়া চলে। তা'ছাড়া শুঁয়ো-পোকাদের দেহের আংটির গায়ে যেমন পা লাগানো থাকে, ইহাদের তাহা থাকে না। এই সকল কারণে কেঁচো শুঁয়ো-পোকাদের দলের প্রাণী নয়। যে-সকল জলের প্রাণীর কথা তোমরা আগে শুনিয়াছ, তাহাদেরি সঙ্গে কেঁচোর খুব নিকট সম্বন্ধ আছে। তাই ইহারা আজও ভিজে জায়গা ভিন্ন অন্য কোনো স্থানে থাকিতে পারে না। কেঁচোর চোখ নাই। যারা মাটির তলায় অন্ধকারে চিরজীবন কাটায়, তাদের চোখের দরকারও হয় না। কিন্তু শুঁয়ো-পোকাদের চোখ আছে এবং আরো অনেক ইন্দ্রিয় আছে, ইহারা প্রাণীদের মধ্যে খুব উন্নত; কেঁচো নিতান্ত অধম প্রাণী। পাছে তোমরা কেঁচো ও শুঁয়ো-পোকাদের একই রকমের প্রাণী বলিয়া মনে কর,—সেই ভয়ে এই কথাগুলি বলিলাম।

তোমরা যদি কেঁচোর গায়ে ধীরে ধীরে আঙুল বুলাইতে পার, তবে বুঝিবে, আঙুলে যেন কাঁটা-কাঁটা কি ঠেকিতেছে। লেজের দিক্ হইতে মাথার দিকে আঙুল টানিয়া লইলে, ইহা বুঝা যায়; মাথার দিক্ হইতে লেজের দিকে আঙুল টানিলে, আঙুলে কিছুই ঠেকে না। তোমরা হয়ত ভাবিতেছ, কেঁচোর দেহে যে আংটির মত দাগ কাটা আছে, তাহাই বুঝি আঙুলে ঠেকে,—কিন্তু তাহা নয়। এখানে কেঁচোর শরীরের গোটা তিনেক আংটির ছবি দিলাম। আতসী কাচে যে রকম বড় দেখায় ছবিগুলি ঠিক্ সেই রকমে আঁকা আছে। দেখ,—প্রত্যেক আংটিতে শুঁয়োর মত চারিটি করিয়া অংশ লাগানো আছে এবং সেগুলি আবার বাঁকিয়া লেজের দিকে ঝুঁকিয়া আছে। কাজেই, যখন তুমি লেজ হইতে মাথার দিকে আঙুল টানিয়া লও, তখন সেই বাঁকা ও শক্ত শুঁয়োগুলি খাড়া হইয়া উঠিয়া আঙুলে বাধা দেয়। কিন্তু মাথা হইতে লেজের দিকে আঙুল টানিলে সেগুলি আরো ঝুঁকিয়া পড়ে, ইহাতে আঙুলে একটুও বাধা লাগে না।

চিত্র ১৫—কেঁচোর গায়ের আংটির শুঁয়ো

বাদলের দিনে কেঁচো কি রকমে মাটির উপর দিয়া বুকে হাঁটিয়া চলে, তোমরা দেখিয়াছ কি? যদি না দেখিয়া থাক, তবে বাদল হইলেই তোমাদের বাড়ীর আঙিনার কেঁচোগুলার চলা-ফেরা লক্ষ্য করিয়ো। ইহারা প্রথমে শরীরের মুখের

দিকের খানিক অংশ টানিয়া লম্বা করে। এই রকমে তাহারা কিছু দূর আগাইয়া যায় বটে, কিন্তু লেজের দিকটা মোটেই অগ্রসর হয় না। ইহার পরেই তাহারা সেই মুখের দিকের অংশটাকে কোঁচ্‌কাইয়া পিছনের শরীরটাকে টানিতে থাকে। পিছনের দেহ ইহাতে অগ্রসর হয়। কোঁচ্‌কাইলেই শরীর পিছাইয়া পড়ে; কিন্তু কেঁচোর শরীরে প্রত্যেক অংশটিতে যে শুঁয়োগুলি লেজের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, সেগুলি মাটির গায়ে বাধা পাইয়া খাড়া হইয়া উঠে; কাজেই, কোঁচ্‌কাইলেও কেঁচোর সম্মুখের দেহ আর পিছাইতে পারে না। এই রকমে ইহারা একবার সাম্‌নের দিক্‌টাকে বাড়াইয়া অগ্রসর হয় এবং পরে তাহাই শুঁয়ো দিয়া আট্‌কাইয়া পিছনের দেহটাকে টানিয়া লয়। এই উপায়ে কেঁচোরা খুব তাড়াতাড়ি সাম্‌নের দিকে চলিতে পারে। কিন্তু পিছু হটিয়া চলা ইহাদের অসাধ্য। পিছনে চলিতে গেলেই শুঁয়োগুলি মাটিতে বাধা পাইয়া খাড়া হইয়া উঠে, তখন কেঁচো আর পিছাইতে পারে না। কেঁচোর চলা-ফেরা লক্ষ্য করিলে দেখিবে, তাহারা কখনই পিছাইয়া চলে না।

কেঁচোর মুখে দাঁত নাই; খুব শক্ত মাংসপেশী দিয়া তাহাদের মুখ প্রস্তুত। সেই মুখ দিয়া তাহারা খাবার খায় এবং গর্ত্তও খোঁড়ে। মানুষ ও অন্য বড় প্রাণীদের শরীরে উদর ও নাড়ীভুঁড়ি অর্থাৎ পাকাশয় পৃথক্ থাকে। কিছু খাইলে খাবার প্রথমে উদরে (Stomach) যায়; সেখানে

একটু হজম হইলে তাহা দড়ার মত মোটা ও লম্বা পাকাশয় অর্থাৎ অন্ত্রে (Intestines) গিয়া পোঁছে। এখানে খাদ্য ভালো করিয়া হজম হয় এবং তাহাতে যে সারবস্তু থাকে তাহা শরীরে টানিয়া লয়। তোমরা হয়ত ছাগল বা ভেড়ার পেটের ভিতরকার উদর ও পাকাশয় দেখিয়া থাকিবে। দড়াদড়ির মত অংশটাই পাকাশয় এবং তাহারি উপরে যে থলির মত অংশ থাকে, তাহা উদর। কেঁচোদের শরীরে স্পষ্ট উদর বা পাকাশয় নাই। ইহাদের দেহের ভিতরটা দেখিলে মনে হয় যেন একটা নল মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহাই তাহাদের গলার ছিদ্র, উদর, পাকাশয় ইত্যাদি সকলেরি কাজ করে। সুতরাং কেঁচোকে যদি পেট-সর্ব্বস্ব প্রাণী নাম দাও, তাহা হইলে ঠিক্ কথাই বলা হয়।

খাবার হজম করিবার জন্য বড় প্রাণীদের দেহের ভিতর হইতে নানা প্রকার রস বাহির হইয়া উদরে ও পাকাশয়ে আসিয়া পড়ে। খাবারের সঙ্গে যে মাছ, মাংস, ডিম আমাদের পেটে যায়, তাহা এক রকম রসে হজম হয়। আবার ঘি, তেল, চর্ব্বি প্রভৃতি জিনিস অন্য কয়েক রকম রসে পরিপাক হয়। কেঁচোরা এই রকম সুখাদ্য জিনিস খায় না, তাহাদের পাকযন্ত্রও জটিল নয়। কেঁচোরা মাটি খায় এবং কখনো কখনো দুই একটা টাট্‌কা পাতা বা ঘাস টানিয়া গর্ত্তের মুখে রাখে। মাটির সঙ্গে যে পচা লতা-পাতা প্রভৃতি মিশানো থাকে, তাহাই উহাদের দেহগুলিকে পুষ্ট করে। এই রকমে সার

ভাগ লইলে খাঁটি মাটি বাকি থাকে, তাহা ইহারা লেজের দিকের ছিদ্র দিয়া গর্ত্তের বাহিরে ফেলিয়া দেয়। কেঁচোর গর্ত্তের উপরে জিলাপির মত প্যাঁচ-ওয়ালা যে মাটি জমা থাকে, তাহা বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। উহাই সেই পরিত্যক্ত মাটি; ইহাকে কেঁচোর বিষ্ঠাও বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, মাটিতে-মিশানো পচা লতা-পাতা হজম করার জন্য কেঁচোদের কষ্ট করিতে হয় না। ইহাদের মুখ হইতে একরকম লালা বাহির হয়, তাহা দিয়াই ইহারা খাবারের মাটি ভিজাইয়া ফেলে এবং তাহা দিয়াই খাদ্য হজম করে। চূণ, কাঠের ছাই এবং কষ্টিক্ ইত্যাদি জিনিস হাতে লাগাইলে হাতের চামড়ার ক্ষয় হয় এবং শেষে হাতে ঘা হইয়া পড়ে। এই সকল জিনিসকে ক্ষার বলে। কেঁচোর মুখ হইতে যে লালা বাহির হয়, তাহাতেও ক্ষারের গুণ আছে। এইজন্য তাজা সবুজ পাতায় কেঁচোর লালা লাগিলে, তাহার রঙ্ লাল হইয়া যায়।

এখানে কেঁচোর শরীরের ভিতরকার যন্ত্রের একটা
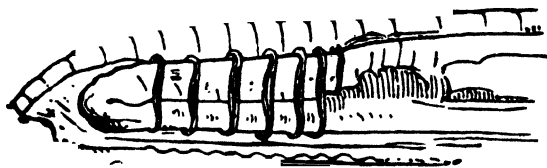
চিত্র ১৬

ছবি দিলাম। ভিতরে যে নলটি রহিয়াছে, উহাই কেঁচোর

পাকযন্ত্র। ইহার উপরে যে গাঢ় কালো অংশগুলি পাকনালীকে ঘেরিয়া আছে, উহা কেঁচোর রক্তের শিরা। মানুষ ও অন্য মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণীদের দেহের রক্ত লাল,—কেঁচোর রক্তও লাল। তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি, প্রাণীর রক্ত অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে, তাহাতে একরকম ছোট লাল-কণা ভাসিতে দেখা যায়, এই লাল-কণাই রক্তকে লাল করে, আসলে রক্ত সাদা। কেঁচোর রক্ত লাল হইলেও তাহাতে লাল-কণা একটিও থাকে না। কাজেই বলিতে হয়, কেঁচোর রক্ত স্বভাবতঃ লাল।

গায়ে রক্ত থাকিলে তাহা যাহাতে শরীরের সকল জায়গায় চলাচল করে তাহার ব্যবস্থা দরকার। মানুষ ও অন্য বড় প্রাণীদের শরীরে হৃদ্‌পিণ্ড আছে, তাহা দিবারাত্রি দপ্ দপ্ করিয়া শরীরের ভিতরকার শিরায় এবং উপশিরায় রক্তের স্রোত চালায়। কেঁচোর বুকে হৃদ্‌পিণ্ড নাই; তাহাদের দেহের যে-সকল শিরা রক্তে ভরা থাকে, তাহাই দপ্ দপ্ করে এবং সঙ্গে তাহারি শাখাপ্রশাখা ও সরু শিরা দিয়া সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ছড়াইয়া পড়ে।

কিছুক্ষণ শরীরের ভিতরে চলাচল করিলে সকল প্রাণীরই রক্ত খারাপ হইয়া যায়। কাজেই, তখন বদ্ রক্তকে তাজা করিয়া না লইলে শরীরের কাজ চলে না। বড় বড় প্রাণীদের দেহে রক্ত নির্ম্মল করিবার খুব ভালো ব্যবস্থা আছে। তাহারা প্রতি নিশ্বাসে বাতাসের অক্সিজেন্

বাষ্প ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করায় এবং তাহাই রক্ত সাফ্ করে। কোনো মলিন জিনিসকে সাফ্ করিলে অনেক ময়লা জড় হয়। শরীরের রক্ত যখন সাফ্ হয়, তখনো সেই রকমে অনেক ময়লা শরীরে জমা হয়। বড় প্রাণীদের দেহের এই ময়লার অধিকাংশই মূত্রের আকারে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। যে যন্ত্রে এই ময়লা জমা হয়, তাহাকে ইংরাজিতে Kidney অর্থাৎ মূত্রাশয় বলে। কেঁচোর দেহে রক্ত চলাচল করে, কিন্তু রক্ত সাফ্ করিবার জন্য ফুস্‌ফুস্ নাই। তোমরা হয়ত দেখিয়াছ, কেঁচোর গায়ের উপরটা সর্ব্বদাই ভিজে ভিজে থাকে এবং পাত্‌লা চামড়ার নীচের শিরা দিয়া রক্ত চলাচল করে। ইহাতে বাহিরের বাতাসের অক্সিজেন অতি সহজে রক্তের সহিত মিশিয়া যায় এবং অঙ্গারক বাষ্প প্রভৃতি শরীরের পক্ষে খারাপ বাষ্পও পাত্‌লা চাম্‌ড়া ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। সুতরাং বলিতে হয়, কেঁচো তাহার সকল শরীর দিয়া নিশ্বাস লয়। মানুষের মুখ নাক চাপিয়া রাখিলে, শরীরে অক্সিজেন্ যাইতে পারে না; কিছুক্ষণ এই অবস্থায় থাকিলে তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু কেঁচোদের সে বালাই নাই,—মুখ চাপিয়া ধরিলে কেঁচো মরে না। রক্তের আবর্জ্জনা এক সুন্দর উপায়ে ইহাদের শরীর হইতে বাহির হয়। দেহে যে আংটির মত অনেক অংশ আছে, তাহাদের সহিত এক একটি নল লাগানো থাকে। এই নলের একটা মুখ পেটের ভিতরে থাকে এবং অপর মুখটা দেহের

পাশে আসিয়া শেষ হয়। রক্তের ও শরীরের অনেক আবর্জ্জনা ঐ নলের মুখ দিয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে।

দেহে স্নায়ু না থাকিলে প্রাণীরা জড়ের মত হয়। স্নায়ু আছে বলিয়াই তাহারা বাহিরের অবস্থা জানিতে পারে, কিছু গায়ে ঠেকিলে তাহা বুঝিতে পারে, শত্রুরা আক্রমণ করিলে তাহা জানিয়া নিজেদের রক্ষা করিতে পারে। প্রাণীর দেহের স্নায়ুমণ্ডলী আরো যে সকল কাজ করে, তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কেঁচোর দেহে অনেক স্নায়ু আছে; এই জন্যই গায়ে হাত দিলে ইহারা পলাইতে চেষ্টা করে এবং ব্যাঙ্ বা অপর প্রাণীরা চাপিয়া ধরিলে বেদনায় ঝট্‌ফট্ করে।

কেঁচোর দেহে কি রকমে স্নায়ু সাজানো থাকে, এখানে তাহার একটি ছবি দিলাম। দেখ,—পেটের তলা দিয়া কেমন মোটা স্নায়ু মুখ হইতে লেজের দিকে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই স্নায়ুর সূতা একটি নয়, যদি ছবিখানি ভালো করিয়া পরীক্ষা কর, তবে জানিতে পারিবে, দুইটি স্নায়ু পাশাপাশি সাজানো আছে, তাই উহাকে মোটা দেখাইতেছে। এই জোড়া স্নায়ু মুখের ঠিক্ নীচে তফাৎ হইয়া মুখের উপরে আসিয়া আবার একত্র হইয়াছে। বড় প্রাণীদের মস্তিষ্কে

চিত্র ১৭—কেঁচোর দেহের স্নায়ুমণ্ডলী

যেমন দেহের সমস্ত স্নায়ু নানা দিক্ হইতে আসিয়া জড় হয়, এখানে যেন তাহাই হইয়াছে।

কিন্তু এই স্নায়ু দুইটিতেই কেঁচোর স্নায়ুমণ্ডলী শেষ হয় নাই। ঐ দুইটির প্রত্যেকটি হইতে অনেক ছোট স্নায়ু ডালপালার মত বাহির হইয়া দেহ আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। বাম্ দিকের স্নায়ুগুলি যে-রকমে সাজানো থাকে ডাইনের স্নায়ু সেই রকমেই সাজানো দেখা যায়; কিন্তু দুই দিকের স্নায়ুর মধ্যে কোনো যোগ থাকে না। শরীরের ডাইনে এবং বামে এই রকম সম্পূর্ণ পৃথক্ স্নায়ু অনেক প্রাণীর দেহেই দেখা যায়। কেঁচো, ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি পোকা-মাকড়দের দেহেও ইহা আছে। এই রকম স্নায়ু-ওয়ালা প্রাণীদের দ্বিপার্শ্বিক (Bilateral) বলা হয়। চক্ষুহীন হইয়াও কেঁচোরা এই স্নায়ু দিয়া আলো-আঁধার বুঝিতে পারে এবং একটু জোরে বাতাস বহিয়া গায়ে ঠেকিলে তাহা জানিতে পারে।

যে-রকমে কেঁচোদের বাচ্চা হয়, তাহা বড়ই আশ্চর্য্য রকমের। প্রত্যেক লাউ, কুমড়া ও শশা গাছে যেমন স্ত্রী-ফুল ও পুরুষ-ফুল ফোটে এবং তার পরে যেমন পুরুষ-ফুলের রেণু স্ত্রী-ফুলে ঠেকিলে তাহাতে ফল ধরে—কেঁচোর বাচ্চা হওয়াতেও অবিকল তাহাই দেখা যায়। প্রত্যেক কেঁচোর দেহেই এক অংশে খুব ছোট ডিম হয় এবং আর এক অংশে পুরুষ-ফুলের রেণুর মত আর একটা জিনিস জমা হয়। ডিমের গায়ে এই জিনিসটা লাগিলেই ডিম বড় হইতে আরম্ভ করে।

আমি অনেক কেঁচো পরীক্ষা করিয়া উহা দেখিয়াছি, তোমরাও একটি মোটা কেঁচো পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। পরীক্ষায় দেখিতে পাইবে, তাহার মুখের দিকে একটা জায়গায় যেন আংটির মত একটি সাদা অংশ রহিয়াছে। তোমাদের পোষা কুকুরের গলায় যেমন গলাবন্ধ অর্থাৎ 'কলার' পরাইয়া থাক,—ইহা যেন ঠিক্ সেই রকমের 'কলার'। ইহারি ভিতরে কেঁচোদের অনেক ডিম হয়। যখন ডিম ছোট থাকে, তখন ঐ 'কলার' কেঁচোর গায়ে খুব শক্ত করিয়া আঁটা থাকে। কিন্তু ডিম বড় হইলে 'কলার' আর সে-রকম গায়ে-গায়ে লাগিয়া থাকে না, তাহা আপনা হইতেই ঢিলা হইয়া যায়। এই অবস্থায় কেঁচোরা তাহা আর শরীরে আট্‌কাইয়া রাখিতে চায় না ; ধীরে ধীরে ডিমে-ভরা 'কলার' টিকে মাথার উপর দিয়া গলাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ এই ডিম মাটিতে পড়িলেই ফুটিয়া গিয়া বাচ্চা উৎপন্ন করিবে। কিন্তু তাহা করে না। স্ত্রী-ফুলের গায়ে যেমন পুরুষ-ফুলের রেণু লাগা দরকার, তেমনি এই সব ডিমের গায়ে কেঁচোর দেহের সেই রকমের পদার্থটি লাগা প্রয়োজন ; নচেৎ ডিমে বাচ্চা হয় না। যে উপায়ে কেঁচোর ডিমে পুরুস-পদার্থ লাগে, সে বড় মজার। এই জিনিসটা প্রায়ই কেঁচোদের গলার কাছে জন্মে। ডিমে-ভরা 'কলার'টি শরীর হইতে খসাইয়া ফেলিবার সময়ে যখন তাহা গলার ঐ জায়গায় আসে, তখন পুরুষ-পদার্থের সঙ্গে ডিমের

যোগ হইয়া যায়। ইহা হইলে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার আর কোনো বাধা থাকে না।

ডিমে-ভরা 'কলার' অর্থাৎ গলাবন্ধ শরীর হইতে খসিয়া পড়িলে কেঁচোরা আর তাহার যত্ন করে না এবং একবারও তাহার খোঁজ লয় না,—কাদা বা ভিজে মাটির সঙ্গে মিশিয়া তাহা পড়িয়া থাকে। তার পরে ডিমগুলি বেশ পুষ্ট হইলে, তাহা হইতে কেঁচোর বাচ্চা বাহির হয়।

আগে যে-সব প্রাণীর কথা বলিয়াছি, তাহাদের অনেকেই নিজের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া সন্তান উৎপন্ন করে। জবা-গাছের ডাল পুঁতিলে যেমন নূতন জবা-গাছ জন্মে, ইহা যেন সেই রকমের। কেঁচোরা সাধারণতঃ সে-রকমে সন্তান উৎপন্ন করে না বটে, কিন্তু যদি কোনো রকমে ইহাদের দেহ খণ্ডিত হইয়া পড়ে, তবে সম্মুখের খণ্ড হইতে লেজ বাহির হইয়া এক-একটা নূতন কেঁচো জন্মে। যদি তোমরা পরীক্ষা করিতে চাও, তবে একটা বাচ্চা কেঁচোকে টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ভিজে মাটির মধ্যে রাখিয়া দিয়ো। কিছু দিন পরে হয়ত দেখিবে, উহার শরীরের সম্মুখের টুক্‌রা হইতে এক একটি নূতন কেঁচো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই পরীক্ষা অতি সাবধানে করিতে হয়। বেশি গরম বা বেশি ঠাণ্ডায় কেঁচোদের ঐ রকম পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

পরাশ্রিত অকেজো প্রাণী

তোমরা 'কুঁড়ের রাজা' দেখিয়াছ কি? মানুষের মধ্যে খোঁজ করিলে কুঁড়ের রাজা অনেক দেখা যায়। ইহারা সংসারের একটুও ভালো কাজ করে না; খায়-দায়, ঘুমায়, তার পরে বুড়া হইয়া মরিয়া যায়। ইহাদের কিছুরই অভাব হয় না। অন্য কেহ উপার্জ্জন করিয়া খাওয়ায় বা বাপ-পিতামহেরা যে টাকা জড় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা খরচ করিয়া জীবনটা বেশ কাটাইয়া দেয়। এই সব লোক এমন অকেজো যে, যদি তাহাদিগকে খাটিয়া খাইতে বলা যায়, তবে তাহারা একটুও নড়াচড়া করে না। শেষে হয়ত অনাহারে মরিয়া যায়। কুঁড়ের রাজারা জীবনে কখনো পরিশ্রম করে না, অথচ পরের ঘাড় ভাঙিয়া খায় এবং বাবুগিরি করে। এই জন্য সমস্ত লোকে তাহাদের ঘৃণা করে; মনে করে, এমন লোক মরিয়া গেলে সংসারের একটুও ক্ষতি নাই।

কেবল মানুষের মধ্যেই যে কুঁড়ের রাজা আছে, তাহা নয়। অন্য ছোট প্রাণীদের মধ্যেও এই রকম অকেজো জানোয়ার অনেক দেখা যায়। মানুষের মধ্যে অকেজোর ছেলে কেজো হয়; কিন্তু ছোট প্রাণীদের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। অকেজো প্রাণীদের পুত্র-পৌত্র, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী সকলেই অকেজো,—ইহারা যেন অকেজোর ঝাড়! পরের ঘাড়ে চাপিয়া আরামে জীবন কাটানো ইহাদের স্বভাব।

এই রকম প্রাণী কি তোমরা দেখ নাই? কুকুরের গায়ে যে আঁটুলি থাকে, তাহা এই রকম প্রাণী। ইহারা আহারের চেষ্টায় সহজে চলা-ফেরা করিতে চায় না। কুকুরের গা কাম্‌ড়াইয়া রক্ত চুষিয়া খাওয়াই ইহাদের কাজ। কিন্তু ইহাদের পুরুষরা নিরীহ প্রাণী। তাহারা রক্ত খায় না, —রক্ত খায় স্ত্রীরাই। যদি কুকুরের গা হইতে আঁটুলি ধরিয়া তোমরা বাগানের ঘাসের মধ্যে ছাড়িয়া দাও, তবে তোমরা দেখিবে, সে অন্য এক প্রাণীর গায়ে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা ফড়িং, প্রজাপতি বা ব্যাঙের মত তাড়াতাড়ি চলা-ফেরা করিতে জানে না। পরের ঘাড়ে চাপিয়া নিজেরা আহার করে বলিয়াই, আমরা এই সব প্রাণীকে পরাশ্রিত নাম দিলাম।

কেবল আঁটুলিই পরাশ্রিত প্রাণী নয়। মাথার চুলের মধ্যে যে উকুন থাকে, তাহাও এই দলের প্রাণী। ইহারা মাথার চাম্‌ড়া কাটিয়া রক্ত খায়, মাথার চুলেই শত শত ডিম পাড়ে এবং সেগুলি হইতে যে বাচ্চা বাহির হয়, তাহারাও মাথার রক্ত খাইতে সুরু করে। যে-সব লোক কোনো ব্যবসায় বা লেখাপড়া শিক্ষা করে না, তাহারা যেমন পেটের দায়ে শেষে চুরি-ডাকাতি পর্য্যন্ত করে এবং পরের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া খায়, ইহারাও যেন সেই রকম অকেজোর দল।

গাছপালার মধ্যেও অনেক পরভোজী আছে। যাহারা কেজো গাছ, তাহারা মাটির ভিতর শিকড় চালাইয়া খাদ্য জোগাড় করে এবং হাজার হাজার সবুজ পাতা দিয়া বাতাস

হইতে অনেক খাদ্য দেহে টানিয়া লইয়া বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটায়। কিন্তু পরাশ্রিত গাছপালারা তাহা করে না। ইহারা অন্য গাছের ঘাড়ে চাপিয়া বসে এবং এই আশ্রয়-গাছেরই রস নিজের শিকড় দিয়া টানিয়া আহার করে। এই রকম গাছকে পরগাছা বলে। আম গাছে প্রায়ই পরগাছা দেখা যায়। ইহারা এমন নিষ্ঠুরভাবে রস চুষিয়া খাইতে আরম্ভ করে যে, অনেক সময়ে আশ্রয়-গাছ ইহাদের উৎপাতে মরিয়া যায়। পরাশ্রিত গাছকে বাগানের সার-দেওয়া মাটিতে পুঁতিলে বাঁচে না। ইহারা এমন অকেজো যে, মাটি হইতে একটু রসও চুষিয়া লইতে পারে না। টাট্‌কা তৈয়ারি রস অন্য গাছের শরীর হইতে চুষিয়া না খাইলে ইহারা বাঁচে না। এমন অকেজো জীব আর কোথাও দেখিয়াছ কি ?

কেঁচো খুবই ইতর প্রাণী, ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই, চোখ, কান, নাক কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি ইহারা নিজেদের খাবার নিজেরাই খুঁজিয়া পাতিয়া লয়। সুতরাং আঁটুলি বা উকুনের চেয়ে কেঁচো উৎকৃষ্ট বলিতে হয়। কিন্তু কেঁচোদের জাত-ভাই দুই একটি প্রাণী এমন অকেজো হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের কথা শুনিলে তোমরা অবাক্ হইয়া যাইবে। একটু চেষ্টা করিলেই কত ভালো খাবার পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার কিছুই ইহাদের মুখে রুচে না। পরের ঘাড়ে চাপিয়া জীবন কাটানো ইহাদের স্বভাব।

জোঁক

জোঁক হয় ত তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। জলে, কখনো কখনো ভিজে মাটিতে ও গাছপালায় ইহারা থাকে। কি বিশ্রী প্রাণী! ইহাদের দেখিলেই লোকে দূরে পালাইয়া

চিত্র ১৮—জোঁক

যায়। গোরু-বাছুর, কুকুর-শিয়ালেরাও ইহাদের ভয় করে। বড় বড় প্রাণীর গরম রক্ত জোঁকের প্রিয় খাদ্য। কিন্তু এ-রকম খাবার সকল সময়ে জোটে না, কাজেই, অন্য জিনিস খাইয়া তাহাদের বাঁচিয়া থাকিতে হয়। ছোট মাছ, গুগ্‌লি, এবং শামুক, ছোট পোকা জোঁকের প্রধান খাদ্য। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য ইহাদের দেহে বিশেষ যন্ত্র নাই। কেঁচোরা যেমন গায়ের চামড়া দিয়া বাতাসের অক্সিজেন্ চুষিয়া লয়, ইহারাও তাহাই করে এবং শরীর হইতে লালার মত জিনিস বাহির করিয়া চামড়া ভিজে রাখে। কিন্তু কেবল লালায় গা ভিজে থাকে না; এজন্য ডাঙার জলা জায়গায় জোঁক থাকে। খট্‌খটে শুকনো ডাঙায় রাখিলে জোঁক বাঁচে না।

এখানে জোঁকের একটা ছবি দিলাম। চিৎ করিয়া ফেলিয়া শরীরটাকে লম্বালম্বি চিরিলে, জোঁককে যে-রকম দেখায়, ছবিটি সেই রকম করিয়া আঁকা আছে। ইহাদের দেহে স্নায়ুগুলি কি-রকমে সাজানো আছে, ছবি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। দেহে এক জোড়া স্নায়ু মাঝামাঝি দিয়া লেজ হইতে মাথা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। তা ছাড়া প্রত্যেক স্নায়ু হইতে ছোট ছোট শাখা স্নায়ু বাহির হইয়া সমস্ত শরীরকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। ডাইনে স্নায়ুর সজ্জা যে রকম, বাম দিকে অবিকল সেই রকম।

চিত্র ১৯

প্রত্যেক শাখায় যে এক একটা মোটা রকমের অংশ দেখিতেছ,—উহাকে স্নায়ু-গ্রন্থি অর্থাৎ স্নায়ুর গাঁট বলে। কেঁচোর দেহেও এই রকম গ্রন্থি আছে। স্নায়ুব কাজ কি, তাহা তোমরা আগে শুনিয়াছ,—ইহা টেলি-গ্রাফের তারের মত খবর বহিয়া লইয়া যায়। গাঁটগুলি যেন সেই টেলিগ্রাফের ছোট আফিস্। এই সব আফিস্ হইতে ছোট ছোট সূতা দিয়া সর্ব্বাঙ্গের মাংস-

পেশীতে খবর পাঠানো হয় এবং সেই খবর জানিয়া জোঁকেরা নড়াচড়া করে। দেশে অনেক টেলিগ্রাফ আফিস্ থাকিলে সকলের উপরে একটা হেড আফিস্ রাখা হয়। জোঁকের শরীরের স্নায়ু দিয়া যে টেলিগ্রাফ চলে, তাহারও একটা হেড-আফিস্ আছে। জোঁকেরা মাথায় কতকগুলি স্নায়ুর সূতা তাল পাকাইয়া হেড্ আফিসের সৃষ্টি করিয়াছে। বড় বড় প্রাণীদের মাথায় যে মস্তিষ্ক আছে ইহা তাহারি অঙ্কুর।

যাহা হউক, মাথার হেড আফিস্ ছোট ছোট আফিস্-গুলিতে হুকুম চালায় এবং ছোট আফিস্ সেই হুকুম সর্ব্বত্র প্রচার করে। কিন্তু তাই বলিয়া ছোট আফিস্‌গুলি একেবারে পরাধীন নয়। দরকার হইলে হেড আফিসের হুকুম না লইয়াই তাহারা স্নায়ুর উপরে নিজেদের হুকুম চালায়। ছুরি দিয়া যদি জোঁকের দেহ দুই ভাগে ভাগ করা যায়, তবে লেজের অংশ মাথার অংশ হইতে পৃথক্ হইয়াও কিছুক্ষণ নড়চড়া করে। লেজের অংশে জায়গায় জায়গায় যে স্নায়ুর গাঁট আছে, তাহাই হুকুম চালাইয়া লেজ নাড়ায়। এই জন্য মস্তিষ্কশূন্য হইয়াও জোঁকেরা কিছুক্ষণ জীবিত থাকে।

স্নায়ুর গাঁটের এই কাজটা কেঁচো হইতে আরম্ভ করিয়া উই, পিঁপ্‌ড়ে, মশা, মাছি প্রভৃতি অনেক প্রাণীতেই দেখা যায়। কেঁচো ও জোঁকের শরীরে ইহার আরম্ভ-মাত্র হইয়াছে। প্রাণীরা যেমন ধাপে ধাপে উন্নত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের শরীরের স্নায়ুর কাজও তেমনি সুন্দর হইয়াছে।

জোঁকের স্নায়ুর কথা বলিতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল। এখন ইহাদের অন্য কথা বলিব। ছবিতে দেখ,—জোঁকের মুখ ও পিছন দুই দিকেই দু'টা মোটা ফাঁক আছে। কিন্তু পিছন দিক্ দিয়া ইহারা রক্ত চুষিয়া খাইতে পারে না। জোঁকের পিছন দিক্‌টা দেখিতে একটি বাটির মত, ভিতরের সঙ্গে তাহার যোগ নাই। ইহা দিয়া মাটি আট্‌কাইয়া তাহারা চলিয়া বেড়ায়। মুখের চোয়ালে তিন সারি করাতের মত ধারালো দাঁত আছে; তাহা দিয়া ইহারা শিকারের গায়ের চামড়া কাটিয়া ছিদ্র করে। তার পরে শরীটাকে এমন করিয়া বাঁকায় যে, তাহা আংটির মত গোলাকার হইয়া পড়ে। ইহার পরে মুখ দিয়া সেই কাটা ঘা হইতে জোরে রক্ত চুষিতে আরম্ভ করে। রক্ত খাইলে তাহাদের দেহটা রবারের মত ফাঁপিয়া মোটা হইয়া পড়ে। কেঁচোর চোখ নাই, ইহা তোমরা আগে শুনিয়াছ; ইহারা মাটির তলায় অন্ধকারে থাকে, কাজেই, চোখের দরকারও হয় না। কিন্তু জোঁকের মাথার উপরে দশ বারোটা করিয়া ছোট চোখ আছে।

ডিম হইতে জোঁকের বাচ্চা হয়। শরীর হইতে আঠার মত এক রকম লালা বাহির করিয়া ইহারা তাহারি মধ্যে ডিম পাড়ে। ইহাতে ডিমে ও গায়ের রসে জড়ানো এক রকম গুটি তৈয়ার হয়। এইগুলি জোঁকেরা বিল বা পুকুরের কাদার মধ্যে ফেলিয়া রাখে। কিছুদিন পরে ডিম ফুটিলে তাহা হইতে জোঁকের ছোট বাচ্চা বাহির হয়।

ছিনে জোঁক তোমরা দেখিয়াছ কি ? আমাদের দেশের যে-সব জায়গা নীচু ও জলা, সেখানে ডাঙায় এই জোঁক দেখা যায়। ইহারা এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। ছোট গাছপালা বা ঘাসের উপরে ইহারা শিকারের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে ; শিকার দেখিলেই দৌড়িয়া তাহার গায়ের রক্ত চুষিতে আরম্ভ করে। ইহাদের পা নাই তাহা তোমরা জান,—অথচ দৌড়ানো চাই। ইহাদের দৌড়ানোর উপায় বড় মজার। কেঁচো যেমন দেহকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া ছুট্ দেয়, ইহারা তাহা পারে না। প্রথমে মুখ দিয়া ইহারা জোরে মাটি চাপিয়া ধরে। তার পরে লেজটা মুখের কাছে আনিয়া শরীরটা ধনুকের মত বাঁকাইয়া ফেলে। ইহার পর লেজের সেই বাটির মত মুখ দিয়া মাটি চাপিয়া আসল মুখটা আগাইয়া দেয়। এই রকমে শরীরটাকে একবার বাঁকা এবং একবার সোজা করিতে করিতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে।

ক্রিমি

ক্রিমিরা জোঁক ও কেঁচোর জাত-ভাই। কিন্তু ইহারা নিতান্ত অধম শ্রেণীর প্রাণী এবং সম্পূর্ণ পরাশ্রিত। মানুষ বা জন্তুদের দেহের ভিতরেই ইহাদের বাস। যাহাদের দেহে আশ্রয় লয়, ইহারা তাহাদেরি শরীরের রস চুষিয়া খাইয়া বড় হয়। তোমরা হয়ত ক্রিমি দেখিয়াছ; দেখিলেই ঘৃণা হয়। এমন কদর্য্য প্রাণী বোধ হয় আর নাই। ইহাদের জীবনের কথা শুনিলে তোমাদের আরো ঘৃণা হইবে।

ক্রিমি নানা রকমের আছে। সচরাচর আমরা যে-সকল ক্রিমি দেখিতে পাই,—তাহা কেঁচোর মত, কিন্তু সাদা। আবার ছোট সাদা ক্রিমি আছে, সেগুলি কেঁচোর বাচ্চার চেয়ে বড় হয় না। দেখিলে মনে হয়, সেগুলি যেন, এক একটি আলপিন্। ক্রিমিদের মধ্যে যেগুলি অতি ভয়ানক তাহাদিগকে পাটা-ক্রিমি বলে। আমরা প্রথমে পাটা-ক্রিমিদের কথা বলিব।

মানুষের অন্ত্রে অর্থাৎ পাকযন্ত্রে ইহাদের বাস। যখন বড় হয়, তখন ইহাদিগকে সাদা ফিতের মত দেখায়। এক একটা পাটা-ক্রিমি দুই হাত হইতে ছয় সাত হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। কেঁচোর শরীরে যেমন আংটির মত অংশ জোড়া থাকে, ইহাদের দেহেও ঠিক্ সে-রকম ছোট ছোট অংশ

জোড়া আছে। কতকগুলি টুক্‌রা ফিতা জুড়িয়া একটা ছয় হাত লম্বা ফিতা তৈয়ার করিলে যে-রকম হয়, ইহাদের শরীরটা সেই রকমের। কিন্তু টুক্‌রাগুলি পরস্পর খুব শক্ত করিয়া জোড়া থাকে না।
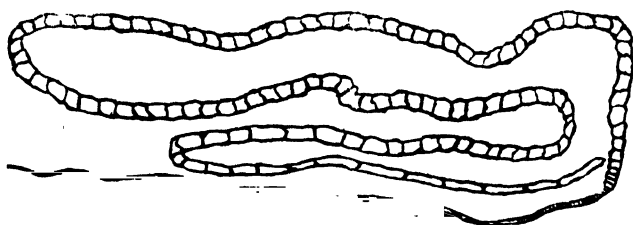
চিত্র ২০—পাটা-ক্রিমি

এখানে একটা বড় পাটা-ক্রিমির ছবি দিলাম। দেখ, ইহার দেহে কত টুকরা টুকরা অংশ আছে। ইহার সম্মুখের দিক্‌টা কত সরু হইয়া আসিয়াছে, তাহাও ছবিতে দেখিতে পাইবে। এই দিক্‌টায় একটি মাথা আছে। মাথা অত্যন্ত ছোট, কিন্তু গায়ের রস চুষিয়া খাইবার জন্য ছোট মাথায় যে ব্যবস্থা আছে, তাহা অতি ভয়ানক!

পাটা-ক্রিমির মাথা অতি বিশ্রী। এই মাথা এবং সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ক্রিমিরা মানুষ ও পশুর পেটের ভিতরকার সার অংশ চুষিয়া খায়। তা ছাড়া মাথায় বঁড়শির মত অস্ত্র আছে এবং মাথাকে এক স্থানে আট্‌কাইয়া রাখিবার যন্ত্র আছে। সেগুলি পেটের নাড়ীভুঁড়ির গায়ে এমন করিয়া লাগিয়া যায় যে, ক্রিমিদিগকে কোনক্রমে পেট হইতে বাহির করা যায় না।

পাটা-ক্রিমির দেহ এত লম্বা হইলেও, ইহাদের পেট নাই বা পাকযন্ত্র নাই। মাথায় মুখের মত কয়েকটা অংশ থাকিলেও প্রকৃত মুখ তাহাদের শরীরের কোনো জায়গায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মানুষ বা পশুর পেটের মধ্যে যে-সকল খাবার যায়, ক্রিমিরা সকল দেহ দিয়া তাহা চুষিয়া লইয়া নিজেদের দেহ পুষ্ট করে। এই রকম সাত হাত লম্বা প্রাণী যদি দিবারাত্রিই পেটের ভিতরকার খাবার চুষিয়া খায়, তাহাইলে মানুষের বাঁচিয়া থাকা দায় হয়। এই জন্যই মানুষ বা পশুর পেটে পাটা-ক্রিমি জন্মিলে ভয়ানক বিপদ হয়।

পাটা-ক্রিমিরা যে-রকমে দেহের বৃদ্ধি করে, তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক। গোড়ায় ইহারা ছোট থাকে। মানুষের পেটের ভিতরকার ভালো খাবার খাইয়া মোটা হইতে আরম্ভ করিলে ইহাদের শরীরে এক-একটা নূতন টুক্‌রা জন্মিতে আরম্ভ করে। যদি কোনো গতিকে দুই চারিটি টুক্‌রা শরীর হইতে খসিয়া যায় তাহাতেও উহাদের ক্ষতি হয় না। এই রকমে দেহ ছোট হইবামাত্র, লেজের দিকে আবার নূতন টুক্‌রা গজাইতে আরম্ভ করে।

পাটা-ক্রিমিদের দেহের দুই পাশে দুইটা স্নায়ু-রজ্জু আছে। কাজেই বলিতে হয়, ইহাদের দেহ সম্পূর্ণ অসাড় নয়।

এই অদ্ভুত প্রাণীদের কি রকমে বাচ্চা হয়, তাহা এখনো বলা হয় নাই। তাহাও বড় আশ্চর্য্যজনক।

পাটা-ক্রিমিদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই। বেশ পরিপুষ্ট

হইলে ইহাদের লেজের দিকের গাঁটে গাঁটে ডিম হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেগুলি মানুষের দেহের মধ্যে ফোটে না। বোধ হয়, ক্রিমির হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্যই ভগবান্ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা হউক, দেহের গাঁটে ক্রিমিদের ডিম পুষ্ট হইলেই গাঁট ছিঁড়িয়া যায় এবং ডিম সঙ্গে করিয়া টুক্‌রাগুলি বিষ্ঠার সহিত দেহ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। কাজেই, পেটের ভিতরে আর নূতন ক্রিমি জন্মিতে পারে না।

এখন তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, ক্রিমির ডিম যখন দেহের বাহিরেই চলিয়া গেল, তখন তাহাদের বাচ্চা কি রকমে মানুষের পেটে আশ্রয় করিবে?

ক্রিমিদের ডিম-ফোটা এবং মানুষের পেটে আশ্রয় লওয়া প্রভৃতি সকলি অদ্ভুত। মানুষের বিষ্ঠার সহিত বাহির হইয়া ডিমগুলি অনেক দিন মাটির উপরে থাকে। রৌদ্রে জলে ঝড়ে সেগুলির বিশেষ ক্ষতি হয় না। শূয়ার বড়ই লক্ষ্মীছাড়া পেটুক জানোয়ার। যেখানে সেখানে মাটি খুঁড়িয়া ইহারা ঘাসের শিকড় খায়; আলু মূলা কচুর গাছ ইহাদের অত্যাচারে রাখা দায়। গোরুও কম পেটুক নয়; দিবারাত্রিই ইহাদের খাবারের দিকে নজর। বেশ তাজা ছোট গাছ বা নরম ঘাস দেখিলে ইহারা মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। খাবার সময়ে ইহারা স্থান-অস্থান বা কাল-অকাল ভাবিয়া দেখে না। যে-সকল অপরিষ্কার

জায়গায় ক্রিমির ডিম ছড়াইয়া থাকে, গোরু-শূয়ারেরা সেখানে চরিবার সময়ে ঘাস-পাতা বা ফলমূলের সঙ্গে কখনো কখনো তাহা খাইয়া ফেলে। এই রকমে একবার ডিম পেটের মধ্যে গেলে আর রক্ষা থাকে না। ডিমগুলি তাহাদের পেটের ভিতরে গিয়া ফুটিতে আরম্ভ করে।

তোমরা হয় ত মনে করিতেছ, ডিম ফুটিলেই বুঝি সেই ফিতার মত চেপটা ছোট ক্রিমি জন্মিবে। কিন্তু গোরু বা শূয়ারের পেটে ডিম ফুটিলে ক্রিমির চেহারা সে-রকম হয় না। এই সময়ে তাহারা অসম্পূর্ণ ক্রিমির আকারে জন্মে এবং মাংস কাটিয়া শরীরে প্রবেশ করিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় ছয়টা করিয়া বাঁকানো করাত উৎপন্ন হয়। ক্রিমির বাচ্চারা এই অস্ত্র দিয়া ধীরে ধীরে গোরু ও শূয়ারের মাংস কাটিয়া কিছুকাল মাংসের মধ্যে বেশ আরামে বাস করিতে থাকে।

এই অবস্থায় ক্রিমি-শাবকদের শরীরের আর কোনো বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। কেবল প্রত্যেকের পিছনে এক একটা থলির মত অংশ গজাইয়া উঠে মাত্র। এই রকম প্রাণীরা যে পরে সাত আট হাত লম্বা পাটা-ক্রিমির আকার পাইবে, তাহা উহাদের এখনকার চেহারা দেখিলে কিছুতেই আন্দাজ করিতে পারা যায় না।

গোরু ছাগল ভেড়া শূয়ার যেমন গাছ-পালার শত্রু, তেমনি এই পৃথিবীতে গোরু শূয়ার প্রভৃতিরও অনেক শত্রু

আছে। মানুষই এই সকল শত্রুর মধ্যে প্রধান। পৃথিবীতে অনেক দেশের অনেক লোকে কেবল মাংস খাইবার জন্য গোরু ও শূয়ার পোষে। যে-সকল গোরু ও শূয়ারের মাংসে ক্রিমির বাচ্চারা বাসা করে, সেগুলিকেও মানুষ হত্যা করে এবং তাহাদের মাংস খায়। মানুষ কাঁচা মাংস খায় না, প্রথমে উহা আগুনে ঝল্‌সাইয়া ভাজিয়া লয় বা সিদ্ধ করে এবং তার পরে উহা খায়। গোরু বা শূয়ারের মাংসে যে ক্রিমির বাচ্চা থাকে, তাহা আগুনের একটু বেশি তাপ পাইলে মরিয়া যায় কিন্তু তাপ অল্প হইলে বা সিদ্ধ কম হইলে সেগুলি আধ-সিদ্ধ বা আধ-ভাজা মাংসে বেশ জীবন্তই থাকিয়া যায়। এই রকমে মাংসের সঙ্গে ক্রিমির বাচ্চা খাইলেই মানুষের সর্ব্বনাশ হয়। শরীরের ভিতরে গিয়াই তাহারা সেই বঁড়শির মত শুঁয়ো পেটের গায়ে বিঁধাইয়া দেয় এবং আমরা যে-সকল ভালো খাদ্য খাই, তাহাই সর্ব্বাঙ্গ দিয়া চুষিয়া তাহারা ক্রমে প্রায় পাঁচ সাত হাত লম্বা পাটা-ক্রিমি হইয়া দাঁড়ায়।

গোরুর মাংসের ইহাই একমাত্র ক্রিমি নয়, ইহার চেয়ে আর এক রকম ভয়ানক ক্রিমির বাচ্চাও তাহাতে থাকে। আধ-সিদ্ধ মাংসের সহিত সেগুলি মানুষের পেটে পড়িলে, সেগুলি পেটের ভিতরেই কখনো কখনো কুড়ি হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়।

আমাদের দেশের অতি-অল্প লোকেই গোরু বা শূয়ারের

মাংস খায়। তাই পাটা-ক্রিমির উৎপাত আমাদের মধ্যে অনেক কম। শীতের দেশের লোকে ঐ সব মাংস বেশি খায়। গরীব লোকেরা আবার অনেক সময়ে আধ-সিদ্ধ মাংসই খাইয়া ফেলে। এই জন্য ঐ-সকল লোক ক্রিমির উৎপাতে খুব কষ্ট পায় এবং অনেক লোক মারাও যায়। পাটা-ক্রিমি যে কেবল মানুষের শরীরেই হয়, তাহা নয়। কুকুর, বিড়াল, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুদের দেহেও ইহা জন্মে।

গোল ক্রিমি

মানুষেব শরীর হইতে যে কেঁচোর মত গোল সাদা ক্রিমি বাহির হয়, তাহারা পাটা-ক্রিমিদের চেয়ে অনেক রকমে উন্নত, কিন্তু তাহাদের দেহে কেঁচোর মত দাগ-কাটা দেখা যায় না। ইহা দেখিলেই বুঝা যায়, ইহাদের দেহ কেঁচোর ন্যায় অনেকগুলি আংটি দিয়া প্রস্তুত নয়। কেঁচোদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নাই, কিন্তু এই ক্রিমির দল কতক পুরুষ এবং কতক স্ত্রী হইয়া জন্মে। কেঁচোর মত ইহাদের মুখ, পেট ইত্যাদি সকলি আছে। মানুষের পাকাশয়ে ইহাদের বাস এবং আমাদের উদরের খাদ্যদ্রব্য খাইয়াই ইহারা বাঁচিয়া

থাকে। তাই শরীর হইতে বাহিরে আসিলে এই ক্রিমিরা বাঁচে না।

প্রত্যেক স্ত্রী-ক্রিমি প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার ডিম প্রসব করে। বলা বাহুল্য, সকল ডিম হইতে বাচ্চা হয় না। এগুলির অনেকই মানুষের শরীর হইতে বিষ্ঠার সহিত্ বাহির হইয়া পড়ে। শেষে যে দুই-চারিটা পেটের ভিতরে ফুটিয়া ক্রিমি হয়, তাহাদের জ্বালাতেই মানুষ অস্থির হইয়া পড়ে।

ষষ্ঠ শাখার প্রাণী

কীট-পতঙ্গ

তোমরা পঞ্চম শাখার নানা রকম প্রাণীর কথা শুনিলে। ধাপে ধাপে প্রাণীরা কেমন উন্নতির দিকে চলিয়াছে, বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়াছ।

প্রথম শাখার প্রাণীদের শরীরে কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই; ইচ্ছামত শরীর নাড়িবার জন্য স্নায়ু নাই; এমন কি, উদরটা পর্যান্ত নাই। ইহাদের সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণীর প্রাণী জোঁকের তুলনা করিয়া দেখ। জোঁকের দেহে উদর আছে, মুখ-চোখ আছে, শিকারের গা চিরিয়া রক্ত বাহির করিবার জন্য চোয়ালে অস্ত্র লাগানো আছে, তা'ছাড়া ডিম প্রসব করিয়া সন্তান উৎপন্ন করা এবং ইচ্ছামত শরীর নাড়াচাড়া করার ব্যবস্থাও ইহাদের দেহে রহিয়াছে। প্রথম শাখার প্রাণী আমিবার সঙ্গে জোঁকদের যেন আকাশ-পাতাল তফাৎ।

আমরা ষষ্ঠ শাখার যে-সকল প্রাণীর কথা এখন বলিব, তাহা শুনিলে তোমরা বুঝিবে, ইহারা আরো উন্নত। জীবনের কাজে এবং দেহের উন্নতিতে ইহারা অনেক বড় প্রাণীদেরও হারাইয়া দেয়।

চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, গোবরে পোকা, ফড়িং, শুঁয়ো পোকা, প্রজাপতি, মাকড়সা, বিছে, কেন্নো, মশা, মাছি,

ছারপোকা প্রভৃতি সকলেই ষষ্ঠ শাখার প্রাণী। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ চিংড়ি মাছ ও কাঁকড়াদের সঙ্গে মশা, মাছি ও প্রজাপতিরা কি রকমে এক শাখার প্রাণী হইল? কিন্তু সত্যই ইহারা এক শাখার প্রাণী। ইহাদের দেহের মোটামুটি গড়নের কথা মনে করিলে তোমরা ইহা বুঝিতে পারিবে।

সাপ, ব্যাঙ, মাছ, গোরু, ভেড়া প্রভৃতি জন্তুদের শরীর কি-রকমে প্রস্তুত, তাহা তোমরা অবশ্যই দেখিয়াছ। ইহাদের দেহের ভিতরে নানা জায়গায় সরু বা মোটা হাড় আছে এবং সেই হাড়ের উপরে আবার মাংস লাগানো আছে। দেহে হাড় থাকে বলিয়া বড় প্রাণীরা এত দৃঢ় হয় এবং লাফালাফি করিতে পারে। শরীরে হাড় না থাকিলে ইহারা কেঁচো বা জোঁকের মত নির্জীবভাবে নড়াচড়া করিত। ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রাণীর শরীরে মাংসের মত নরম জিনিস আছে বটে, কিন্তু ভিতরে হাড় নাই। তাহাদের সমস্ত দেহটাই হাড়ের মত কঠিন আবরণে ঢাকা। মানুষ, গোরু প্রভৃতি বড় প্রাণীদের শরীরের ভিতরে যে হাড় থাকে, তাহা শরীরকে দৃঢ় করে, কিন্তু আড়ষ্ট করে না। যেখানে যেমনটি হইলে সুবিধা হয়, হাড়গুলি খণ্ডখণ্ড-ভাবে সেই রকমে জোড়া থাকে। ষষ্ঠ শাখার কীট-পতঙ্গদের দেহ হাড়ে ঢাকা থাকিলেও তাহাতে শরীর আড়ষ্ট হয় না। একটা প্রজাপতি, গোবরে পোকা বা মাছি ধরিয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, তাহাদের গা হাড়ের মত শক্ত। সমস্ত শরীর

চামড়া দিয়া ঢাকা নাই,—হাড়ের মত একটা জিনিস দিয়া আচ্ছন্ন। কিন্তু এই হাড়ের আবরণে পাছে শরীরটা আড়ষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য হাড়ের আবরণ আংটির মত অনেকগুলি অংশে ভাগ করা থাকে এবং সেগুলি পাত্‌লা চামড়া দিয়া পরস্পরের সহিত জোড়া থাকে। কাজেই, এই অবস্থায় ইহারা শরীরটাকে ইচ্ছামত হেলাইতে দোলাইতে পারে। বোল্‌তা, কেন্নো বা বিছের শরীরের কঠিন আবরণে ঐ আংটির মত ভাগ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। দেহের আবরণ এই রকম ভাঙা ভাঙা থাকে বলিয়াই বোল্‌তা, কেন্নো ও বিছেরা ইচ্ছা-মত শরীরগুলিকে বাঁকাইতে পারে। কেবল বোল্‌তা, কেন্নো, মাছি বা প্রজাপতির দেহই যে ঐ রকম, তাহা নয়। ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাণীই ঐরকম দেহ লইয়া জন্মে। পরস্পরের শরীরে এই মিল আছে বলিয়া জল স্থল আকাশের নানা রকম প্রাণীকে বৈজ্ঞানিকেরা একই শাখায় ফেলিয়াছেন। চিংড়ি মাছ এবং কাঁকড়া জলের প্রাণী। ইহাদের দেহ কেন্নো, বিছে ও মৌমাছিদের মত কঠিন আবরণে ঢাকা আছে, এই জন্য ইহারা ষষ্ঠ শাখায় পড়িয়াছে।

আমরা যাহা খাই, তাহার সার ভাগ দিয়া শরীরের আয়তন বাড়ে। পাঁচ ছয় বৎসর আগের চেয়ে তোমাদের শরীর কত বড় হইয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ। সে-সময়ের জামাগুলো হয় ত এখন তোমার গায়েই লাগিবে না। এই পাঁচ ছয় বৎসর ধরিয়া যাহা আহার করিয়াছ, তাহাই

তোমাদের গায়ে নূতন মাংস যোগ করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভিতরকার হাড়গুলিকে মোটা করিয়াছে। ষষ্ঠ শাখার সকল প্রাণীই আহার করিয়া এই রকমেই বড় হয়। কিন্তু তাহাদের দেহে যে কৌটার মত কঠিন আবরণ থাকে, তাহা বাড়ে না। তোমার বাক্সে কতগুলি বই আঁটে জানি না। মনে কর, তাহাতে আটখানা বই রাখা যায়। এখন যদি সেই বাক্সে বারো খানা বই রাখিয়া তুমি ডালা বন্ধ করিতে চেষ্টা কর, তবে বাক্স ফাটিয়া যায়। ষষ্ঠ শাখার কতক প্রাণী যখন আহার করিয়া দেহ বড় করে, তখন তাহাদেরও ঐ বাক্সের মত দুর্গতি হয়। ছোট কঠিন আবরণের মধ্যে উহাদের বড় দেহ থাকিতে পারে না। কাজেই, আবরণটি ফাটিয়া শরীর হইতে খসিয়া পড়ে এবং তাহার জায়গায় নূতন বড় আবরণ জন্মিতে থাকে। এই ব্যাপারটা ঠিক সাপের খোলস-ছাড়ার মত। দেহ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাপের গায়ের আবরণ অর্থাৎ খোলস বড় হয় না। কাজেই, ছোট খোলসের মধ্যে দেহ বড় হইতে থাকিলে, তাহা শরীর হইতে ছিঁড়িয়া খসিয়া পড়ে। আরসুলা, মাকড়সা, ছারপোকা প্রভৃতির গায়ের কঠিন আবরণের দশাও তাহাই হয়। ইহারা যেমন বড় হইতে থাকে, গায়ের আবরণ তেমনি খসিয়া পড়ে। ষষ্ঠ শাখার অনেক প্রাণী জীবনের মধ্যে অনেকবার এই রকমে খোলস্ ছাড়ে। চিংড়ি মাছ ও কাঁকড়া এই জাতীয় প্রাণী,— ইহারাও শরীরের উপরকার খোলা বার বার খসাইয়া বড় হয়।

প্রাণীদের প্রত্যেক শাখাতেই বিচিত্র আকৃতি-প্রকৃতির অনেক ভিন্ন প্রাণী আছে। কিন্তু ষষ্ঠ শাখায় রকম রকম প্রাণীর সংখ্যা যত বেশি অন্য শাখার প্রাণীতে সে-রকম নয়। সমস্ত পৃথিবীতে ছোট-বড়তে মিলিয়া মোটামুটি পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার রকমের প্রাণী আছে, তাহার মধ্যে এক ষষ্ঠ শাখাতেই চারি লক্ষ রকমের কীট-পতঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেকেরই আকৃতি-প্রকৃতি পৃথক্। কেহ উড়িয়া বেড়ায়, কেহ পা দিয়া মাটির উপরে হাঁটিয়া চলে; কাহারো উড়িবার ডানা আছে, কাহারো ডানা নাই, কেহ ছয়খানা পায়ে চলা-ফেরা করে, কেহ হয়ত শত শত পায়ে চলাফেরা করে। সুতরাং আমরা চারি লক্ষ রকমের কীট-পতঙ্গের কথা তোমাদিগকে বলিতে পারিব না,—বলিতে গেলে হয় ত কুড়ি পঁচিশখানা বড় বড় কেতাব লিখিতে হইবে। তোমরা সর্ব্বদা যে-সকল পোকা-মাকড় দেখিতে পাও, আমরা এখানে কেবল তাহাদেরি জীবনের কথা দেহের কথা একটু বলিব। ঐগুলি ছাড়া তোমরা যদি কোনো নূতন পোকা-মাকড় দেখিতে পাও, তবে তোমরা নিজেই তাহাদের চলাফেরা ও খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ লইতে পারিবে।

আমাদের ভারতবর্ষ গরম দেশ; য়ুরোপ-আমেরিকার অনেক জায়গা ভয়ানক ঠাণ্ডা। এজন্য আমাদের গরম দেশে যে-সকল পোকা-মাকড় জন্মে, বিদেশের ঠাণ্ডায় তাহা জন্মে না। অনেক পণ্ডিত লোকে মিলিয়া য়ুরোপ ও

আমেরিকার সমস্ত পোকা-মাকড়ের বিবরণ বড় বড় বইতে লিখিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের পোকা-মাকড়ের বিবরণ কোনো বইয়ে আজও ভালো পাওয়া যায় না। তোমরা সকলে মিলিয়া যদি আমাদের দেশের পোকা-মাকড়ের বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিয়া যাও, তবে সকলের চেষ্টায় একখানি ভালো বই প্রস্তুত হইতে পারিবে।

তোমরা আগেই শুনিয়াছ, ষষ্ঠ শাখায় যে-সকল ভিন্ন ভিন্ন পোকা-মাকড় আছে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় চারি লক্ষ। কাজেই এলোমেলো করিয়া এতগুলো প্রাণীর বিবরণ দিতে গেলে কাজ চলে না। তাই ষষ্ঠ শাখার প্রাণীদিগকে পণ্ডিতগণ কয়েকটি ছোট ভাগে ভাগ করিয়াছেন এবং তার পরে এক একটি ভাগের প্রাণীদের পরিচয় দিয়াছেন।

ভাগ অনেক রকমে করা যায়। খাবারের দোকানে দোকানদার রসগোল্লা জিলাপি নিম্‌কি শিঙাড়া ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখে। ফলের দোকানেও ফলওয়ালা নারিকেল আম আপেল নাসপাতি সকলি ভাগ ভাগ করিয়া রাখে। কেবল ফলের চেহারা দেখিয়া কোন্‌টি নাসপতি এবং কোন্‌টি আম তাহা ফল-ওয়ালা বুঝিয়া লয়। তোমাদের স্কুলের এতগুলি ছেলেকে মাষ্টার মহাশয়েরা ভাগ ভাগ করিয়া লেখা-পড়া শেখান। যাহারা বেশি লেখা-পড়া শিখিয়াছে, তাহারা ফাষ্ট ক্লাশে যায়; যাহারা ইহার চেয়ে কম শিখিয়াছে, তাহারা সেকেণ্ড ক্লাশে যায়। এই রকমে

স্কুলের সকল ছেলেই এক একটা ক্লাশে গিয়া লেখা-পড়া শিখে। ড্রিলের সময়ে তোমাদের স্কুলের আবার আর এক রকমে ছেলে ভাগ করা হয়। যাহারা সব চেয়ে মাথায় উঁচু, তাহারা প্রথম সারিতে দাঁড়ায়,—তখন কোন্ ছেলে কোন্ ক্লাশে পড়ে, সেই হিসাবে দাঁড় করানো হয় না। তাহা হইলে তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, অনেক জিনিস থাকিলে সেগুলিকে নানা রকমে ভাগ করা যাইতে পারে। তুমি ওজন দেখিয়া ভাগ করিতে পার, আর একজন অন্য গুণ বা স্বভাব দেখিয়া ভাগ করিতে পারে। পণ্ডিতেরা চারি লক্ষ পোকা-মাকড়কে স্বভাব ও আকৃতি দেখিয়া ভাগ করিয়াছেন। আমরা সেই ভাগ অনুসারে তোমাদিগকে পোকা-মাকড়দের কথা বলিব।

ষষ্ঠ শাখার প্রাণীদের বিভাগ

এই শাখার প্রাণীদিগকে আমরা যে-রকম ভাগ করিব তাহা আগেই তোমাদিগকে বলিয়া রাখিতেছি।

প্রথম ভাগ:—এই ভাগে চিংড়িমাছ, কাঁকড়া প্রভৃতি কঠিনবর্ম্মী প্রাণীরা পড়িবে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই জলের প্রাণী কিন্তু পোকা-মাকড়দেরই জ্ঞাতি এবং সকলেরই শরীর গাঁটে গাঁটে ভাগ করা; কিন্তু গায়ের আবরণ খুব শক্ত। যোদ্ধারা লড়াই করিবার সময়ে যেমন বর্ম্ম পরে, ইহারা সেই রকম শক্ত আবরণে গা ঢাকিয়া রাখে, তাই হঠাৎ শত্রুরা ইহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না। এই জন্যই ইহাদিগকে কঠিনবর্ম্মী বলিতেছি।

দ্বিতীয় ভাগ:—বোল্‌তা মাছি প্রজাপতি গোবরে-পোকা ফড়িং ইত্যাদি অনেক ছোট প্রাণী এই ভাগে পড়িবে। এই ভাগে যত প্রাণী আছে, ষষ্ঠ শাখার কোনো ভাগেই তত প্রাণী নাই। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার উড়িতে পারে। ইহাদের অনেকেরই শরীরে মাথা বুক ও লেজ এই তিনটি অংশ স্পষ্ট করিয়া দেখা যায়। বুকের তলায় অনেকগুলি পা থাকে; কিন্তু ইহারও সংখ্যা স্থির থাকে। গুণিলে প্রায় সকলেরি ছয়খানা করিয়া পা দেখিতে পাইবে। এই ভাগের প্রাণীদিগকে পতঙ্গ বলা যাইতে পারে।

তৃতীয় ভাগঃ—এই ভাগের পোকা-মাকড়কে আমরা লূতা বলিব। "লূতা" মাকড়সার ভাল নাম। নানা রকম মাকড়সাই এই ভাগে আছে। প্রজাপতি বা ফড়িংদের মত ইহাদের শরীরে তিনটা ভাগ দেখা যায় না। যে-সব আংটির মত গাঁট দিয়া পোকা-মাকড়ের দেহ প্রস্তুত, সেগুলি ইহাদের শরীরে একবারে গায়ে জোড়া থাকে। পেটের তলার আংটিগুলিকে প্রায় চেনাই যায় না। দ্বিতীয় ভাগের প্রাণীদের মত ইহাদের পা ছয়খানা নয়; ইহাদের পায়ের সংখ্যা চারি জোড়া অর্থাৎ আটখানা।

চতুর্থ ভাগঃ—এই ভাগের প্রাণীরা ভারি বিশ্রী। কেন্নো এবং বিছে এই দলের প্রধান পোকা। ইহাদেরও দেহ কঠিন আংটি দিয়া গড়া; কিন্তু পায়ের সংখ্যা অনেক বেশি। এই জন্য চতুর্থ ভাগের পোকা-মাকড়কে শতপদী বলা যাইতে পারে।

———

চিংড়িমাছ

চিংড়িকে আমরা মাছ বলি, কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ইহাকে জলের পোকা বলিতে হয়। ইহা প্রজাপতি মাকড়সা কেন্নো বা বিছেরই জাত-ভাই। আমরা যখন বেশ মজা করিয়া চিংড়ি মাছ খাই, তখন জলের পোকা খাইতেছি ইহা মনেই হয় না। কিন্তু চিংড়িমাছ খাঁটি পোকা।

এখানে একটা চিংড়িমাছ এবং একটা বিছের ছবি দিলাম। দেখ,—দেহে কত মিল। ইহাদের প্রত্যেকেরই
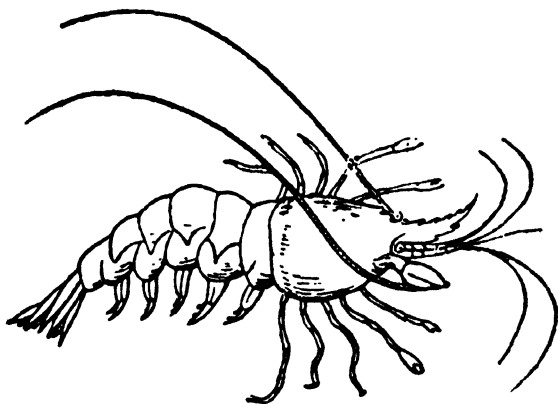
চিত্র ২১—চিংড়ি

শরীর আংটির মত অনেকগুলি ভাঙা ভাঙা অংশ দিয়া প্রস্তুত। আবার প্রত্যেক গাঁটের গোড়া হইতে জোড়া

জোড়া পা বাহির হইয়াছে। বিছেরা এই সব পা দিয়া চলিয়া বেড়ায়। চিংড়িমাছেরা তাহার কতকগুলি পা দিয়া
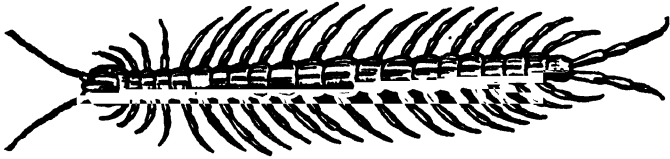
চিত্র ২২—বিছে

খাবার ধরিয়া খায় এবং আর কতকগুলি দিয়া জলে সাঁতার কাটে। দুইয়েরই মুখে লম্বা লম্বা শুঁয়ো আছে।

আমরা এখানে কেবল দুই-একটি মিলের কথা বলিলাম। তোমরা খোঁজ করিলে ইহা ছাড়া আরো অনেক মিল নিজেরাই দেখিতে পাইবে। কেবল বিছের সঙ্গেই যে চিংড়িমাছের দেহের মিল তাহা নয়। তোমরা শুঁয়ো পোকা প্রজাপতি মাকড়সা ইত্যাদি অনেক পোকা-মাকড়ের সঙ্গেই ইহাদের মিল ধরিতে পারিবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যদি তোমরা চিংড়িমাছকে পোকা না ভাবিয়া মাছই মনে করিতে থাক, তবে ভুল করিবে।

চিংড়ি অনেক রকম দেখা যায়। আমাদের দেশে খাল, বিল বা পুকুরের ধারে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে তোমরা জলের ভিতরে এক রকম ছোট চিংড়িকে ছুটিয়া চলিতে দেখিবে। ইহাদের গায়ে যে শক্ত আবরণ থাকে, তাহা কাচের মত স্বচ্ছ। এইজন্য আবরণের ভিতর দিয়া শরীরের অনেক অংশ স্পষ্ট

দেখা যায়। এই চিংড়িকে অনেকে ঘুসো চিংড়ি বলে। পুকুরের কাদায় যে-সকল ছোট চিংড়ি দেখা যায়, তাহাদের ছটকা চিংড়ি বলে। ইহাদের গায়ের রঙ্ কালো। গলদা চিংড়ি তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। এগুলি লম্বায় কখনো কখনো আধ হাতের উপরেও দেখা যায়। গায়ের রঙ্ সাদা ও কতকটা কালো বা নীলে মিশানো। ইহা ছাড়া চারি পাঁচ আঙুল লম্বা ও সাদা চিংড়ি আমাদের জলাশয়ে পাওয়া যায়। এগুলিকে রস্না চিংড়ি বলে।

সমুদ্রের জলেও চিংড়ির অভাব নাই। সেখানে নানা আকারের চিংড়ি দেখা যায়। আবার শীতের দেশে যে-রকম আকৃতির চিংড়ি পাওয়া যায়, গ্রীষ্মের দেশে সে-রকম খুঁজিয়া মিলে না। চিংড়িদের আকৃতি এই রকম বিচিত্র হইলেও, শরীরের মোটামুটি গড়ন ও জীবনের কাজ সকল চিংড়িরই এক।

যদি ইহাদের চলাফেরা সাঁতার-কাটা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে একটি কাচের পাত্রে জল ভরিয়া তাহাতে একটি ছোট জীবন্ত চিংড়িমাছ ছাড়িয়া দিয়ো। এই রকম পাত্রে আবদ্ধ থাকিয়া সেটি যখন চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে, তখন তাহার জীবনের অনেক কাজ তোমরা স্বচক্ষেই দেখিতে পাইবে।

চিংড়ির যে ছবি দেওয়া হইয়াছে, তাহা একবার এখন ভালো করিয়া দেখ; ইহার দশ জোড়া পা আছে, কিন্তু মুখের দিকে ইহার পা পাঁচ জোড়া মাত্র। কিন্তু এই সকল পা দিয়া

তাহারা হাঁটে না এবং সব পায়ে নখ থাকে না, বা সেগুলিতে আঙুলের মত কোনো অংশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রথম বা দ্বিতীয় পা দুটাই মোটা হয় এবং প্রত্যেকের শেষে কামারের দোকানের সাঁড়াশির মত দু'টো অংশ জোড়া থাকে। এই সাঁড়াশি-লাগানো পা-দুখানিকে চিংড়ির দাড়া বলে। দাড়া দিয়া ধরিয়া ইহারা খাদ্য মুখে তুলিয়া দেয়,—ইহা আমাদের হাতের মত কাজ করে। দেহের পিছনে গাঁটে গাঁটে যে আরো পাঁচ জোড়া পায়ের মত অংশ আছে, তাহা সাঁতার কাটিবার জন্য। এইগুলি দিয়া চিংড়িরা জল কাটিয়া সাঁতার দেয়। দেহের শেষে চিংড়ির যে পাখার মত লেজ থাকে, তাহা তোমরা অবশ্যই দেখিয়াছ। কতকগুলি শক্ত খোলা একত্র হইয়া এই লেজের সৃষ্টি করিয়াছে। চিংড়িরা জলের মধ্যে সোজা সাঁতার দিতে দিতে এক এক সময়ে হঠাৎ পিছু-সাঁতার দেয়। সমস্ত দেহটাকে না ঘুরাইয়া ইহারা ঐ লেজের সাহায্যেই পিছু-সাঁতার দিতে পারে।

চিংড়ি ভাজা তোমরা নিশ্চয়ই খাইয়াছ, আমরাও খাইয়াছি। ইহাদের গায়ের উপরে খোলা কি রকমে সাজানো থাকে, তোমরা দেখ নাই কি? এবার বাজার হইতে চিংড়ি-মাছ আসিলে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়ো। পরীক্ষা করিলে দেখিবে, ইহাদের মাথাটা একখানা বড় খোলা দিয়া ঢাকা আছে। এই খোলার গায়েই করাতের মত একটা অংশ খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ইহা চিংড়িদের খড়্গ। শত্রু

আসিয়া আক্রমণ করিলে আমরা বন্দুক বাহির করি ও তলোয়ার হাতে লইয়া শত্রুকে তাড়া করি। চিংড়িমাছদের ঘরবাড়ি নাই, তলোয়ার-বন্দুকও নাই; আছে কেবল মাথার উপরে করাতের মত খাঁড়া। শত্রুরা উৎপাত আরম্ভ করিলেই, তাহারা ঐ খাঁড়া দিয়া শত্রুকে তাড়াইয়া দেয়। ইহা তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র।

চিংড়িদের মাথা ভয়ানক জটিল যন্ত্র। ইহাতে অনেক ছোট-খাটো অংশ জোড়া থাকে; এইজন্যই সকল অঙ্গের চেয়ে মাথাটাই জটিল হইয়া পড়িয়াছে। চিংড়ির মাথায় পায়ের মতো ছয় জোড়া অবয়ব লাগানো দেখা যায়। আমরা আগেই বলিয়াছি, পোকা-মাকড়দের দেহে যত গাঁট থাকে, প্রায়ই তাহার প্রত্যেকটি হইতে জোড়া জোড়া পা বা ডানা প্রভৃতি নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাহির হয়। সুতরাং মাথায় যে ছয় জোড়া পায়ের মত অংশ আছে, তাহা দেখিলে বুঝা যায়, চিংড়িদের মাথা ছয়টা গাঁটে প্রস্তুত। প্রকৃত ব্যাপার তাহাই বটে, কিন্তু চিংড়ির দেহ পরীক্ষা করিলে তাহার মাথার ঐ রকম ছয়টা গাঁট দেখিতে পাইবে না। এই ছয়টা গাঁট জোট বাঁধিয়া এক হইয়া গিয়াছে। কোনো এক সময়ে যে এই ছয়টা গাঁট পৃথক্ ছিল, তাহার মাথার ছয় জোড়া পায়ের মত অংশ দেখিলেই আন্দাজ করা যায়।

যাহা হউক, এখন চিংড়ির মুখটি কি রকম, তাহা দেখা যাউক। মাথার পূর্ব্বের ছয় জোড়া অঙ্গ ছাড়া ইহাদের

দাড়ার কাছ হইতে আরো তিন জোড়া অঙ্গ বাহির হয়। এগুলি দেখিতে কতকটা আঙুলের মত; কেবল শেষের দুই জোড়ায় শুঁয়োর মত অংশ জোড়া থাকে। দাড়া দিয়া ধরিয়া চিংড়িরা যে খাদ্য মুখের গোড়ায় আনে, তাহারা ঐ শেষের তিন জোড়া বিশেষ অঙ্গ দিয়া তাহাই মুখে পূরিয়া দেয়।

মুখে খাবার পূরিলেই খাওয়া শেষ হয় না। যাহাতে খাদ্য মুখ হইতে পড়িয়া না যায়, তাহার জন্য উপর ও নীচের ওষ্ঠ চালনা করিতে হয়। তাহার পরে সহজে হজম করার জন্য খাদ্য চিবাইয়া পেটে পূরিতে হয়। চিংড়িদের মুখে যে শেষ তিন জোড়া অঙ্গের কথা বলিলাম, তাহা দিয়াই এই সকল কাজ চলে। দুই জোড়া দিয়া তাহারা খাদ্য আট্‌কাইয়া রাখে এবং আর এক জোড়ায় তাহা চিবায়। এই তিন জোড়াতে কতকটা আমাদের মুখের চোয়ালের মত কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খাদ্য চিবাইবার জন্য দাঁত কেবল এক জোড়াতেই থাকে।

বড় চিংড়ি মাছের মাথা-ভাজা তোমরা খাইয়াছ কি? খাইবার সময় তোমরা হয়ত ইহাদের চোয়াল ও দাঁত দেখিয়া থাকিবে। দাঁত হাড়ের মত শক্ত, অথচ বেশ ধারালো। আমরা কোনো জিনিস ছিঁড়িয়া খাইবার সময়ে, চোয়াল উপর-নীচে নাড়াচাড়া করি, ইহাতে খাদ্য খণ্ড খণ্ড ভাগ হইয়া যায় কিন্তু চিবানো হয় না। চিবাইতে হইলে চোয়ালকে পাশা-পাশি চালাইতে হয়; ইহাতে খাবার পিষিয়া যায়। গোরু

যখন "জাওর কাটায়," তখন তাহারা চোয়াল পাশা-পাশি চালায়। চিংড়িমাছেরা চোয়াল এই রকম কেবল পাশা-পাশিই চালাইতে পারে। ইহাতে খুব শক্ত খাদ্যও দাঁতের ধারে পিষিয়া কাদার মত হইয়া যায়।

চিংড়ির চোখ, কান ও নাক

চিংড়ির আকৃতি ও মুখের গড়নের কথা তোমরা শুনিলে,—এখন ইহাদের চোখ কান নাক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিব।

চিংড়ির মাথায় যে শুঁয়ো লাগানো থাকে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। শুঁয়ো দুই জোড়া থাকে। এক জোড়া খুব লম্বা। চিংড়িরা যখন জলের ভিতরে চলিয়া বেড়ায়, তখন এই শুঁয়ো দুইটি পিঠের উপরে পড়িয়া থাকে; ইহা তখন প্রায় লেজ পর্য্যন্ত পৌঁছায়। কিন্তু এই দুইটি ছাড়া চিংড়ির মাথায় আরো দু'টা শুঁয়ো দেখা যায়। এগুলি প্রথম শুঁয়োর চেয়ে অনেক ছোট। গাছের গুঁড়ি হইতে যেমন ছোট ডাল বাহির হয়, এই দুইটি শুঁয়োর প্রত্যেকটি হইতে সেই রকম তিনটি শুঁয়ো বাহির হইতে দেখা যায়।

যখন জলের ভিতরে সাঁতার কাটিয়া চলে, তখন চিংড়িরা এই দুইটি ডাল-পালা-ওয়ালা শুঁয়োকে একবার ডাইনে এবং একবার বামে ফেলিয়া চলিতে আরম্ভ করে। তাহারা শুঁয়ো দু'টিকে বৃথা নাড়ায় না। প্রত্যেক শুঁয়োর গোড়ায় তাহাদের কান থাকে। জলের ভিতরকার শব্দ শুনিবার জন্য উহারা শুঁয়ো নাড়িতে নাড়িতে চলে।

কান বলিতে আমরা যাহা বুঝি, চিংড়িদের কান মোটেই সে-রকম নয়। শুঁয়োর গোড়ায় ছোট থলির মত এক-একটা অংশই ইহাদের কান। এই থলির ভিতরে লালার মত এক রকম জিনিস এবং কয়েক কণা বালি ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। চিংড়িরা অতি অল্প শব্দও এই কান দিয়া শুনিতে পায়।

তোমরা যদি চিংড়ি মাছের কান দেখিতে চাও, তবে মাথার যেখানে তাহার ছোট শুঁয়ো জোড়াটি লাগানো আছে, সেই জায়গায় খোঁজ করিয়ো। লোমে-ঢাকা থলির মধ্যে উহার অদ্ভুত কান নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে।

কানের ঠিক উপরে চিংড়ির দুইটি বেশ বড় বড় চোখ আছে। আমাদের চোখ যেমন মাংসের মধ্যে বসানো থাকে, ইহার চোখ সে রকম দেখিবে না। দুইটা ছোট কাঠির মাথায় যেন চোখ দুটি বসানো আছে।

চিংড়ির চোখ বড় মজার জিনিস। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া যদি ইহাদের চোখ পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাও, তবে

প্রত্যেক চোখে মধুর চাকের উপরকার ছোট কুঠারির মত শত শত কুঠারি দেখিতে হইবে। এই প্রত্যেক কুঠারিই চোখ। তাহা হইলে বলিতে হয়, চিংড়ির মাথায় যে কালো কালো দুটি চোখ দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটিতেই শত শত ছোট চোখ আছে। কিন্তু এতগুলি চোখ আছে বলিয়াই ইহারা যে বড় প্রাণীদের চেয়ে অনেক ভালো করিয়া দেখিতে পায়, তাহা বলা যায় না। ইহাদের চোখের পাতা নাই; কাজেই, ডাইনের এবং বামের শত শত চোখ সর্ব্বদা খোলা থাকে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ছোট প্রাণী হইলেও চিংড়িদের চোখ কান খুব জোরালো না হইলেও বেশ সজাগ।

অন্ধকারে যখন কিছুই দেখা যায় না, তখন আমরা হাত বা পা দিয়া ছুঁইয়া কাছে কি কি জিনিস আছে ঠিক করি। চিংড়িরা তাহাদের লম্বা লম্বা শুঁয়ো দিয়া ছুঁইয়া দূরে কি জিনিস আছে তাহা বুঝিয়া লয়। সুতরাং ইহাদের স্পর্শ-শক্তিও কম নয়।

খাদ্য দ্রব্য লুকানো থাকিলে কেবল চোখে দেখিয়া তাহার খোঁজ পাওয়া যায় না। তখন গন্ধ শুঁকিয়া লুকানো খাদ্য বাহির করিতে হয়। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি খুব বেশি। কেবল গন্ধ শুঁকিয়া শুঁকিয়া অনেক কুকুর গভীর জঙ্গল হইতে শিকার ধরিয়া আনে। চিংড়িরা মাংসাশী প্রাণী। জলের মধ্যে পচা মাছ বা মাংস যাহা কিছু থাকে, তাহাই

সন্ধান করিয়া ইহারা খায়। কাজেই, লুকানো খাবার সংগ্রহ করা ইহাদের খুবই দরকার হয়। এই কাজের জন্য চিংড়িদের খুব ঘ্রাণশক্তি আছে। কিন্তু যে নাক দিয়া ইহারা গন্ধ লয়, তাহা শরীরের ঠিক কোন্ জায়গায় আছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পণ্ডিতেরা আন্দাজ করেন, চিংড়ির কান যেমন শুঁয়োর গোড়ায় আছে, নাকও হয় ত শুঁয়োরই কোনো এক জায়গায় আছে।

চিংড়ির শ্বাস-প্রশ্বাস

তোমাদিগকে আরো অনেকবার বলিয়াছি, জীবন্ত থাকিয়া শরীর পুষ্ট করিতে হইলে, প্রাণীদের শরীরে অক্সিজেনের দরকার হয়। বাতাসে অক্সিজেন্ আছে। বড় বড় প্রাণীরা নাক-মুখ দিয়া বাতাসের অক্সিজেন্ টানিয়া শরীরের ভিতরকার ফুস্ফুসে প্রবেশ করায় এবং ফুস্ফুসের রক্ত সেই অক্সিজেন্ শুষিয়া লয়। জলের প্রাণী জলে-মিশানো বাতাসের অক্সিজেন্ শুষিয়া লয়। এই সকল কথা তোমরা আগে শুনিয়াছ। কিন্তু চিংড়িমাছেরা শরীরে অক্সেজেন্ লইবার জন্য এই দুই উপায়ের কোনোটাই অবলম্বন করে না। অক্সিজেন্ টানিবার জন্য ইহাদের দেহে একটি বিশেষ যন্ত্র আছে। চিংড়িদের মাথা যে চওড়া খোলা দিয়া ঢাকা থাকে,

সেইটা খুলিয়া ফেলিলেই উহার নিশ্বাসের যন্ত্র দেখিতে পাইবে। চিংড়িমাছের মাথার খোলা ছাড়াইবার সময়ে হয়ত তোমরা ঐ যন্ত্র দেখিয়াছ। ইংরাজিতে ইহাকে গিল্ (Gill) বলে, আমরা তাহাকেই কান্‌কো বলিব।

চিংড়ির মাথার দুই পাশে ঐ কান্‌কো দু'টা থাকে। ইহা দেখিতে সাদা এবং পাখীর কোঁকড়ানো পালকের মত অনেক ছোট অংশ দিয়া প্রস্তুত। মাথার দুই পাশে মালার

চিত্র ২৩—চিংড়ির কান্‌কো

মত গোলাকারে সেগুলি উপরে উপরে সাজানো থাকে। এখানে চিংড়ি কান্‌কোর একটা ছবি দিলাম।

গোরু পাখী মাছ প্রভৃতি মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণীদের রক্ত লাল। ইহা ছাড়া অপরপ্রাণীদের রক্তের বিশেষ রঙ্ নাই। চিংড়িমাছের শরীরে রক্ত আছে, কিন্তু সে রক্ত রাঙা নয়—প্রায় জলের মত বর্ণহীন। এই রক্ত চিংড়ির কানকোর সেই পালকের মত অংশের ভিতর দিয়া

চলা-ফেরা করে এবং তাহাই জলে-মিশানো বাতাসের অক্সিজেন শুষিয়া লয়।

কান্‌কো কঠিন খোলা দিয়া ঢাকা থাকে, তবে কি করিয়া তাহার উপরে জল আসে,—বোধ হয় তোমরা ইহাই ভাবিতেছ।

খোলার ভিতরকার কান্‌কোর উপরে জল আসা-যাওয়ার বড় সুন্দর ব্যবস্থা আছে। চিংড়ির মাথায় খোলা খুব শক্ত করিয়া আঁটা থাকিলেও পায়ের গোড়ার কাছে খোলার ধার-গুলিতে বেশ ফাঁক থাকে। বাহিরের জল ঐ সকল ফাঁক দিয়া খোলার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কান্‌কোকে সর্ব্বদাই ঘেরিয়া রাখে। দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া যদি অনেক লোক একটি ছোট ঘরে অনেকক্ষণ বাস করে, তবে সকলেই নিশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন টানিয়া লয় বলিয়া ঘরের বাতাসের অক্সিজেন কমিয়া আসে এবং নানা রকম খারাপ বাষ্প শরীর ও নাক দিয়া বাহির হইয়া বাতাসকে খারাপ করিয়া দেয়। তাই ঘরে পরিষ্কার বাতাস প্রবেশ করাইবার জন্য দরজা-জানলা খুলিয়া রাখিতে হয়। চিংড়ি মাছের খোলার ভিতরে যে জল প্রবেশ করে, ঐ রকমে তাহারও অক্সিজেন কমিয়া আসে। এই জন্য জল যাহাতে ভিতরে আবদ্ধ না থাকিয়া স্রোতের জলের মত চলা-ফেরা করে, তাহার ব্যবস্থা থাকা দরকার হয়। এই ব্যবস্থা চিংড়ির দেহে ভালোই আছে। পিছনের পায়ের কাছে খোলার তলায় যে পথ থাকে, তাহা দিয়া জল ভিতরে

প্রবেশ করে এবং সম্মুখের পায়ের কাছের আর এক পথ দিয়া তাহা বাহির হইয়া যায়। কেবল ইহাই নয়, যাহাতে খোলার ভিতরে জল স্রোতের মত জোরে বাহির হইয়া যায়, তাহার জন্য চিংড়ির সম্মুখের পায়ের কাছে পাখার মত ছোট অংশ জোড়া থাকে। চিংড়িরা সর্ব্বদাই এই পাখা ঘন ঘন নাড়িয়া ভিতরের জল বাহির করিয়া দেয়। এই রকমে একটা জলের স্রোত সর্ব্বদাই কান্‌কোর উপর দিয়া চলিতে থাকে। জল হইতে সর্ব্বদা অক্সিজেন টানিয়া লইবার এই ব্যবস্থা অতি সুন্দর নয় কি ?

চিংড়ির পাকযন্ত্র

নিশ্বাস লইবার যন্ত্রের কথা বলা হইল ; এখন চিংড়িদের পাকাশয় ইত্যাদির কথা বলিব।

এখানে চিংড়ি মাছের আর একটা ছবি দিলাম। খোলা ছাড়াইয়া মাঝামাঝি চিরিলে চিংড়িকে যে-রকম দেখায়, ছবিতে তোমরা তাহাই দেখিবে।

চিত্র ২৪

মাথার ভিতরে যে গোলাকার কালো অংশটা রহিয়াছে, উহাই চিংড়ির উদর। প্রাণীদের পাকাশয় প্রায়ই দেহের নীচে থাকে, কিন্তু চিংড়িদের সকলি অদ্ভুত। ইহাদের উদর

মাথার উপরে থাকে। যাহা হউক চিংড়িরা যাহা খায়, তাহা মাথার উপরকার সেই থলিতে ঠেলিয়া উঠে। চিংড়ি মাছ খাইবার জন্য কুটিবার সময়ে ঐ থলির মত উদরটা স্পষ্ট দেখা যায়। উদরের সঙ্গে সরু লম্বা নল লাগানো থাকে। ইহাই চিংড়িদের অন্ত্র বা নাড়িভুঁড়ি। এই নল পিঠের উপর দিয়া আসিয়া লেজের তলায় শেষ হইয়াছে; পেটের মল এই পথ দিয়া লেজের কাছে আসে এবং শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। চিংড়ি মাছ কুটিবার সময়ে পিঠের উপরের এই নল তোমরা খোঁজ করিলে দেখিতে পাইবে।

ইহা ছাড়া চিংড়ির দেহে আর দুইটি সরু নল আছে। অন্ত্রের উপরে ইহাদের যকৃৎ অর্থাৎ লিভার থাকে। তাহা হইতে ঐ দুটি নল দিয়া পিত্তরস অন্ত্রে আসিয়া পড়ে; ইহাতে খাদ্য হজম হয়।

চিংড়ির শরীরে রক্তের চলাচল

আগেই বলিয়াছি, চিংড়িদের শরীরে রক্ত আছে, কিন্তু সে রক্ত লাল নয়। যাহা হউক, রক্ত থাকিলে তাহা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গে চলা-ফেরা করে এবং বদ্ রক্ত যাহাতে পরিষ্কার হয়, শরীরে এই সকল ব্যবস্থা থাকা দরকার। চিংড়ির দেহে

ইহার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। বড় প্রাণীদের দেহের হৃৎপিণ্ড তালে তালে দপ্ দপ্ করিয়া পম্পের মত শিরার মধ্যে রক্তের স্রোত চালায়। চিংড়ির দেহেও এই রকম হৃৎপিণ্ড আছে। আগের ছবিখানি দেখিলেই জানিতে পারিবে, তাহা উদরের উপরে অর্থাৎ পিঠের খুব কাছে থাকে। কান্‌কোতে যে রক্ত অক্সিজেন টানিয়া নির্ম্মল হইয়াছে, তাহা হৃৎপিণ্ডের থলিতে আসিয়া জমা হয়। তার পরে হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হইয়া যখন সেই আবদ্ধ রক্তে চাপ দিতে থাকে, তখন তাহা পিচ্‌কারির জলের মত শিরা-উপশিরা দিয়া সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।

চিংড়ির স্নায়ুমণ্ডলী

চিংড়িরা কি রকম সজাগ প্রাণী তাহা বোধ হয়, তোমরা সকলে জান না। জল একটু নাড়াচাড়া করিলে বা জলের কাছে সামান্য শব্দ করিলে চিংড়িরা চক্ষুর নিমেষে যে, কোথায় পালাইয়া যায়, তাহার সন্ধানই হয় না। ইহা হইতে বুঝা যায়, চিংড়িদের স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ বেশ ভালো চলে। জোঁক ও কেঁচোর শরীরে যেমন এক জোড়া স্নায়ুর সূতো দেহের

তলা দিয়া চলিয়া শাখা-প্রশাখায় বাম ও ডাইন অঙ্গকে আচ্ছন্ন করে, ইহাদের দেহেরও স্নায়ুমণ্ডলী ঠিক সেই রকমেই সর্ব্ব শরীরে ছড়ানো থাকে। তা' ছাড়া এই দুই শাখার স্নায়ু চিংড়ির মাথায় তাল পাকাইয়া একটা বড় রকমের টেলিগ্রাফ্-আফিসের সৃষ্টি করে। কাজেই বাহিরের অতি ছোটখাটো খবর পাইতে উহাদের দেরি হয় না। মাথার এই বড় টেলিগ্রাফ্-আফিসটিই তাহাদের মস্তিষ্ক।

আমরা এ-পর্য্যন্ত যে-সকল প্রাণীর কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে চিংড়িদের মস্তিষ্কই বেশি উন্নত। দেহের কোন্ জায়গায় মস্তিষ্ক আছে, তাহা ছবি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে।

স্ত্রী-পুরুষ ভেদ

চিংড়িদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। ইহাদের কতক স্ত্রী এবং কতক পুরুষ হইয়া জন্মে। স্ত্রী-চিংড়িরা দেহের তলার একটি সরু ছিদ্র দিয়া অনেক ডিম প্রসব করে। কিন্তু প্রসবের পর সেগুলিকে জলে ফেলিয়া দেয় না। শরীর হইতে আঠার মত এক রকম পদার্থ বাহির করিয়া ডিমগুলিকে শরীরের তলায় সেই সাঁতরাইবার ডানার গায়ে লাগাইয়া রাখে।

তোমরা নিশ্চয়ই চিংড়িদের এই রকম ডিম দেখিয়াছ। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা হইলে সাধারণ চিংড়িরা আর বাচ্চাদিগকে

আট্কাইয়া রাখে না ; তাহারা যে-যেখানে পারে সেইদিকে চলিয়া যায়। কয়েক জাতীয় বড় চিংড়ি বাচ্চাদিগকে অনেক দিন কাছে-পিঠে রাখে। বেশ বড় না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি মায়ের কাছ-ছাড়া হয় না।

চিংড়ির খোলস ছাড়া

কঠিন আবরণে শরীর ঢাকা থাকিলে, মাঝে মাঝে তাহা বদ্লানো দরকার হয়। আবরণ পাকাপাকি রকমে দেহ ঢাকিয়া রাখিলে, শরীর বাড়িতে পায় না। তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ, আগে চীনদেশের মেয়েরা ছেলে-বেলায় লোহার জুতা পায়ে পরিত এবং তাহা জন্মে পা হইতে খুলিত না। কাজেই বয়সের সঙ্গে তাহাদের শরীর বাড়িত, কিন্তু পা দুখানি বুড়ো বয়সেও ছেলে-মানুষের পায়ের মত ছোটই থাকিয়া যাইত। গায়ের খোলা মাঝে মাঝে না বদ্লাইলে চিংড়িদেরও ঐ দশা হইত,—তাহারা আর বাড়িতে পারিত না ; ডিম হইতে বাহির হওয়ার পর ইহাদের যে-রকম আকৃতি ছিল, চিরজীবন তাহাই থাকিয়া যাইত। সাপ যেমন খোলস ছাড়ে, তেম্নি চিংড়িরা মাঝে মাঝে গায়ের খোলা ছাড়িয়া বড় হয় এবং সেই বড় দেহের উপরে আবার নূতন করিয়া খোলা জন্মে।

চিংড়ি-সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল। কিন্তু এই সকল কথা শুনিয়া তোমরা চিংড়িকে যত নিরীহ প্রাণী বলিয়া মনে করিতেছ, তাহারা সে-রকম নয়। সর্ব্বাঙ্গ খোলায় ঢাকিয়া, লম্বা পায়ের সাঁড়াশির মত নখ ও মাথার খাঁড়া বাহির করিয়া বড় বড় চিংড়িরা যখন জলের ভিতর দিয়া চলে, তখন চিংড়িদিগকে লড়ায়ের সেপাই বলিয়া মনে হয়। এই চেহারা দেখিয়া অন্য জলচর প্রাণীরা উহাদিগকে বাঘ ভালুকের মত ভয় করিয়া ছুটিয়া পালায়। ইহাদের মত ঝগড়াটে প্রাণী বোধ হয় সমস্ত সমুদ্র খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। জলের ছোট প্রাণীদিগকে কাছে পাইলেই ইহারা তাহাদের সহিত অকারণে ঝগড়া বাধায় এবং অনেক সময়ে সেগুলিকে মারিয়া খাইয়া ফেলে। নিজেদের মধ্যেও ইহারা কম ঝগড়া করে না। লড়াইয়ে আমাদের হাত পা কাটিয়া বা ভাঙিয়া গেলে আমরা চিরকালের জন্য খোঁড়া বা নুলো হইয়া থাকি। ঝগড়া-ঝাঁটি করিতে গিয়া যদি চিংড়িদের দুচার খানা পা খসিয়া যায়, বা লেজের পাখ্না খসিয়া পড়ে, তবে তাহারা একটুও ভাবনা করে না। পুরাতন পায়ের জায়গায় কয়েক দিনের মধ্যে নূতন পা গজাইয়া উঠে।

চিংড়িরা যেমন ঝগড়াটে, তেমনি মাংসাশী। নদীতে মরা জন্তুর শরীর পচিতে থাকিলে চিংড়ির দলই তাহার অধিকাংশই খাইয়া ফেলে।

কাঁকড়া

ষষ্ঠ শাখার পোকা-মকড়দের মধ্যে যাহারা কঠিন আবরণে শরীর ঢাকিয়া রাখে, তাহাদের মধ্যে চিংড়ি মাছের পরিচয় দিলাম। এখন ইহাদের জাত-ভাই আর একটি কঠিন-আবরণের প্রাণীর কথা বলিয়া এই শ্রেণীর প্রাণীদের কথা শেষ করিব।

কাঁকড়া তোমরা অবশ্যই দেখিয়াছ, হয় ত তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহা খাইয়াছ। কাঁকড়া কঠিনবর্ম্মী চিংড়ির জাত-ভাই এবং প্রজাপতি আরসুলার ন্যায় ষষ্ঠ শাখার প্রাণী।

তোমরা হয় ত এই কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতেছ। ষষ্ঠ শাখার প্রাণীর দেহে যে আংটির মত কঠিন অংশ জোড়া থাকে, তাহা কাঁকড়ার দেহে কোথায়?

তোমরা যদি একটা মরা কাঁকড়া চিৎ করাইয়া তাহার দেহের তলাকার অবস্থাটা পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে স্পষ্ট জানিতে পারিবে যে, চিংড়ির মত ইহারও শরীর অনেক ছোট অংশ দিয়া প্রস্তুত। কেবল ইহাই নয়; চিংড়ির শরীর যেমন মাথা ও লেজ এই দুই মোটামুটি ভাগে ভাগ করা থাকে, ইহাদের দেহও ঠিক সেই রকম দুই ভাগে ভাগ করা আছে।

আমরা যাহাকে কাঁকড়ার দেহ বলিয়া জানি. তাহা উহার মাথা। কাঁকড়ার লেজ খুব ছোট এবং পাত্‌লা।

ইহা কাঁকড়ারা বেশ ভালো করিয়া গুটাইয়া শরীরের তলায় রাখিয়া দেয়। তোমরা মরা কাঁকড়া লইয়া পরীক্ষা করিয়ো, দেখিবে, একটা পাতলা চওড়া পাতের মত জিনিস দেহের তলাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ইহাই কাঁকড়াদের লেজ। চিংড়ির লেজে অনেক মাংস থাকে, কাঁকড়ার লেজে তাহা থাকে না। এই জন্য খাবার জন্য কাঁকড়া কুটিবার সময়ে পেটের তলায় লুকানো লেজটা ফেলিয়া দেওয়া হয়।

কাঁকড়ার মাথা বাদামি রঙের বেশ মোটা খোলার ভিতরে লুকানো থাকে। ইহাদের দশখানি করিয়া পা থাকে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে সম্মুখের পা দুখানিই খুব মোটা ও তাহার আগায় সাঁড়াশির মত ধারালো ও শক্ত আঙুলের মত অংশ থাকে।

এখানে কাঁকড়ার একখানি ছবি দিলাম। দেখ,—অন্য পায়ের তুলনায় সম্মুখের পা দুখানি কত মোটা। ইহাই কাঁকড়াদের আহার-সংগ্রহ ও আত্ম-রক্ষার প্রধান অস্ত্র।
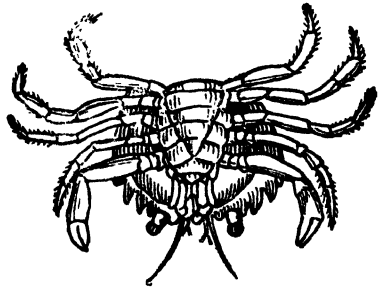
চিত্র ২৫—কাঁকড়া

মাছ, শামুক, গুগলি, পোকা-মাকড় সকলি কাঁকড়াদের খাদ্য, সম্মুখের দুটা পা অর্থাৎ দাড়া দিয়া ইহারা শিকারকে এমন

আক্রমণ করে যে, তাহারা কোনোক্রমে পালাইতে পারে না। শামুকের গায়ের খোলা উহারা দাড়া দিয়া মড়্‌মড়্‌ করিয়া ভাঙিয়া ফেলিতে পারে।

নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া পরস্পর খাওয়া-খায়ি করার স্বভাব ইহাদের আছে। লড়াইয়ে যদি দুচারখানি পা ভাঙিয়া যায়, তবে ইহারা তাহা গ্রাহ্যই করে না। পা খসিয়া গেলে শূন্য স্থানে আপনা হইতেই নূতন পা গজাইয়া উঠে।

জলের বাতাস হইতে অক্সিজেন টানিয়া লইবার জন্য চিংড়িদের শরীরে যেমন কান্‌কো থাকে, ইহাদের দেহেও ঠিক সেই রকমের কান্‌কো আছে। ইহার সাহায্যেই তাহারা রক্তের সহিত অক্সিজেন মিশায়।

কাঁকড়া যে কেবল জলেই থাকে, তাহা নয়। খাবারের সন্ধানে কয়েক জাতি কাঁকড়া জল হইতে উঠিয়া ডাঙায় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমাদের দেশে বর্ষাকালে মাঠে-ঘাটে এই রকম কাঁকড়া অনেক দেখা যায়। ডাঙায় বেড়াইবার সময়েও উহারা কান্‌কো দিয়া অক্সিজেন মিশায়। যে-রকমে এই কাজটি করে, তাহা বড় মজার। ইহারা ফন্দি করিয়া গায়ের খোলার ভিতরে অনেকটা জল আট্‌কাইয়া ডাঙায় উঠে। ডাঙায় বেড়াইবার সময়ে ঐ জলে যে অক্সিজেন মিশানো থাকে, তাহা টানিয়াই ইহারা বেশ আরামে থাকে। জলের অক্সিজেন যখন ফুরাইয়া যায়, তখন তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া ইহারা খারাপ জল ফেলিয়া দিয়া নূতন ভালো জল খোলার

ভিতরে আটক করে। এই রকমে জলে এবং স্থলে ইহারা বেশ সুখেই চলা-ফেরা করে।

কাঁকড়াদের স্নায়ুমণ্ডলী, চোখ, মুখ, কান সকলি চিংড়িদের মত। ইহারা যে মুখে খায় তাহা দেহের নীচে থাকে, হঠাৎ দেখিলে যেন মনে হয়, পেটের নীচেই মুখের গর্ত্ত রহিয়াছে। কিন্তু তাহা নয়। কাঁকড়ার যে অংশ খোলায় ঢাকা থাকে, তাহা উহাদের মাথা। চিংড়িদের মত ইহাদের মাথার নীচে মুখ আছে।

কাঁকড়ারা যে-সকল খাবার খায়, তাহা চোয়াল দিয়া ভালো করিয়া চিবানো যায় না। এই জন্য ইহাদের পেটের ভিতরে এক জোড়া ধারালো দাঁত থাকে। ঐ দাঁতে খাবার যেমন পিষিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে উহা তেমনি হজমও হইয়া যায়। যাহার পেটের ভিতরে দাঁত, সে কি রকম রাক্ষুসে প্রাণী একবার ভাবিয়া দেখ!

ডিম হইতে বাহির হইয়া কাঁকড়ার বাচ্চা ক্রমে যে-রকমে সম্পূর্ণ কাঁকড়ার আকার পায় তাহা বড় মজার। ডিম হইতে বাহির হওয়ার পর ইহারা যে-রকমে চেহারা বদ্‌লায় পর-পৃষ্ঠায় তাহার ছবি দিলাম। প্রথম ছবিটিতে তোমরা কাঁকড়ার ডিম হইতে বাহির হওয়ার ঠিক পরের অবস্থা দেখিতে পাইবে। এই অবস্থায় চিংড়ির মত কাঁকড়ার লেজ থাকে। তখন ইহারা মাছের মত জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায় এবং এই সময়ে ইহারা তাড়াতাড়ি এত বড় হয় যে,

সাত আট দিনের মধ্যে তিন চারিবার খোলা বদ্‌লাইতে হয়। কিন্তু বেশ বড় হইলে কাঁকড়ার চেহারা আর আর প্রথম ছবির

১ম অবস্থা . ২য় অবস্থা

চিত্র ২৬

কাঁকড়াদের শরীরের পরিণতির বিভিন্ন অবস্থা

মত থাকে না। এই সময়ে উহাদিগকে দ্বিতীয় ছবির মত দেখিতে পাইবে। তখন উহাদের গায়ে বেশ শক্ত খোলা হয়, দাড়া ও পা কয়েকটিও গজাইয়া উঠে; কিন্তু লেজ লুকাইয়া রাখিতে পারে না। এই অবস্থাতেও উহারা জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায় এবং বেশি পরিশ্রম হইলে কখনো কখনো জলের ভিতরকার শেওলাতে স্থির হইয়া থাকিয়া বিশ্রাম করে। ইহার পরে তিন চারিবার খোলা বদ্‌লাইয়া তাহারা ১৩৭ পৃষ্ঠার ছবির মত কাঁকড়ার প্রকৃত চেহারা পায়। এই সময়ে লেজটাকে গুটাইয়া এমনি করিয়া পেটের তলায় লুকাইয়া রাখে যে, কোনো কালে যে উহাদের লেজ ছিল তাহা বুঝাই যায় না।

এই রকমের নিজেদের ঠিক চেহারাখানা পাইলে, কাঁকড়ারা আর জলে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না। তখন ইহারা জলের তলায় বা জলের ধারে গর্ত্ত করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে।

এই অবস্থাতেও কাঁকড়া বৎসরে তিন-চারি বার গায়ের খোলা বদ্‌লায়। শেষে যখন খুব বড় হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের বৎসরে এক বারের বেশি খোলা ছাড়া দরকার হয় না।

কাঁকড়ারা যেমন মাছ গুগ্‌লি প্রভৃতি দুর্ব্বল ও ছোট প্রাণীর শত্রু, তেমনি কাঁকড়াদেরও শত্রুর অভাব নাই। আমাদের খাল বিল পুকুরের ধারে গর্ত্তে যে সকল কাঁকড়া থাকে শেয়াল তাহাদের পরম শত্রু। সম্মুখে পাইলে ইহারা খোলা সুদ্ধ কাঁকড়া চিবাইয়া খাইয়া ফেলে। শেয়ালেরা ভারি ধূর্ত্ত প্রাণী ; ইহাদের মত ফন্দি করিয়া কোনো প্রাণীই চলিতে পারে না। গর্ত্তের উপরে কাঁকড়া না পাইলে ইহারা গর্ত্তের ভিতরে নিজেদের লেজ ধীরে ধীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। কাঁকড়ারা বিরক্ত হইয়া দাঁড়া দিয়া শেয়ালের লেজ চাপিয়া ধরে। তার পরে শেয়াল তাড়াতাড়ি গর্ত্ত হইতে লেজ টানিয়া লইয়া লেজের গায়ের কাঁকড়াগুলিকে আনন্দে খাইতে আরম্ভ করে।

পতঙ্গ

চিংড়ি মাছ ও কাঁকড়ার কথা বলা হইল। এখন আমরা পতঙ্গদের কথা বলিব।

ষষ্ঠ শাখার প্রাণীদের মধ্যে পতঙ্গেরই সংখ্যা বেশি। হাজার হাজার রকমের পতঙ্গ সর্ব্বদাই আমাদের নজরে পড়ে এবং যাহারা আমাদের নজরে পড়ে না, তাহাদের সংখ্যা আরো বেশি। আরসুলা মশা মাছি প্রজাপতি এবং নানা রকম গোব্‌রে-পোকা সকলেই পতঙ্গের দলের প্রাণী। তা'-ছাড়া পিঁপ্‌ড়ে উই, ছারপোকারাও এই দলে পড়ে।

পিঁপ্‌ড়ে গোবরে-পোকা বা ফড়িং ধরিয়া তোমরা যদি পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহা হইলে সকলের দেহের মধ্যে বেশ একটা মিল দেখিতে পাইবে। ইহাদের কেবল আকৃতিতেই যে মিল আছে, তাহা নয়। দেহের ভিতরকার যন্ত্রাদিতে এবং সেই সকল যন্ত্রের কাজেও খুব মিল ধরা পড়ে।

এই মিল আছে বলিয়াই আমরা প্রথমে একটি মাত্র পতঙ্গের দেহ-যন্ত্রাদির কথা তোমাদিগকে বলিব। ইহা বুঝিলে, তোমরা যে-কোনো পতঙ্গের দেহের কাজ বুঝিয়া লইতে পারিবে। মানুষের আকৃতির মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। মোঙ্গলীয়, চীনবাসী, বর্ম্মাবাসী ও জাপানীদের রঙ্

কতকটা হল্‌দে রকমের, তাহাদের নাক খাঁদা। আফ্রিকার অধিবাসীদের গায়ের রঙ্‌ ঘোর কালো, ওষ্ঠ ভয়ানক পুরু। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের রঙ্‌ তামার মত লাল। আকৃতির এই রকম অমিল থাকিলেও, ইহাদের সকলেই মানুষ এবং সকলেরি শরীরে এক রকম যন্ত্র আছে এবং সকলের দেহের যন্ত্র এক রকমেই চলে। সুতরাং যদি কোনো একটি মানুষের শরীরের যন্ত্রের কথা তোমরা জানিয়া লইতে পার, তবে বাঙালী, ইংরেজ, কাফ্রি বা আমেরিকান্‌ সকলেরি শরীরের কথা জানা হয় না কি? এই জন্যই বলিতেছি, নানা জাতি পতঙ্গের আকৃতির মধ্যে অমিল থাকিলেও, তোমরা যদি একটিমাত্র পতঙ্গের শরীরের কাজ জানিয়া রাখিতে পার, তবে পৃথিবীর সমস্ত রকম পতঙ্গের দেহে কি প্রকারে জীবনের কাজ চলে, তাহা বলিয়া দিতে পারিবে।

আমরা পর-পৃষ্ঠায় একটি পতঙ্গের ছবি দিলাম। আমরা আগেই বলিয়াছি পতঙ্গদের শরীরে মাথা, বুক ও লেজ এই তিনটি মোটামুটি ভাগ আছে এবং ইহাদের প্রায় সকলেরি ছয়খানা করিয়া পা থাকে। ছবিতে তোমরা ছয়খানি পা এবং দেহের ভাগ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ছবিতে পাঁচটি ভাগ আছে। ইহার প্রথম ভাগটি মাথা; তাহার পরের তিনটি ভাগ লইয়া বুক এবং শেষের ভাগ লেজ।

আমাদের মাথা এবং দেহের মাঝে একটা সরু অংশ থাকে। ইহাই আমাদের গলা। অনেক পতঙ্গেরই

মাথা ও বুক ঐ রকমে জোড়া থাকে। তার পরে বুক ও লেজও আবার ঐ রকম সরু অংশ দিয়া জোড়া দেখা যায়।
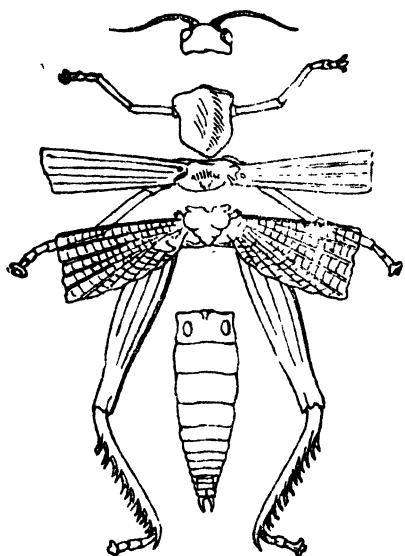
চিত্র ২৭।

তোমরা কাঁচপোকা বা বোলতার শরীর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। ইহাদের মাথা বুক ও লেজ পরস্পর তারের ন্যায় সরু অংশ দিয়া জোড়া দেখিতে পাইবে। এই রকমে জোড়া থাকে বলিয়াই পতঙ্গেরা মাথা বুক ও লেজকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ইচ্ছামত ঘুরাইতে পারে।

যাহা হউক, এখন আবার ছবিখানিকে দেখ। আংটির মত যে সব গাঁট দিয়া পতঙ্গের দেহ প্রস্তুত, তাহার মধ্যে তিনটি গাঁট লইয়া ইহাদের বুকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই গাঁটগুলির প্রত্যেকটি হইতে এক এক জোড়া পা বাহির হইয়াছে। কাজেই পতঙ্গদের মোট পায়ের সংখ্যা ছয়।

ডানা

পতঙ্গের যে ছবিখানি দেখিতেছ তাহাতে চারিখানি ডানা আছে। এগুলিও গাঁটের গা হইতে বাহির হইয়াছে।

প্রথম ডানা জোড়াটি হাড়ের মত শক্ত জিনিস দিয়া প্রস্তুত এবং বেশ মোটা। দ্বিতীয় ডানা জোড়াটি খুব পাত্‌লা। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় ইহা যেন ঘন-বুনানি-করা জাল। গাছের পাতায় যেমন শিরা-উপশিরার বুনানি থাকে, ইহাতেও সেই রকম আছে। একটা মাছি বা অপর যে-কোনো পতঙ্গের ডানা লইয়া পরীক্ষা করিলে তোমরা ইহা দেখিতে পাইবে। এই পাত্‌লা ডানাই ইহাদের উড়িতে সাহায্য করে। গোবরে-পোকা প্রভৃতি পতঙ্গেরা যখন মাটির উপরে বেড়ায় তখন তাহার পাত্‌লা ডানা ঐ হাড়ের ডানার মধ্যে লুকানো থাকে। এই জন্য বাহির হইতে সামান্য আঘাত লাগিলে উড়িবার পাত্‌লা ডানা নষ্ট হয় না এবং ভিতরেও সেই আঘাত পৌঁছায় না।

ইহা হইতে তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ—পতঙ্গদের আসল ডানা ছাড়া যে হাড়ের দুখানা ডানা আছে, তাহা উড়িবার জন্য নয়। হাড়ের ডানাই, পাত্‌লা ডানা এবং সমস্ত দেহটিকে ঢাকিয়া রাখে; ইহাতে সামান্য আঘাত লাগিলে দেহের কোনো ক্ষতি করিতে পারে না। এক দিন একটা গোবরে পোকা রাত্রিতে আমার আলোর চারিদিকে

ঘুরিয়া ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। জুতা দিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছিলাম,—কিন্তু ইহাতে সে মরে নাই। তাহার সমস্ত শরীরের উপরে যে হাড়ের ডানা ছিল, তাহাই উহাকে রক্ষা করিয়াছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া সকল পতঙ্গের দেহেই যে হাড়ের ডানা আছে, ইহা তোমরা মনে করিয়ো না। গোব্‌রে পোকা-জাতীয় পতঙ্গের দেহেই ইহা থাকে। মাছি, প্রজাপতি, মশা প্রভৃতির দেহে হাড়ের ডানা নাই। ইহাদের কাহারো দেহে দুখানা চারিখানা করিয়া পাত্‌লা ডানা দেখা যায়। আবার এ রকম পতঙ্গও অনেক আছে, যাহাদের দেহে ডানার লেশ-মাত্র নাই। পুরানো বইয়ের মধ্যে যে কাগজ-কাটা সাদা সাদা লম্বা পোকা দেখা যায়, তাহাদের ডানা নাই এবং উকুন ও ছারপোকাদেরও ডানা নাই, কিন্তু তথাপি ইহারা পতঙ্গ।

গোব্‌রে পোকার মাথা কি রকম তাহা পরীক্ষা করিলে, মাথার নীচে চিংড়ি মাছের দাড়ার মত অনেক অংশ তোমাদের নজরে পড়িবে। এইগুলি লইয়াই গোব্‌রে পোকাদের মুখ প্রস্তুত হইয়াছে। অন্য পতঙ্গদের মুখও প্রায় ঐ-রকম। উপরের ওষ্ঠ, নীচের ওষ্ঠ, খাদ্য চিবাইবার চোয়াল এবং খাদ্য আট্‌কাইবার চোয়াল,—এই চারিটিই মুখের প্রধান অংশ। নীচের ওষ্ঠ ও খাদ্য আট্‌কাইবার চোয়াল, এক একটা আঙুলের মত অংশ মাত্র। খাদ্য চিবাইবার চোয়াল বড় অদ্ভুত জিনিস। ইহার গায়ে করাতের মত দাঁত-কাটা থাকে, পতঙ্গেরা তাহা

দিয়া খাদ্য চিবায়। আমরা প্রায়ই চোয়াল উপর-নীচে নাড়াইয়া খাদ্য চিবাই, পতঙ্গেরা এই রকমে চোয়াল নড়াইতে পারে না। ইহারা চিংড়িমাছের মত চোয়াল পাশাপাশি চালাইয়া খাদ্য চিবায়।

প্রজাপতি ও অন্য যে-সকল পতঙ্গ মধু চুষিয়া খায়, তাহাদের মুখের আকৃতি একটু স্বতন্ত্র। আমরা যখন প্রজাপতিদের কথা বলিব, তখন উহাদের মুখের বিবরণ দিব।

লেজের গঠন প্রায় সকল পতঙ্গেরই এক রকম। পাঁচটা হইতে এগারোটা পর্য্যন্ত আংটি অর্থাৎ গাঁট্ জোড়া দিয়া ইহা প্রস্তুত এবং আংটিগুলি একটার উপরে আর একটা লাগানো থাকে। দূরবীণের নল যেমন একটা আর একটার ভিতরে থাকে, ইহাও যেন সেই রকম। তাই পতঙ্গেরা ইচ্ছা করিলে লেজ ফাঁপাইতে পারে।

শুঁয়ো

চিংড়ির মাথায় যেমন শুঁয়ো থাকে, পতঙ্গদের মাথায় সেই রকম শুঁড় বা শুঁয়ো আছে। কোনো পতঙ্গের শুঁয়ো লম্বা, কোনোটির আবার খুব ছোট। শুঁয়োর আকৃতিও নানা রকম হয়। যাহা হউক, পতঙ্গদের শুঁয়োর আগাগোড়া অখণ্ড জিনিস নয়। অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গাঁট্ জোড়া দিয়া এক একটি শুঁয়ো তৈয়ারী হয়। তাই পতঙ্গেরা যে দিকে খুসি শুঁয়ো হেলাইতে পারে।

তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য কর নাই, পতঙ্গেরা যখন গাছের ডালে বা পাতায় বসিয়া বিশ্রাম করে, তখন তাহারা শুঁয়ো দুটিকে পিঠের উপরে ফেলিয়া রাখে। কোনো জিনিস সম্মুখে পাইলে, আমরা যেমন হাত দিয়া ছুঁইয়া তাহা ঠাণ্ডা, গরম কি শক্ত বুঝিয়া লই, পতঙ্গেরা শুঁয়ো দিয়া ছুঁইয়া তাহার ঐরকম পরিচয় গ্রহণ করে। যদি আরসুলার লম্বা শুঁয়োতে হঠাৎ তোমার হাত লাগে, তবে সেই মৃদু স্পর্শও জানিতে পারিয়া আরসুলা পলাইয়া যায়। অনেক পতঙ্গের দেহে নাকের সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ ইহারা শুঁয়ো দিয়াই নাকের কাজ চালায়। যাহাই হউক, শুঁয়ো যে পতঙ্গদের বিশেষ দরকারী ইন্দ্রিয় তাহাতে আর একটুও সন্দেহ নাই। দুইটি পিঁপ্ড়ে চলিতে চলিতে মুখোমুখি হইলে কি করে তোমরা দেখ নাই কি? তাহারা শুঁয়ো দিয়া পরস্পরকে ছুঁইতে থাকে, দেখিলে মনে হয় যেন, তাহারা পরস্পর কি বলাবলি করিতেছে।

কান

কাছে শব্দ হইলে পতঙ্গেরা চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করে এবং হাততালি দিলে পলাইয়া যায়। ইহা দেখিলে বুঝা যায়, শব্দ শুনার জন্য অপর প্রাণীদের ন্যায় পতঙ্গদের কানও আছে। বড় প্রাণীদের কান মাথার উপরে লাগানো থাকে। কিন্তু পতঙ্গের কান শরীরের একই নির্দ্দিষ্ট জায়গায় দেখা যায় না। ফড়িঙের কান তাহাদের পায়ের উপরে লাগানো থাকে।

চোখ

পতঙ্গদের চোখ বড় আশ্চর্য্যজনক জিনিস। মাছির মাথার দুই পাশে যে দুটা বড় চোখ থাকে, তাহা তোমরা অবশ্যই দেখিয়াছ। অনেক পতঙ্গেরই এই রকম চোখ আছে। ইহা ছাড়া বড চোখ দুটির মাঝামাঝি জায়গায় তাহাদের আরো গোটা তিনেক চোখ থাকে। ছোট চোখ আমাদেরি চোখের মত। কিন্তু বড় চোখ দুটি বড় মজার জিনিস। ইহাদের প্রত্যেকটিতে হাজার হাজার ছোট চোখ জটলা পাকাইয়া থাকে। তাহা হইলে বলিতে হয়, হাজার হাজার ছোট চোখে মিলিয়া পতঙ্গদের এক একটি চোখের সৃষ্টি করে।

এখানে পতঙ্গের একটা চোখের ছবি দিলাম। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে চোখটিকে যে রকম দেখায়, ছবিতে তাহাই আঁকা আছে। দেখ, মৌমাছির ঘরের মত হাজার হাজার চোখ একত্র হইয়া রহিয়াছে। মাছির মাথায় এই রকম চারি হাজার চোখ থাকে। প্রজাপতিদের চোখের সংখ্যা আরো বেশি। ইহাদের এক-একটি চোখে সতের হাজার ছোট চোখ থাকে। কিন্তু গোব্‌রে পোকারা এ বিষয়ে সকলকেই

চিত্র ২৮—পতঙ্গের চোখ

হারাইয়াছে,—তাহাদের এক একটির মাথায় প্রায় পঁচিশ হাজার চোখ আছে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, আমাদের দুইটা চোখেই বেশ কাজ চলিয়া যায়; পতঙ্গেরা এতগুলো চোখ লইয়া কি করে? এই কথাটা সত্যই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া পোকা-মাকড়ের জীবনের কাজ পরীক্ষা করিয়াছেন, পতঙ্গের এতগুলো চোখের ব্যবহার কি, তাহা তাঁহারাও ঠিক করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন, কোন্ জিনিস উজ্জ্বল এবং কোন্ জিনিস অনুজ্জ্বল, পতঙ্গেরা ঐ-সকল চোখ দিয়া কেবল তাহাই বুঝিতে পারে। এগুলি ছাড়া মাথার উপরে যে পৃথক্ চোখ থাকে তাহা দিয়াই উহারা সব জিনিস স্পষ্ট দেখিতে পায়। স্পষ্ট দেখিলেও পতঙ্গদের দৃষ্টিশক্তি খুব বেশি নয়। কাক, চিল, শকুনি বা অপর প্রাণীরা দুটি ছোট চোখ দিয়া যেমন দেখিতে পায়, পতঙ্গেরা হাজার হাজার চোখ দিয়াও সে-রকম দেখিতে পায় না।
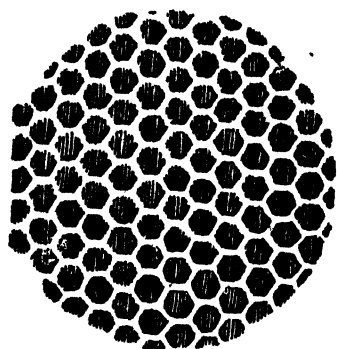
চিত্র ২৯—পতঙ্গের চোখ

পতঙ্গের পা

আমাদের পায়ে মোটামুটি কতগুলি অংশ আছে মনে করিয়া দেখ। কুঁচ্‌কি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত একটা অংশ আছে। তার পরে হাঁটু হইতে পায়ের গোছ পর্য্যন্ত আর একটা অংশ রহিয়াছে। সর্ব্বশেষে আঙুল লইয়া পায়ের পাতা আছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, তিনটি বড় অংশ লইয়াই আমাদের পায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আঙুল ইত্যাদিতে অনেক জোড় আছে সত্য, কিন্তু বড় জোড় ঐ তিনটি। পতঙ্গদের পায়ে মোটামুটি ঐ-রকম তিনটি অংশ আছে। আমাদের পায়ের পাতায় যেমন অনেক জোড় থাকে, পতঙ্গদের পায়ের পাতায় সেই রকম জোড় আছে; এই জোড়ের সংখ্যা দুই হইতে পাঁচ পর্য্যন্ত দেখা যায়। এই সকল জোড়ের গায়ে নখের মত অংশ বাহির করা থাকে। কিন্তু সব পতঙ্গের ছয়খানা পা সমান লম্বা নয়। যে-সব পোকা লাফাইয়া চলে, তাহাদের পিছনের দুখানা পা খুব লম্বা হয়। বুড়ো মানুষ শীতের সময়ে যেমন হাঁটু মুড়িয়া বসে, ঐ সকল পোকাদের পিছনের পা স্বভাবতই সেই রকম মোড়া থাকে। ফড়িং ও উচ্চিংড়ের পিছনের পা খুব লম্বা এবং ঐ-রকমে মোড়া আছে দেখিবে। যে-সব পতঙ্গ জলে সাঁতার দিতে পারে, তাহাদের পায়ের পাতা বেশ চওড়া থাকে। দাঁড় টানিয়া যেমন নৌকা চালানো হয়, দাঁড়ের মত চওড়া পায়ে জল কাটিয়া তাহারা

সাঁতার দেয়। মাছিরা কি-রকমে চলে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। তাহারা ফড়িঙেএর মত লাফায় না। বেশ ভদ্রভাবে পা ফেলিয়া চলে, আবার খাড়া দেওয়ালের গায়ের উপর দিয়া বেশ চলিয়া বেড়ায়। দেওয়ালের গা হইতে কেন পড়িয়া যায় না,—ইহা তোমাদের কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় না কি? আমি ছেলেবেলায় ভাবিতাম, আমরা দেওয়ালের গায়ে পা দিয়া চলিতে পারি না, তবে কেন পিঁপ্‌ড়ে ও মাছিরা দেওয়ালের গায়ে পা লাগাইয়া ছুটাছুটি করে?

তোমাদিগকে প্রথমে একটা খুব সাধারণ কথা বলিব। ইহা বুঝিতে পারিলে, টিকৃটিকি প্রভৃতি প্রাণীরা মাটিতে না পড়িয়া কি-রকমে দেওয়ালের গায়ে হাঁটিয়া বেড়ায়, তাহা বুঝিতে পারিবে। চাবির যে দিক্‌টায় ছিদ্র থাকে, সেটা মুখের মধ্যে দিয়া ভিতরকার বাতাস টানিয়া লইলে কি হয়, তোমরা দেখ নাই কি? আমরা ছেলেবেলায় একটা চাবি পাইলেই মুখে দিয়া তাহার ছিদ্রের ভিতরকার বাতাস টানিয়া লইতাম। এই অবস্থায় চাবিটার মুখ জোরে জিভে বা ওষ্ঠে লাগিয়া যাইত। তোমরা একবার এই রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। চাবির ছিদ্রে বাতাস থাকে না, তাই বাহিরের বাতাসের চাপে চাবি জিভে বা ওষ্ঠে আট্‌কাইয়া যায়। টিক্‌টিকি প্রভৃতির পায়ের পাতায় কতকটা ঐ-রকম ব্যবস্থা আছে। পায়ের তলা হইতে উহারা বাতাস বাহির করিতে

পারে। এই জন্য বাহিরের বাতাসের চাপে পা দেওয়ালের গায়ে জোরে আট্‌কাইয়া যায়। কিন্তু মাছিরা যে-রকমে দেওয়ালে পা আট্‌কাইয়া চলা-ফেরা করে, তাহা স্বতন্ত্র। আমরা যখন মাছির কথা বলিব, তখন এই বিষয়টি ভালো করিয়া বুঝাইব।

গঙ্গা ফড়িঙের সম্মুখের দু'টা পা খুব বড় এবং মোটা। সেগুলির গায়ে আবার করাতের মত দাঁত-কাটা। ইহারা এই দুটি পা অস্ত্রের মত ব্যবহার করে। প্রজাপতির পা আবার অন্য রকমের। পিছনের পা এত ছোট যে, তাহা নাই বলিলেই হয়। সাম্‌নের পায়েই উহাদের কাজ চলিয়া যায়। যে-সব পতঙ্গ মাটির তলে গর্ত্তে বাস করে, তাহাদের পা মাটি খোড়া এবং তাহা সরাইয়া ফেলিবার উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত-হইয়াছে; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পতঙ্গের যে-রকমটি দরকার পায়ের আকৃতি প্রকৃতি ঠিক সেই রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় কি?

দেহের ভিতরকার কথা

পতঙ্গের দেহের উপরকার অনেক কথা বলা হইল; এখন ইহাদের পাকাশয় ইত্যাদি ভিতরকার খবর মোটামুটি

বলিব। এখানে একটা ছবি দিলাম, ইহাতে পতঙ্গের শরীরের ভিতরকার নাড়িভুঁড়ি আঁকা আছে।
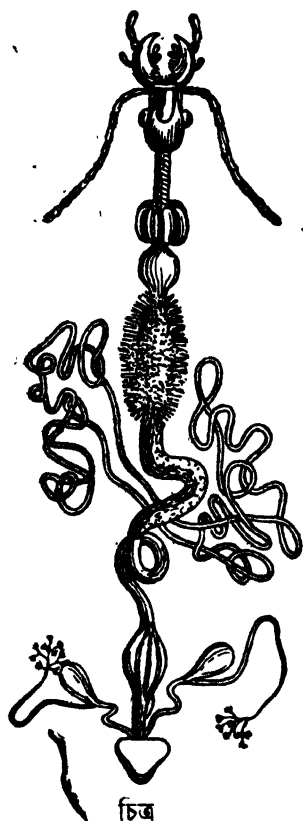
চিত্র

আমাদের মুখের ভিতরটা সর্ব্বদাই ভিজে থাকে। ইহার উপরে যদি খাদ্য মুখে পড়ে, তবে লালা বাহির হইয়া মুখের খাদ্যকে ভিজাইয়া ফেলে। এই লালা কোথা হইতে আসিয়া মুখে জমা হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। আমাদের মুখের মধ্যে চারি পাঁচ জায়গায় ছোট রসুন বা পেঁয়াজের কোষের মত মাংসগ্রন্থি আছে। লালা সঞ্চয় করিবার জন্যই এগুলির সৃষ্টি। তাই গ্রন্থিগুলিতে আপনা হইতেই লালা জমা হয় এবং তাহা প্রয়োজন-অনুসারে সরু নল দিয়া মুখের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। একটু তেঁতুল বা লেবুর টুক্‌রা মুখে রাখিয়া তোমরা পরীক্ষা করিয়ো; স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে, জিভের গোড়া এবং নীচেকার চোয়ালের কাছ হইতে লালা

আসিয়া মুখে জমিতেছে। মুখের ঐ-সব জায়গাতে লালার গ্রন্থি আছে। এইগুলি মাংসের মধ্যে বসানো থাকে; সুতরাং মুখে আঙুল দিয়া বা আয়নায় মুখের ছবি দেখিয়া সেগুলিকে দেখিতে পাইবে না। কেবল মানুষেরই মুখে যে লালা-গ্রন্থি আছে, তাহা নয়; পতঙ্গদের মুখেও উহা দেখা যায়। ফড়িং-জাতীয় পতঙ্গের মুখে ঐ-রকম গ্রন্থি দুই তিন জায়গায় আছে। খাইবার সময়ে ইহারা ঘাস পাতা বা অপর খাদ্য লালা দিয়া ভিজাইয়া গিলিয়া ফেলে।

ছবিতে প্রথমেই পতঙ্গের মাথা ও শুঁয়ো রহিয়াছে দেখিবে। তার পরেই গলার নল; এই নল দিয়া খাদ্য নামিয়া পল-কাটা থলিতে পৌঁছে। এখানে খাদ্য পরিপাক হয় না,—জমা থাকে মাত্র। ইচ্ছা করিলে অনেক পতঙ্গ ঐ থলি হইতে খাবার উগ্‌লাইয়া বাহির করিতে পারে। পিঁপ্‌ড়েরা খাদ্য এই রকমে উগ্‌লাইয়া নিজেদের বাচ্চাকে খাইতে দেয়; পাখীরাও তাহা করে। ইহার পরে যে থলিটি দেখিতেছ, তাহা বড় মজার। ইহার মধ্যে হাড়ের মত শক্ত জিনিসে প্রস্তুত অনেক দাঁত সাজানো আছে। পতঙ্গেরা ভালো করিয়া খাদ্য চিবাইয়া খায় না; কিন্তু খাদ্য না চিবাইলে হজমও হয় না। পেটের ভিতরে গিয়া খাদ্য যাহাতে চিবানো হয় তাহার জন্যই এই থলিতে দাঁত বসানো আছে। খাদ্য এখানে পৌঁছিলেই দাঁতের ধারে লম্বা লম্বা পাতা ও ঘাস ছোট ছোট টুক্‌রাতে বিভক্ত হইয়া যায়।

যাহা হউক ছবিতে এই দাঁত-ওয়ালা থলির পরেই যে মোটা থলিটি রহিয়াছে, তাহাই পতঙ্গদের পেট বা উদর। এখানে খাদ্য হজম হয়। ইহার সঙ্গে যে নল লাগানো আছে, তাহা দিয়া সেই হজম-করা খাদ্য দেহের শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছায়, এবং যাহা অনাবশ্যক তাহা বিষ্ঠার আকারে চিত্রের তলাকার অংশ দিয়া বাহির হইয়া যায়।

ছবির দুই পাশে যে সূতার মত সরু নল জটলা করিয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে নানা রকম রস বাহির হয়, এবং সেই রসে খাদ্য হজম হয়। ছবির শেষে দুই পাশে যে, আরো দুটি থলি ও ফুলের মত অংশ দেখিতেছ, এগুলি হইতেও কয়েক রকম রস বাহির হয়। কিন্তু ইহা হজমের কাজে লাগে না। মৌমাছি, পিঁপ্‌ড়ে এবং কাঁকৃড়া বিছের হুলে বিষ থাকে ইহা তোমরা জান। এই বিষ-রস ঐ-সকল যন্ত্রে উৎপন্ন হয়।

পতঙ্গের শ্বাস-প্রশ্বাস

পতঙ্গদের নিশ্বাস টানার ও নিশ্বাস ফেলার যন্ত্রটি অতি চমৎকার। শ্বাস-প্রশ্বাসের এ-রকম যন্ত্র পতঙ্গ ছাড়া আর কোনো প্রাণীতে দেখা যায় না।

এখানে একটা পোকার লেজের কতকটার ছবি দিলাম। ছবির চারিধারে মালার মত যে জিনিসটা দেখিতেছ, উহা ফাঁপা নল। পতঙ্গেরা বাহিরের বাতাস লেজের তলার এই সকল নলের ভিতর দিয়া লইয়া শরীরের সর্ব্বত্র চালাইয়া দেয়। এই ব্যবস্থায় বাতাসের অক্সিজেন্ টানিয়া লইয়া পতঙ্গদের দেহের রক্ত পরিষ্কৃত হয়। কাজেই, নলের ভিতরে বাতাসের চলাচলই নিশ্বাসের কাজ করে।

চিত্র ৩১

নল খুব বেশি লম্বা হইলে অনেক গোলমালে পড়িতে হয়। লম্বা নল প্রায়ই মাঝে তুব্ড়াইয়া যায় এবং তুব্ড়াইয়া গেলে নলের ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায় ;—তখন তাহা দিয়া আর কাজ চলে না। বড় বড় সহরের রাস্তায় যে-সকল লম্বা নল দিয়া জল ছিটানো হয়, সেগুলি যাহাতে তুব্ড়াইয়া না যায়, তাহার জন্য কি-রকম ব্যবস্থা আছে, তোমরা দেখ নাই কি ? নলের গায়ে এবং কখনো কখনো নলের ভিতরে লোহা বা অপর কোনো ধাতুর মোটা তার জড়াইয়া রাখা হয়। ইহাতে নলের ছিদ্র তুব্ড়াইয়া বন্ধ হয় না। নিশ্বাস টানিবার জন্য পতঙ্গের দেহের যে নল তাহা কম লম্বা নয়। কাজেই, মাঝে মাঝে ইহার ছিদ্র বন্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে এবং

তাহাতে পতঙ্গের মৃত্যু হইবার ভয়ও থাকে। এই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য ইহাদের দেহের নলের ভিতরে লোহার ইস্প্রিঙের মত সরু তার লাগানো থাকে। যে হাড়ের মত শক্ত জিনিসে পতঙ্গের দেহ ঢাকা থাকে, সেই জিনিস দিয়াই ঐ-সকল নল প্রস্তুত। কাজেই, ঐ জড়ানো তার ভিতরে থাকিয়া নলগুলিকে সর্ব্বদা ফাঁপাইয়া রাখে; ইহাতে নল তুব্‌ড়াইতে পারে না।

এখন তোমরা বোধ হয় ভাবিতেছ, পতঙ্গের দেহের নলে বাহিরের বাতাস প্রবেশের পথ কোথায়? আমরা যেমন নাক মুখ দিয়া বাতাস টানিয়া ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করাই, পতঙ্গেরা নিশ্বাস টানার কাজে নাক বা মুখের ব্যবহার করে না। উহাদের লেজের উপরকার প্রত্যেক আংটির পাশে দুইটা করিয়া ছিদ্র থাকে; বাহিরের বাতাস এই সকল ছিদ্র দিয়া নলে প্রবেশ করে। ছবিতে লেজের দুই পাশে যে কালো দাগগুলি দেখিতেছ, তাহাই বাতাস আসা-যাওয়ার পথ।

তোমরা যদি বোল্‌তা ফড়িং বা অপর পতঙ্গের লেজের অংশ ভালো করিয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, ইহাদের লেজের দিক্‌টা সর্ব্বদা তালে তালে উঠানামা করিতেছে। আমরা নিশ্বাস টানিবার সময়ে বুক্ ফুলাই এবং নিশ্বাস ফেলিবার সময় বুক্ সঙ্কুচিত করি, কাজেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের বুক্ তালে তালে উঠা-নামা করে। পতঙ্গেরা

লেজটাকে ফুলাইয়া এবং সঙ্কুচিত করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়।

পতঙ্গদের নিশ্বাস লওয়া ও নিশ্বাস ছাড়ার কাজ খুব ঘন ঘন চলে। এইজন্য প্রাণরক্ষার জন্য ইহাদের অনেক বাতাসের দরকার হয়। আবদ্ধ ছোট জায়গায় আট্‌কাইয়া রাখিলে, ভালো বাতাসের অভাবে ইহারা মড়ার মত হইয়া যায়, কিন্তু একেবারে মরে না। তার পরে সেগুলিকে যদি কিছুক্ষণ ভালো বাতাসে রাখা যায় তবে আবার সুস্থ হইয়া উঠে।

বাতাসের অক্সিজেন্ শরীরে প্রবেশ করিলে প্রাণীরা পুষ্ট হয় এবং তাহাদের লাফালাফি ও চলা-ফেরা করিবার শক্তি বাড়ে। পতঙ্গদের দেহের অনেক জায়গায় নিশ্বাস টানিবার নল লাগানো থাকায় তাহারা অনেক অক্সিজেন পায়। এইজন্যই পতঙ্গেরা এত ছুটাছুটি ও লাফালাফি করিয়াও সহজে ক্লান্ত হয় না।

রক্ত-চলাচল

পতঙ্গের শরীরে কি-রকমে রক্ত চলাচল করে, এখন তোমাদিগকে তাহারি কথা বলিব।

রক্ত কথাটা শুনিলে লাল রঙের কথা মনে পড়ে, কারণ সকল বড় প্রাণীরই রক্ত লাল। চিংড়ি মাছের রক্ত লাল নয়,

ইহা তোমরা আগে শুনিয়াছ। পতঙ্গদের রক্তও লাল নয়; ইহা বর্ণহীন রসের মত।

শরীরের সকল অংশকে পুষ্ট করিবার জন্য প্রাণীদের দেহের সর্ব্বত্র রক্তের যাওয়া-আসা দরকার। বড় প্রাণীদের হৃদ্‌পিণ্ড আছে, তাহাই পম্পের মত চলিয়া শরীরে রক্তের স্রোত চালায়; কত শিরা-উপশিরা দিয়া সেই রক্তের ধারা চলে। পতঙ্গদের দেহেও হৃৎপিণ্ড আছে। লম্বা নলের মত এই যন্ত্রটি পতঙ্গের ঠিক পিঠের নীচে থাকে; এবং শরীরের কোনো জায়গায় শিরারও খোঁজ পাওয়া যায়।

স্নায়ুমণ্ডলী

এ-পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা হইতে বুঝা যায়, বড় প্রাণীদের শরীরে যে-সব ব্যবস্থা আছে, অনেক স্থলে তাহারি উল্‌টা ব্যবস্থা পতঙ্গদের শরীরে দেখা যায়। আমাদের দেহে যেমন হাড় আছে, পতঙ্গের শরীরেও সেই রকম হাড় আছে। কিন্তু তাহা মাংসের ভিতরে থাকে না, পতঙ্গের হাড় চাম্‌ড়ার মত সমস্ত দেহকে ঢাকিয়া রাখে। আমাদের দেহের সমস্ত যন্ত্র শরীরের সম্মুখভাগে থাকে, পতঙ্গদের শরীর-যন্ত্র পিঠের উপরে থাকে। আমাদের কেবল দুইটি মাত্র চোখ, কিন্তু পতঙ্গদের চোখের সংখ্যা দশ হাজার বিশ হাজারের কম নয়। নাক কান প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আমাদের শরীরের এক একটা

নির্দ্দিষ্ট জায়গায় থাকে। কিন্তু যাহাদের কান পায়ের গোড়ায় এবং নাক শুঁয়োর আগায়, এ-রকম পতঙ্গও অনেক পাওয়া যায়। আবার এ-রকম পতঙ্গ অনেক আছে, যাহাদের নাক বা কান শরীরের কোন্ জায়গায় লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহার সন্ধানই পাওয়া যায় না; অথচ তাহারা আমাদেরি মত শব্দ শুনিতে পায় এবং গন্ধ শুঁকিয়া খাবার সংগ্রহ করে।

পতঙ্গদের স্নায়ুমণ্ডলীও আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর তুলনায় দেহে উল্‌টা রকমে সাজানো আছে। মেরুদণ্ড-যুক্ত প্রাণীদের প্রধান স্নায়ুর তারগুলি শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া পিঠের দিকে থাকে, কিন্তু পতঙ্গের স্নায়ু শরীরের নীচের দিকে ছড়ানো দেখা যায়। চিংড়ির স্নায়ুর কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। পতঙ্গের স্নায়ু চিংড়ির স্নায়ুরই মত। দুইটা মোটা স্নায়ুর সূতা ইহাদের দেহের তল দিয়া আগাগোড়া বিস্তৃত থাকে এবং এই সূতার প্রত্যেকটি হইতে অনেক ছোট সূতা বাহির হইয়া দেহে ছড়াইয়া পড়ে। আবার মাঝে মাঝে ঐ-সকল স্নায়ুর সূতা জটলা পাকাইয়া স্নায়ুর কেন্দ্রের স্বষ্টি করে। এই সকল কেন্দ্র দিয়া কতকটা মস্তিষ্কের কাজ চলে। পতঙ্গদের মাথার আসল মস্তিষ্ক খুব ছোট। দেহের তলার সেই মোটা স্নায়ুর সূতা হইতে কয়েকটি সরু সূতা বাহির হইয়া মাথার এক জায়গায় একত্র হয় এবং তাহাই কোনোরকমে মস্তিষ্কের কাজ চালায়। পতঙ্গের শুঁয়ো ও চোখ এই মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত থাকে।

পিঁপ্ড়ে ও মৌমাছিরা খুব উন্নত প্রাণী। ইহারা দল-বদ্ধ হইয়া সমাজের সৃষ্টি করিতে জানে এবং সমাজের উন্নতির জন্য বুদ্ধিমান্ প্রাণীর মত অনেক বুদ্ধি খরচ্ করিয়া সমাজের কাজ চালায়। ইহাদের মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-মণ্ডলী অনেকটা উন্নত ও জটিল।

তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ, বোল্তা, ফড়িং প্রভৃতির মাথা কাটিয়া ফেলিলে, ইহাদের কাটা মাথা ও দেহ অনেকক্ষণ জীবিত থাকে। কিন্তু মাথা কাটা গেলে মানুষ গোরু ভেড়া অল্পক্ষণেই মারা যায়। পতঙ্গদের মস্তিষ্ক নিতান্ত ছোট এবং তাহাদের দেহের জায়গায় জায়গায় মস্তিষ্কের মত স্নায়ু-কেন্দ্র ছড়াইয়া আছে, সেই জন্য মাথা কাটা গেলেও তাহাদিগকে অনেকক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়।

বড় প্রাণীদের দেহে স্নায়ু বেশি এবং পতঙ্গদের শরীরে স্নায়ু অল্প। এইজন্য আঘাত পাইলে বড় প্রাণীরা পতঙ্গদের চেয়ে বেশি বেদনা বোধ করে। আমাদের একটা আঙুলের ডগায় ছুরির খোঁচা লাগিলে, কত বেদনা হয়, তাহা মনে করিয়া দেখ। কত জলপটি, কত ওষুধ না দিলে বেদনা কমে না, হয় ত রাত্রে ঘুমই হয় না। আমাদের দেহের প্রায় সকল জায়গায় অনেক স্নায়ু আছে বলিয়া এই বেদনা বোধ করি। আবার শরীরের যে-সব জায়গায় খুব বেশি স্নায়ু আছে, সেখানে আঘাত লাগিলে বেদনাও খুব বেশি হয়। কিন্তু একটা আরসুলার যদি মাথাটা থেঁত্লাইয়া যায়, বা

একখানা পা ভাঙিয়া যায়, সে এই আঘাত হঠাৎ গ্রাহ্য করে না—খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের কোণের দিকে ছুটিয়া পালায়। শরীরে বেশি স্নায়ু নাই বলিয়াই ইহারা ঐরকম আঘাতের বেদনা বুঝিতে পারে না,—এইজন্য আঘাতে আমাদের যত কাতর করে, পোকা-মাকড়দের তত কাতর করিতে পারে না। প্রতিদিনই আমাদের পায়ের চাপে কত পিঁপ্ড়ে, কত পোকা আঘাত পায়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। তা ছাড়া আরো কত কারণে কত পতঙ্গ যে প্রতি-মুহূর্ত্তে খোঁড়া হইতেছে এবং অঙ্গহীন হইতেছে, তাহা গুণিয়া ঠিক করা যায় না। ইহাদের বেদনা-বোধের শক্তি যদি আমাদেরি মত হইত, তবে তাহারা কত কষ্ট পাইত, একবার ভাবিয়া দেখ। উহারা যদি আমাদের মত চেঁচাইয়া কাঁদিতে জানিত, তবে মশা, মাছি, পিঁপ্ড়ে, আরসুলা প্রভৃতি পতঙ্গের কান্নার রোলে কান-পাতা যাইত না। ভগবান্ দয়া করিয়া উহাদের দেহে স্নায়ুর পরিমাণ অল্প রাখিয়াছেন বলিয়া উহাদের কষ্ট অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভগবানের কেমন সুব্যবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ।

চিত্র ৩২—পতঙ্গের স্নায়ু

পতঙ্গের দেহে কিরকমে স্নায়ুর সূতা ছড়ানো আছে, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। ইহাদের শরীরে
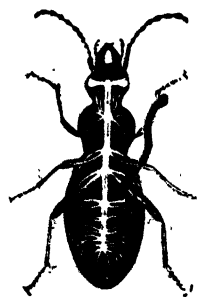
স্নায়ুর পরিমাণ কত অল্প, ছবি দেখিলেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে।

স্ত্রী-পুরুষ ভেদ

পতঙ্গদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ আছে। ইহাদের কতক স্ত্রী এবং কতক পুরুষ হইয়া জন্মে। জোনাক-পোকা-জাতীয় কয়েকটি পতঙ্গের স্ত্রী ও পুরুষের চেহারা সম্পূর্ণ পৃথক। অন্যান্য পোকা-মাকড়ের স্ত্রী ও পুরুষ প্রায়ই ছোট বা বড় হইয়া জন্মে। মৌমাছিদের স্ত্রী খুব বড়। প্রায় সমস্ত পতঙ্গই ডিম পাড়ে এবং তাহা হইতে বাচ্চা হয়। প্রথমেই বাচ্চা প্রসব করে এমন পতঙ্গও আছে; কিন্তু ইহাদের সংখ্যা খুবই অল্প।

যে-রকমে পতঙ্গেরা ডিম প্রসব করে, তাহা বড় মজার। ইহাদের লেজের শেষে ছিদ্রযুক্ত এক রকম ছুঁচের মত অস্ত্র থাকে। পাতার গায়ে, গাছের ছালে বা মাটিতে সেই অস্ত্র দিয়া ইহারা ছোট গর্ত্ত করে এবং পরে অস্ত্রের মুখের সেই ছিদ্র দিয়া গর্ত্তে ডিম পাড়ে। আবার এ-রকম পতঙ্গও অনেক আছে, যাহারা লতাপাতার গায়ে লালার মত জিনিস দিয়া ডিম আট্‌কাইয়া রাখে। ইহারা পাতায় ছিদ্র করে না। ডিম পাড়িবার সময়ে পতঙ্গেরা বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে

অনেক বিবেচনা করে। ডিম হইতে বাহির হইয়াই বাচ্চারা যেখানে অনেক খাবার মুখের গোড়ায় পাইবে, সেই রকম জায়গাতেই উহাদিগকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়। ইহা আশ্চর্য্য নয় কি? তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পতঙ্গদের বুদ্ধি বুঝি মানুষের চেয়েও বেশি। কিন্তু তা নয়,—ভগবান্ তাহাদের মনে এমন একটা সংস্কার করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা কলের মত চলিয়া উপযুক্ত জায়গায় ডিম পাড়ে। আমরা যেমন অনেক চিন্তা এবং অনেক বিচার করিয়া কাজ করি, তাহারা সে-রকম করে না; অন্ধ সংস্কারের তাড়ায় সকল কাজ-কর্ম্ম করে। বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, তাহারা অনেক বুদ্ধি খরচ করিয়া কাজ করিতেছে।

পতঙ্গের আকৃতি-পরিবর্ত্তন

গোরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি বড় জন্তুদিগকে যদি জন্মের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত পরীক্ষা করা যায়, তবে বয়সের সঙ্গে তাহাদের আকৃতির খুব বেশি পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। বাছুর ও বুড়ো গাইয়ের চেহারায় বিশেষ তফাৎ নাই। বাছুর আকারে ছোট এবং বুড়ো গাই আকারে বড়, হয় ত তাহার শিং লম্বা,—ইহাই একমাত্র তফাৎ। মানুষের

অবস্থাও তাই। জন্মিবার সময়ে মানুষের যে দুই হাত, দুই পা, একটা মাথা ইত্যাদি থাকে, বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত ঠিক তাহাই থাকে। কেবল পুরুষদের মুখে দাড়ি গজায় মাত্র। বয়সের সঙ্গে মানুষের দুখানা হাত কখনই চারিখানা হয় না এবং দুটা চোখ কখনই তিনটা চোখ হইয়া দাঁড়ায় না।

আমরা গোরু ও ছাগল-সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিলাম, মাছ পাখী সাপ ব্যাঙ্ সম্বন্ধে কিন্তু সে-কথা বলা চলে না। মাতার দেহ হইতে বাহির হইয়া তাহারা প্রথমে ডিমের ভিতরে থাকে, তার পরে সম্পূর্ণ আকার লইয়া ডিম হইতে বাহির হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, মাছ ও পাখীরা মাতার দেহ ছাড়িয়া দুই রকম অবস্থায় থাকে।

পতঙ্গেরা ডিম হইতে জন্মে তাহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু ডিম হইতে বাহির হইয়াই ইহারা মাছ বা পাখীদের মত সম্পূর্ণ পতঙ্গের চেহারা পায় না। ডিম হইতে বাহির হইলে ইহাদের যে চেহারা হয়, তাহা দুইবার বদ্‌লাইয়া শেষে সম্পূর্ণ পতঙ্গের আকৃতি পায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—বয়স-অনুসারে একই পতঙ্গ তিন রকম চেহারা পায়। শেষ চেহারাটিই পতঙ্গদের সম্পূর্ণ আকৃতি।

বিষয়টা একটু খোলসা করিয়া বলা যাউক। আজ যে প্রজাপতিটিকে বা মাছিটিকে তোমরা সম্মুখে উড়িয়া বেড়াইতে দেখিতেছ—সে ডিম হইতে বাহির হইয়াই প্রজাপতির আকার পায় নাই। ইহার জীবনের ইতিহাস খোঁজ করিলে জানিতে

পারিবে, কয়েক মাস পূর্ব্বে ইহারি মত একটি প্রজাপতি কোনো গাছের পাতায় অনেক ডিম প্রসব করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই ডিমের মধ্যে একটি হইতে তোমার সম্মুখের প্রজাপতিটি জন্মিয়াছে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পাখীরা যেমন ডিম হইতে চোখ মুখ ঠোঁট লইয়া বাহির হয়, প্রজাপতিও বুঝি সেই রকমে চোখ মুখ ডানা লইয়া বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহা নয়। ডিম হইতে প্রজাপতি কখনই প্রজাপতির আকারে বাহির হয় না। বাগানের গাছে, ঘাসে, লতাপাতায় তোমরা নিশ্চয়ই অনেক সময়ে শুঁয়ো-পোকা দেখিয়াছ। ইহাদের কাহারো রঙ্ সাদা, কাহারো রঙ্ পাটকিলে, কেহ সবুজ, কাহারো গায়ে আবার নানা রঙের ডোরা কাটা, কাহারো গা আবার লোমে ঢাকা। ইহাদের অনেকেরই সম্মুখে তিন জোড়ায় ছয়খানা পা এবং পিছনে আরো অনেক পা থাকে এবং সম্মুখের ছয়খানা পায়ে কাহারো কাহারো নখও লাগানো থাকে। নখ দিয়া গাছের পাতা বা কচি ডাল ধরিয়া তাহারা ডালে ডালে
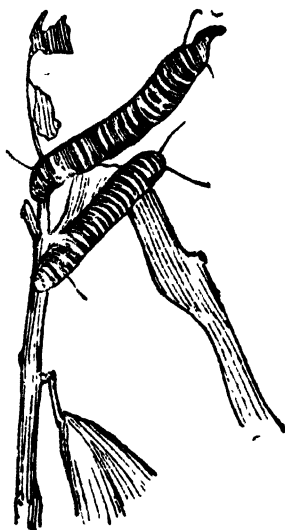
চিত্র ৩৩—ডিম হইতে বাহির হইয়া শুঁয়ো-পোকা গাছের পাতায় বেড়াইতেছে

পাতায় পাতায় চলিয়া বেড়ায়। গাছের কচি পাতা বা মরা ও পচা জীবজন্তুর দেহ ইহাদের খাদ্য। ছোট গাছে শুঁয়ো-পোকা ধরিলে গাছের কি রকম ক্ষতি হয়, তোমরা দেখ নাই কি? তাহারা গাছের কচি পাতা খাইতে আরম্ভ করে, ইহাতে গাছ মরিয়া যায়। পাখীরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া গাছ হইতে শুঁয়ো পোকা বাহির করিয়া খাইয়া ফেলে। কিন্তু সব পোকা পাখীর খাদ্য নয়, যাহাদের গা চুলের মত লোম দিয়া ঢাকা থাকে, তাহাদিগকে পাখীরা খায় না। তা ছাড়া গায়ের রঙ দেখিয়াও কোন্ শুঁয়ো-পোকা খাদ্য এবং কোন্‌টা অখাদ্য, তাহা পাখীরা বুঝিয়া লইতে পারে। যাহা হউক, এই শুঁয়োপোকার দল কোথা হইতে কি-রকমে জন্মে, তোমরা খোঁজ করিয়া দেখিয়াছ কি? এইগুলিই প্রজাপতির এবং অন্য পতঙ্গদের বাচ্চা। ডিম ফুটিলেই এই রকম আকারে পতঙ্গেরা বাহির হয়। গোবরে-পোকা. মশা, মাছি, সকলেই ডিম হইতে বাহির হইয়া এই রকম আকৃতি পায়।

তোমরা যদি একটি শুঁয়ো-পোকা ধরিয়া পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, ইহার গায়ে তেরোটি আংটির মত দাগ কাটা রহিয়াছে। অনেক শুঁয়ো-পোকারই শরীরে এই রকম তেরোটি দাগ থাকে। কাহারো কাহারো আবার মাথায় চোখ থাকে, কিন্তু এই চোখ সাধারণ পতঙ্গের মত হাজার হাজার চোখের সমষ্টি নয়,—ইহা আমাদেরি চোখের মত সাদাসিদে ধরণের। তার পরে, আরো ভালো করিয়া

পরীক্ষা করিলে ইহাদের মুখে দাঁতের মত অংশ দেখিতে পাইবে,—ইহা খাবার সংগ্রহের সাহায্য করে, আবার গাছের পাতা কামড়াইয়া চলাফেরারও সুবিধা করাইয়া দেয়।

প্রজাপতি বা অপর পতঙ্গের বাচ্চা শুঁয়ো-পোকার আকারে কতদিন থাকে, তোমরা বোধ হয় ইহাই এখন জানিতে চাহিতেছ। কিন্তু ইহার উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। তোমাদের ফুলের বাগানে কত রঙ্‌বেরঙের প্রজাপতি এবং আরো কত পতঙ্গ উড়িয়া বেড়ায় দেখ নাই কি? ইহাদের প্রত্যেকেই ভিন্ন জাতীয় পতঙ্গ। জাতি-অনুসারে ইহাদের বাচ্চারা শুঁয়ো-পোকার আকারে কেহ বিশ দিন. কেহ অল্প দিন থাকে। কোনো কোনো পতঙ্গকে এক বৎসর, দুই বৎসর, এমন কি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শুঁয়ো-পোকার আকারে থাকিতে দেখা গিয়াছে। আমেরিকায় এক রকম পতঙ্গ আছে, যাহারা সতেরো বৎসর এই আকারে থাকে। আবার এক রকম পতঙ্গও আছে, যাহাদের বাচ্চারা শুঁয়ো-পোকার আকারে পাঁচ-ছয় দিন বা তাহা অপেক্ষাও অল্প দিন থাকে। কাজেই এ-সম্বন্ধে ঠিক কথা বলা যায় না।

পাখীরা তাহাদের বাসায় ডিম পাড়ে, ডিমের উপরে বসিয়া তা দেয়, তার পরে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। ইহার পরেও পাখীরা বাচ্চাদের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে। যতদিন উড়িতে না শিখে, ততদিন পাখীরা নানা জায়গা হইতে পোকা-মাকড় ধরিয়া আনিয়া ছানাদের খাওয়ায়।

পতঙ্গেরা কিন্তু বাচ্চাদের মোটেই যত্ন করে না। যেখানে বাচ্চাদের খাবার আছে, এমন জায়গায় ডিম পাড়িয়াই তাহারা খালাস। ইহার পরে পতঙ্গের সঙ্গে বাচ্চাদের কোনো সম্পর্কই থাকে না। জন্মে আর একটিবার দেখা-শুনাও হয় না; অনেক পতঙ্গ ডিম পাড়িয়াই মারা যায়।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মায়ের আদর না পাইয়া পতঙ্গের বাচ্চাদের বুঝি খুবই কষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হয় না। ডিম হইতে শুঁয়ো-পোকার আকারে বাহির হইয়াই সম্মুখের লতাপাতায় তাহারা অনেক খাদ্য পায় এবং একটু বিশ্রাম না করিয়াই সেই সকল খাবার অবিরাম খাইতে থাকে। কাহারো কাহারো মাথার উপরে চোখ থাকে, কিন্তু তাহা বেশি কাজে লাগে না। অন্ধ লোকেরা যেমন হাত-পা দিয়া কাছের জিনিস ছুঁইতে ছুঁইতে রাস্তা ঠিক করে, ইহারাও তেমনি শরীরের স্পর্শ দিয়া নিজের খাদ্য ও খাদ্যের কাছে যাইবার রাস্তা বাহির করে।

পেটুক লোক যখন ভোজ খাইতে বসে, তখন সে কি রকমে গ্রাসে গ্রাসে খাদ্য মুখে দেয়, তোমরা দেখ নাই কি? তখন তাহারা নিশ্বাস লইবার জন্য মাঝে মাঝে থামে, আবার রাক্ষসের মত খাইতে আরম্ভ করে। পেটে যতক্ষণ একটুও জায়গা থাকে, ততক্ষণ খাওয়া বন্ধ করে না। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দেয় না,—মুখ খাবারে পূর্ণ—জবাব দিবে কি করিয়া? শুঁয়ো-পোকারা পেটুক লোকের মত একান্ত মনে

আহার করে। দিবারাত্রি খাওয়া চলে, নিশ্বাস লইবার জন্যও খাওয়া ছাড়ে না। ইহাদের দেহের যে সরু নলের কথা আগে বলিয়াছি, তাহার ভিতর দিয়া আপনা হইতেই বাতাস যাওয়া-আসা করিয়া নিশ্বাসের কাজ চালায়।

প্রয়োজন মত খাদ্য হজম করিতে পারিলে, প্রাণীর দেহ পুষ্ট হয়। শুঁয়ো-পোকারা যেমন খায় তেমনি হজম করে। কাজেই শীঘ্র শীঘ্র তাহারা আকারে বড় হইয়া উঠে। চিংড়িমাছেরা যখন আকারে বাড়িতে থাকে, তখন তাহারা কি করে আগেই শুনিয়াছ। তাহারা গায়ের সেই কঠিন খোলা বদ্‌লাইয়া ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট খোলার জায়গায় গায়ে বড় খোলা আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়। খাইয়া মোটা হইলে পতঙ্গদের বাচ্চা অর্থাৎ শুঁয়ো-পোকারাও তাহাই করে, তখন তাহাদের গায়ের চামড়া ফাটিয়া খসিয়া পড়ে এবং পুরানো চামড়ার জায়গায় নূতন চামড়া জন্মে। চামড়া বদ্‌লাইবার কয়েক দিন আগে এবং পরে উহাদিগকে একটু অসুস্থ হইতে দেখা যায়। তখন তাহারা ভালো করিয়া খায় না, কয়েক দিন চুপ-চাপ কাটাইয়া দেয়। শুঁয়ো-পোকারা এই রকমে তিন চারিবার খোলস্ ছাড়ে; কোনো কোনো পোকা সাত-আটবার পর্য্যন্তও চামড়া বদ্‌লায়।

ক্রমাগত আহার করিয়া গায়ের চামড়া বদ্‌লাইতে বদ্‌লাইতে শুঁয়ো-পোকারা যখন খুব বড় হয়, তখন তাহাদের আর এক পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হয়। এই সময়ে শুঁয়ো-

পোকারা খাওয়া বন্ধ করিয়া খুব চঞ্চল হইয়া চলা-ফেরা করে এবং শেষে একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজিয়া সেখানে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। এই সময়ে ইহাদের গায়ের চামড়া শুকাইয়া উঠে এবং তাহা কৌটার মত হইয়া পোকাকে ভিতরে রাখিয়া দেয়। আবার কয়েক জাতীয় পোকার মুখ
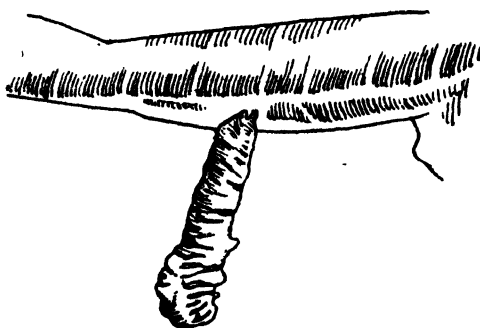
চিত্র ৬৫—পতঙ্গের পুত্তলি-অবস্থা

হইতে ঐ-সময়ে আঠার মত লালা বাহির হয় এবং তাহা শুকাইলে রেশমী সূতা হইয়া দাঁড়ায়। ঐ পোকারা ঐ-সকল সূতা দিয়া গুটি বাঁধিয়া তাহার ভিতরে নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করে।

তোমরা যে রেশমী কাপড় ব্যবহার কর, তাহা এই রকম এক শুঁয়ো-পোকার গুটির সূতা দিয়া প্রস্তুত। আমরা যেমন গোরু ছাগল ইত্যাদি পালন করি, যাহারা রেশমের ব্যবসায় করে, তাহারাও সেই রকমে রেশমের প্রজাপতি পালন

করে। প্রজাপতিরা ডিম পাড়ে এবং পরে সেই ডিম হইতে শুঁয়ো-পোকা বাহির হয়। ব্যবসায়ীরা খুব যত্নে তাহাদিগকে কচি পাতা খাওয়ায়। তার পরে সময় উপস্থিত হইলে, সেই পোকাগুলিরই প্রত্যেকে মুখ হইতে রেশমী সূতা বাহির করিয়া এক-একটি গুটি বাঁধে। রেশমের ব্যবসায়ীরা এই সকল গুটির সূতা সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। রেশমের কাপড় শুঁয়ো-পোকার এই রকম সূতা দিয়াই প্রস্তুত হয়।

তাই বলিয়া সকল পতঙ্গ বা সকল প্রজাপতির বাচ্চারা যে রেশমী গুটি বাঁধে, তাহা নয়। গোবরে-পোকার বাচ্চারা রেশমী গুটি বাঁধে না। তোমরা পথে-ঘাটে সর্ব্বদা যে-সব প্রজাপতি ও মাছিকে উড়িয়া বেড়াইতে দেখিতে পাও, তাহারাও রেশমী গুটি বাঁধে না। অনেক শুঁয়ো-পোকা শেষবারে গায়ের যে চামড়া বদ্‌লায়, তাহা গা হইতে ফেলিয়া দেয় না। পরে সেই আল্‌গা চামড়াতে তাহারা মুখের লালা মিশাইয়া শক্ত গুটি প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে বাস করে। কোনো কোনো পতঙ্গের শুঁয়ো-পোকারা শুক্‌নো পাতায় মুখের লালা মিশাইয়া গুটির মত ঘর প্রস্তুত করে। যাহা হউক, প্রজাপতি বা অন্য পতঙ্গের শুঁয়ো-পোকারা যখন গুটির মধ্যে চুপ-চাপ থাকে, তখন ইহাদের দেহের আর একটা পরিবর্ত্তন হয়। এই অবস্থাকে পুত্তলি-অবস্থা বলে। তখন তাহারা মড়ার মত হইয়া এমন ভাবে গুটির মধ্যে থাকে যে, দেখিলে কষ্ট হয়। গুটি ছিঁড়িয়া গায়ে হাত

দিলে বা শরীরে আঘাত করিলে তাঁহাদের সাড়া পাওয়া যায় না। তখন তাহাদের দেহের রক্তের চলাচল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত অনেক কমিয়া আসে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ পতঙ্গেরা পুত্তলির অবস্থায় দুই চারিদিন থাকিয়াই বুঝি গুটি কাটিয়া বাহির হয়। কিন্তু তাহা হয় না। কোনো কোনো পতঙ্গের শুঁয়ো-পোকারা প্রায় নয় দশ মাস পর্য্যন্ত এই রকমে মড়ার মত পড়িয়া থাকে। আবার কোনো পতঙ্গ শীঘ্রই পুত্তলি-অবস্থা ত্যাগ করে। পিঁপড়ে ও মৌমাছিরা আট দশ দিনের বেশি এই অবস্থায় থাকে না।

এক দিন কিছু না খাইলে মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তিন-চারি দিন কিছু না খাইলে মানুষের বাঁচিয়া থাকা দায় হয়। কিন্তু পতঙ্গের পুত্তলিরা আট-দশ মাস কিছু না খাইয়া কি রকমে বাঁচে, তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না।

একটা উদাহরণ দিলে এই কথাটা তোমরা বুঝিতে পারিবে। মনে কর, আমরা আগুন জ্বালাইতে যাইতেছি। কাঠ খড় তেল কয়লা জোগাড় করিয়া তাহাতে আগুন দিলাম। আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিল, এবং কাঠ খড় পুড়িয়া গেলে তাহা নিবিয়া গেল। প্রাণীর জীবন এই আগুনেরই মত নয় কি? আগুন জ্বালাইতে গেলে যেমন কাঠ বা খড়ের প্রয়োজন, তেমনি জীবনের কাজ চালাইতে গেলে খাবারের প্রয়োজন। এই খাবার শরীরে গিয়া যে শক্তির উৎপত্তি করে, তাহারি জোরে আমরা হাঁটিয়া

বেড়াই, কাজকর্ম্ম করি ও শরীরকে পুষ্ট করি। কাজেই, যদি আহার বন্ধ করা যায়, তবে কাঠের অভাবে যেমন আগুন নিভিয়া যায়, সেই রকম অনাহারে আমাদের মৃত্যু ঘটে। শুঁয়ো-পোকারা পুত্তলি হইয়া চলাফেরা একবারে বন্ধ করে, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস পর্য্যন্ত রোধ করিয়া ফেলে। কাজেই জীবন-ধারণের জন্য তাহা-দের অতি অল্প শক্তিরই প্রয়োজন হয়। এই জন্যই
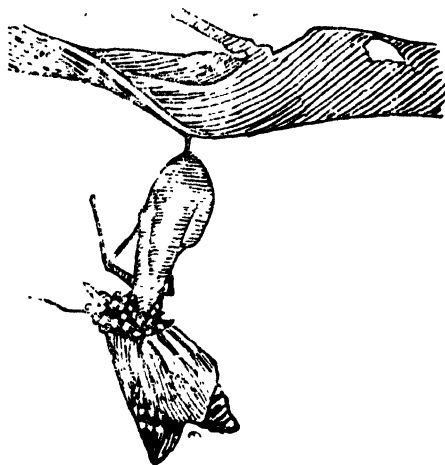
চিত্র ৩৫—শুঁয়ো-পোকা গুটি কাটিয়া বাহির হইয়াছে

পতঙ্গেরা পুত্তলি-অবস্থায় অনাহারে অনেক দিন কাটাইতে পারে।

খুব ভালো খাবার খাইয়া শরীর মোটা করিলে দেহের ভিতরে মাংস চর্ব্বি প্রভৃতি অনেক সারবান্ জিনিস জমা হয়। যখন বাহির হইতে খাবার পাওয়া যায় না, মোটা প্রাণীরা তখন নিজেদের দেহের সেই মাংস ও চর্ব্বি খরচ করিয়া অনেক দিন অনাহারে বাঁচিতে পারে। শুঁয়ো-পোকারা দিবারাত্রি আহার করিয়া কি-রকম মোটা হয়, তাহা আগে

বলিয়াছি। কাজেই শরীরে যে মাংস ও চর্ব্বি জমা থাকে, তাহাও পুত্তলিদিগকে অনেক দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারে।

পুত্তলি অবস্থায় মড়ার মত গুটির মধ্যে পড়িয়া থাকিলেও এই সময়ে শুঁয়ো-পোকাদের দেহে একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন হয়। আমরা কাদা দিয়া পুতুল গড়িয়া, পরে তাহা ভাঙিয়া যেমন আর একটি নূতন পুতুল গড়িয়া থাকি,—বিধাতা ঐ-সময়ে গুটির মধ্যের শুঁয়ো-পোকাগুলিকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সেই রকমে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পতঙ্গের আকারে পরিণত করেন। শুঁয়ো-পোকার ডানা থাকে না, অনেকের মনে থাকে না, এবং সেই বড় বড় চোখও থাকে না। গুটির মধ্যে উহারা যখন অজ্ঞাতবাস করে, তখনই তাহাদের মাথা, পা, ডানা, চোখ প্রভৃতি সকল অঙ্গেরই সৃষ্টি হয় এবং শেষে এক দিন সেই শুঁয়ো-পোকাই
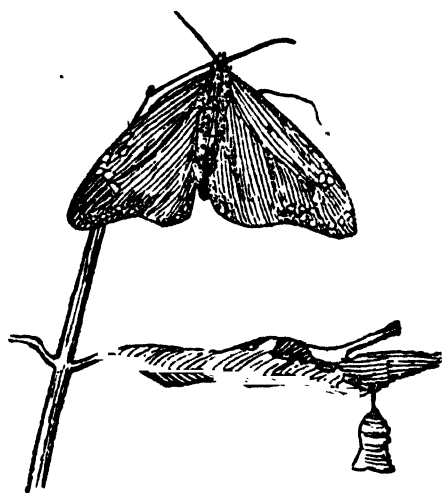
চিত্র ৩৬—প্রজাপতি ডানা মেলিয়া উড়িবার উপক্রম করিতেছে

সুন্দর প্রজাপতি বা সম্পূর্ণ পোকার আকার পাইয়া গুটি কাটিয়া বাহির হয়। ইহাই পতঙ্গদের জীবনের তৃতীয় অবস্থা।

আমরা ক্রমে ক্রমে পতঙ্গদের চারিখানি ছবি দিয়াছি। এইগুলি দেখিলে পতঙ্গদের তিন অবস্থার কথা তোমরা ভালো করিয়া বুঝিবে।

ডিম হইতে বাহির হইয়া শুঁয়ো-পোকা কি-রকমে গাছের পাতায় বেড়াইতেছে, তাহা প্রথম ছবিতে আঁকা আছে। দ্বিতীয় চিত্রটি তাহারি পুত্তলি-অবস্থার ছবি। গায়ের চামড়ায় লালা মিশাইয়া শুঁয়ো-পোকাটি কেমন গুটি পাকাইয়াছে এবং গুটির মধ্যে কেমন মড়ার মত পড়িয়া আছে, এই ছবিতে তাহা আঁকা হইয়াছে। তৃতীয় ছবিখানি সেই পোকারই গুটি কাটিয়া বাহির হওয়ার চিত্র। সম্পূর্ণ প্রজাপতির আকার পাইয়া সেই শুঁয়ো-পোকাই গুটি হইতে বাহির হইয়াছে, কিন্তু এখনো ডানা মেলিয়া উড়িতে পারিতেছে না। সেই প্রজাপতিই কি-রকমে ডানা মেলিয়া উড়িবার উপক্রম করিতেছে, তাহা চতুর্থ চিত্রে আঁকা রহিয়াছে।

এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ—পতঙ্গেরা মায়ের দেহ হইতে সম্পূর্ণ পতঙ্গের আকারে বাহির হয় না। প্রথমে তাহারা ডিম হইতে শুঁয়ো-পোকার আকারে বাহির হয়। তার পরে উহারা মড়ার মত গুটির মধ্যে বাস করে এবং শেষে তাহারা গুটি কাটিয়া সম্পূর্ণ পতঙ্গের আকারে বাহির হইয়া পড়ে। ইহাই পতঙ্গদের জীবনের তিন অবস্থা।

ঝিল্লীপক্ষ পতঙ্গ

(HYMENOPTERA)

বোল্‌তা

তোমরা নিশ্চয়ই বোল্‌তা দেখিয়াছ। বোল্‌তা হল্‌দে রঙের পোকা ; খুব পাত্‌লা চারিখানা ডানা লইয়া খাবারের দোকানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়ায়। পাখীরা যেমন ডানা গুটাইয়া ডালে বসে, ইহারা প্রায়ই সে-রকমে ডানা গুটাইয়া কোনো জায়গায় বসে না। যখন স্থির হইয়া দাঁড়ায়, তখন ডানা কয়েকখানিকে শরীরের উপরে উঁচু করিয়া রাখে। বোল্‌তার দল বাগানের গাছের ডালে, কখনো তোমাদের ঘরের কড়ি-কাঠে, কখনো দরজা বা জানালার মাথায় চাক্ বাঁধে। ইহা তোমরা দেখ নাই কি? চাকের বোল্‌তারা কিন্তু ডানা গুটাইয়া চাকে চলা-ফেরা করে।

বোল্‌তার লেজের শেষে হুল থাকে। তাই কাছে আসিলেই লোকে হুলের ভয়ে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়;

আমাদের দেশে সর্ব্বদা যে হল্‌দে রঙের বোল্‌তা দেখা যায়, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। ছবিতে বোল্‌তার মাথা, বুক ও লেজ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ইহাদের বুক ও লেজের মধ্যের অংশটা খুব সরু। ছয়খানা পা ও মাথায় দুটা শুঁয়ো আছে এবং দুটি বড় বড় চোখও আছে। এই চোখ প্রজাপতিদেরই চোখের মত। এক-একটি চোখ হাজার হাজার ছোট ছোট চোখ মিলিয়া প্রস্তুত। তা ছাড়া আরো তিনটি ছোট চোখ ইহাদের মাথার উপরে লাগানো থাকে। একটু ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলে খালি চোখেই তোমরা ঐ তিনটি চোখ বোল্‌তার মাথার উপরে দেখিতে পাইবে। বোল্‌তার দেহের ভিতরে প্রজাপতিদের মতই সরু নল লাগানো থাকে, তাহা দিয়া ইহারা নিশ্বাস টানে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আমাদের বুক যেমন উঠা-নামা করে বোল্‌তার লেজ সেই রকম তালে তালে উঠা-নামা করে। বাতাস টানিবার ছিদ্র ইহাদের লেজের আংটির গোড়ায় সাজানো থাকে। তাই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে লেজ উঠা-নামা করে।

চিত্র ৬৭—বোল্‌তা

তোমরা বোল্‌তার পা যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র বা আতসী

কাচ দিয়া পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে, পায়ে চিরুণীর মত কতকগুলি দাঁত লাগানো রহিয়াছে। মাথায় ধূলা-বালি লাগিলে আমরা যেমন চিরুণী দিয়া মাথা পরিষ্কার করি, মুখের শুঁয়ো দুটিতে কিছু লাগিলে বোল্‌তারা পায়ের ঐ চিরুণী দিয়া শুঁয়ো সাফ্‌ করে।

বোল্‌তার চাক্‌ তোমরা অনেক দেখিয়াছ। ইহার প্রত্যেক ছিদ্রটি ছয়কোণা এবং ঠিক গায়ে-গায়ে লাগানো। ইহাতে জায়গার একটুও অপব্যয় হয় না। প্রত্যেক ছিদ্রের দেওয়ালগুলি পাশের ছিদ্রগুলির দেওয়ালের কাজ করে। যদি ছিদ্রগুলি গোলাকার থাকিত, তাহা হইলে সেগুলির দেওয়ালকে কখনই গায়ে-গায়ে লাগানো যাইত না।

পৌষ-মাঘ মাসের শীতে আমাদের দেশে বোল্‌তা প্রায়ই দেখা যায় না। এই দুইটি মাস বোল্‌তাদের দুই-চারিটি, দেওয়ালের ফাটালে বা অন্য কোনো নির্জ্জন জায়গায় মড়ার মত পড়িয়া থাকে। তার পরে ফাগুনের হাওয়া গায়ে লাগিলেই তাহারা বাহির হইয়া চাক্‌ তৈয়ারির জোগাড় দেখে।

তোমরা যদি ভালো করিয়া নজর রাখ তবে দেখিবে, বোল্‌তারা যখন কোনো জায়গায় প্রথম চাক্‌ বাঁধিতে সুরু করে, তখন সেখানে অনেক বোল্‌তা থাকে না। একটি বা দুইটি চারিদিকে ঘুরিয়া মনের মত জায়গা ঠিক করে এবং সেখানে ঐ একটি বা দুইটিতে মিলিয়াই চাক্‌ বাঁধা সুরু করিয়া দেয়। ইহারা স্ত্রী-বোল্‌তা ;—পেটের ভিতরে অনেক

ডিম বোঝাই রাখিয়া ইহারা চাকের পত্তন করে। চাকে দুই তিনটি ছিদ্র তৈয়ারি হইলেই তাহারা ছিদ্রে এক একটা ডিম পাড়িতে থাকে। ডিমগুলি একটু লম্বা ধরণের এবং সাদা। চাকের উপর দিক্‌টা সকল সময়েই মাটির দিকে মুখ করিয়া ঝুলিতে থাকে। ইহাতে বৃষ্টির জল বা রৌদ্রের তাপ কখনই চাকের ছিদ্রে পড়ে না; ডিমগুলি বেশ ভালো অবস্থাতেই থাকে। তার পরে চাক্ যে ছিঁড়িয়া পড়িবে, তাহারো ভয় থাকে না। মোটা তারের মত এক রকম বোঁটা তৈয়ার করিয়া বোল্‌তারা তাহা গাছের ডালে বা দরজা-জানালায় লাগায় এবং পরে এই বোঁটার গায়ে ঝুলাইয়া চাক্ বাঁধে। তোমরা যদি বোল্‌তার চাক্ কাছে পাও, তাহা হইলে দেখিয়ো, চাকের বোঁটা কত শক্ত। চাকের ভার যদি দশ পনেরো সের হয়, তবুও সেই বোঁটা ছিঁড়িয়া চাক্ মাটিতে পড়ে না।

বোল্‌তারা কি জিনিস দিয়া চাক্ বাঁধে, তোমরা বোধ হয় এখন তাহাই জানিতে চাহিতেছ। কাগজ কি জিনিস দিয়া তৈয়ার হয়, তোমরা তাহা জান না কি? কয়েক রকম কাঠ ও ঘাস কলে পিষিয়া প্রথমে মাড়ের মত করা হয়। পরে তাহাই জমাট করিলে কাগজ হইয়া পড়ে। বোল্‌তারা কাগজের মতই এক রকম জিনিস দিয়া চাক্ প্রস্তুত করে। তাহাদের দাঁত বড় ধারালো,—ঠিক যেন করাত। গাছের শুক্‌নো ডাল-পালা তাহারা সেই করাতের মত দাঁত দিয়া গুঁড়া করে; তার পরে মুখের লালা মিশাইয়া তাহা কাদার মত

করে এবং শেষে তাহা দিয়া চাক্ বাঁধে। তোমরা যদি চাকের খানিকটা ছিঁড়িয়া দেখ, তাহা হইলে জিনিসটাকে ঠিক্ আমাদের বাজারের বাদামী রঙের মোটা কাগজ বলিয়া মনে করিবে। কাগজ জলে ভিজিলে গলিয়া যায়। কিন্তু বোল্‌তার মুখের লালার এমনি গুণ যে, তাহা দিয়া যে কাগজের মত জিনিস প্রস্তুত হয় তাহা জলে ভিজিলে গলিয়া যায় না। শুনা যায়, চীন-দেশের লোকেরা নাকি হাজার হাজার বৎসর আগে কাগজ তৈয়ারির কৌশল বাহির করিয়াছিল। কিন্তু চীনেদের আগেও বোল্‌তারা কাগজ তৈয়ারি করিয়া চাক্ বাঁধিয়া আসিতেছে। কথাটা আশ্চর্য্য নয় কি?

যাহা হউক, বোল্‌তারা চাকের মধ্যে যে ছোট ডিম পাড়ে, তাহা হইতে বাচ্চা বাহির হইতে আট দশ দিন কাটিয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে তাহারা চাকে অনেক নূতন ঘর জুড়িয়া এবং ঘরের ছিদ্রগুলিকে গভীর করিয়া চাক্‌খানিকে বেশ বড় করে। কিন্তু তখনো চাকে দুই তিনটি বোল্‌তাই দেখা যায়। এই সময়ে বোল্‌তাদের হাতে অনেক কাজ থাকে। চাক্ তৈয়ারি ও বাচ্চাদের আদর-যত্ন ইত্যাদি সকলি তাহাদিগকে করিতে হয়। অন্য পতঙ্গের ডিম হইতে শুঁয়ো-পোকার মত বাচ্চা বাহির হইলে, বাচ্চারা কচি পাতায় ও ডালে বেড়াইয়া নিজেদের খাবার নিজেরাই জোগাড় করিয়া লয়। কিন্তু বোল্‌তার বাচ্চারা তাহা পারে না। সাধারণ শুঁয়ো-পোকাদের

মত ইহাদের পা থাকে না; কাজেই চাকের ছিদ্র হইতে তাহারা বাহির হইতে পারে না। পাখীরা যেমন মুখে করিয়া খাবার আনিয়া বাচ্চাদের পেট ভরায়, বোল্‌তারা ঠিক সেই রকমে বাচ্চাদিগকে খাবার দেয়। অন্য পতঙ্গের বাচ্চা, ফড়িং, ছোট গোবরে-পোকা বোল্‌তাদের প্রধান খাদ্য। তা ছাড়া মিষ্ট জিনিসও ইহারা বেশ ভালবাসে। দোকানের যেখানে চিনি-বোঝাই বস্তা থাকে, সেখানে সমস্ত দিনই বোল্‌তারা ভন্‌-ভন্‌ করিয়া ঘুরে এবং চিনি চাটিয়া খায়। তা ছাড়া পাকা ও মিষ্ট ফলের রসও ইহারা খাইতে ভালবাসে। বোল্‌তার জিভ্‌ আছে, কিন্তু তাহা আমাদের জিভের মত নয়। মুখের উপর ও নীচের ওষ্ঠের কতকগুলি শুঁয়ো একত্র হইয়া জিহ্বার কাজ চালায়। ইহা দিয়াই তাহারা তরল জিনিস চাটিয়া খায়।

ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে মা যাহা ইচ্ছা খাইতে দেন না। যাহা খাইতে ভালো এবং সহজে হজম হয়, সেই সকল খাদ্য দিয়া মা শিশুদের পালন করেন। বোল্‌তার মা, বাচ্চাদের পালন করিবার সময়ে ঠিক্‌ তাহাই করে। খুব ভালো ভালো নরম পোকা-মাকড় নিজের দাঁত দিয়া চিবাইয়া সে বাচ্চাদের মুখের কাছে ধরে এবং তাহা খাইয়া বাচ্চারা বড় হয়।

এই রকমে পনেরো কুড়ি দিন আহার করিয়া বোল্‌তার বাচ্চারা পুত্তলির অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়। তখন ইহারা

চাকের ছিদ্রের তলায় নামিয়া যায় এবং মুখ হইতে এক রকম লালা বাহির করিয়া ছিদ্রের মুখ ঢাকিয়া ফেলে। বোল্‌তার চাক্ পরীক্ষা করিলে তোমরা তাহার কতকগুলি ছিদ্রকে এই রকমে ঢাকা দেখিতে পাইবে; ইহাদের সবগুলিই পুত্তলি-বোঝাই থাকে। পুত্তলি-অবস্থায় বাচ্চাদের খাওয়ার দরকার হয় না, তখন তাহারা একটু নিরিবিলি থাকিয়া শরীরটাকে বদ্‌লাইয়া সম্পূর্ণ পতঙ্গের আকারে আনিতে চায়। কাজেই, ছিদ্রের মুখ বন্ধ রাখিয়া ইহারা বেশ ভালোই থাকে।

যাহা হউক, ঐরকমে প্রায় আট দশ দিন বন্ধ থাকিলে সেই শুয়ো-পোকার আকারের বাচ্চাদের ডানা গজায়, চোখ ফোটে, পা বাহির হয় এবং গায়ের রঙ্ বদ্‌লায়। যাহা আগে মুড়ির মত পোকা ছিল, তাহা এই সময়ে বোল্‌তার আকার পাইয়া যায়। এই রকমে চেহারা বদ্‌লাইলে
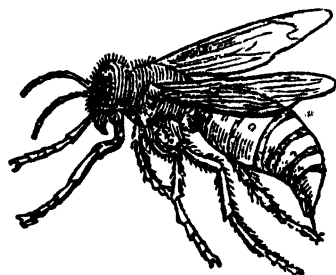
চিত্র ৩৮—পুত্তলি হইতে বোল্‌তার আকার ধারণ

বাচ্চারা আর বন্ধ ঘরে থাকিতে চায় না, তখন ঢাকনি কাটিয়া তাহারা বাহিরে আসে এবং দুই চারিবার ডানা ঝাড়া দিয়া একটু-আধটু উড়িতে আরম্ভ করে। ইহার পরে তাহারা আর কাহারো উপরে নির্ভর করে না, চাকের অপর বোল্‌তাদের মত কাজে লাগিয়া যায়। বোল্‌তার চাকের ছিদ্র কখনই

শূন্য থাকে না। বাচ্চারা বড় হইয়া বাহির হইলেই, বোল্‌তারা শূন্য ছিদ্রে নূতন ডিম পাড়ে। অনেক প্রাণীর আকার জন্ম-কালে ছোট থাকে, এবং বয়সের সঙ্গে একটু একটু বাড়িয়া শেষে তাহা বড় হইয়া পড়ে। বোল্‌তাদের পাখা উঠিবার সময়ে যে আকার থাকে, বয়সের সঙ্গে তাহা কখনই বাড়ে না। এই সময়কার আকারই উহাদের সম্পূর্ণ আকার।

আমরা সচরাচর যে-সব প্রাণী দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কতক স্ত্রী এবং কতক পুরুষ হইয়া জন্মে। কিন্তু কতকগুলি পতঙ্গের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ ছাড়া আর এক জাতি দেখা যায়। ইহারা কর্ম্মী অর্থাৎ কুলি-মজুর বা দাসীর দল। দিবারাত্রি খাটিয়া ঘর তৈয়ারি করা, ঘরে পাহারা দেওয়া ও বাচ্চাদের আদর-যত্ন করাই ইহাদের কাজ। ইহাদের বাচ্চা হয় না, অথচ তাহাদিগকে পুরুষও বলা যায় না। বোল্‌তা-দের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ ও কর্ম্মী এই তিন জাতিই আছে। যে হুলের ভয়ে আমরা চাকের কাছে যাই না, তাহা কেবল স্ত্রী ও কর্ম্মী বোল্‌তাদেরই লেজে লাগানো থাকে। পুরুষ বোল্‌তারা বড় নিরীহ প্রাণী। তাহাদের পিছনে হুল নাই; গায়ে ছাড়িয়া দিলে বা হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিলে একটুও হুল ফুটায় না। কিন্তু ইহাদের মত অকর্ম্মা প্রাণী বোধ হয় পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহারা চাক্ তৈয়ারি বা বাচ্চাদের যত্ন করার কাজে একটুও সাহায্য করে না। কেবল দরোয়ানের মত বসিয়া বসিয়া চাকে পাহারা দেওয়া

ও যে-সব বাচ্চা চাকে মারা যায়, তাহাদিগকে ফেলিয়া দেওয়াই ইহাদের কাজ।

যাহা হউক, নূতন চাকে বোল্‌তাদের যে-সকল বাচ্চা হয়, তাহাদের মধ্যে স্ত্রী বা অকর্ম্মা পুরুষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সকলেই বড় বড় হুলওয়ালা কর্ম্মী হইয়া জন্মে এবং তাড়াতাড়ি চাক্‌গুলিকে বড় করিয়া তুলে। পুরানো স্ত্রী-বোল্‌তারা তখন ডিম-পাড়ার কাজেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। এই রকমে এক একটা চাকে কখনো কখনো তিন চারি শত বোল্‌তা একত্র বাস করে। ইহাদের সকলেই নিজেদের কাজ করিয়া যায়; পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি করে না।

সাত-আট মাস এই রকমে চাকের কাজ চলিলে যখন শীতকাল আসে, তখন বোল্‌তাদের দল-ভাঙার সময় উপস্থিত হয়। এই সময়ে চাকে আর কর্ম্মী বোল্‌তা জন্মে না; ডিম হইতে কেবল স্ত্রী ও পুরুষ বোল্‌তা বাহির হইতে আরম্ভ করে। ইহারা বড় হইয়া আর চাকের দিকে তাকায় না। স্ত্রী ও পুরুষেরা দলে দলে চাক্‌ ছাড়িয়া দূরে উড়িয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে এবং কয়েক দিনের মধ্যে পুরুষেরা মরিয়া যায়। স্ত্রীদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহারা পেট-ভরা ডিম লইয়া দেওয়ালের ফাটালে বা চালের বাতায় লুকাইয়া শীত কাটায়। এদিকে চাক্‌ প্রায় খালি হইতে আরম্ভ করে; কারণ কর্ম্মী বোল্‌তা আর চাকে জন্মে না। পুরানো কর্ম্মী

বোল্‌তারা আর চুপ করিয়া চাকে বসিয়া থাকিতে পারে না। তখন তাহাদের বড়-আদরের বাচ্চাগুলিকে মুখে করিয়া চাক্ ছাড়িয়া যে-দিকে ইচ্ছা বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা কোনো জায়গাতেই আশ্রয় পায় না। শেষে ইহাদের সকলেই কেহ জলে ডুবিয়া, কেহ শীতে থাকিয়া, কেহ আগুনে ঝাঁপাইয়া মারা যায়। এত যত্নের চাক্‌খানা এই রকমে খালি হইয়া পড়ে। তোমরা খোঁজ করিলে এই রকম খালি বোলতার চাক্ অনেক জায়গায় দেখিতে পাইবে।

শীত চলিয়া গেলে বোল্‌তারা প্রায়ই পুরানো চাকে বাস করে না। যে দু-দশটা স্ত্রী বোল্‌তা এদিকে ওদিকে লুকাইয়া শীত কাটায়, তাহারা গরম পড়িলেই গা ঝাড়া দিয়া বাহির হয় এবং মনের মত ভালো জায়গায় নূতন চাক্ তৈয়ার করিয়া সেখানে ডিম পাড়িতে সুরু করে।

ভীমরুল

তোমরা ভীমরুল নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহারা বড় বোল্‌তার মত পতঙ্গ। কেবল রঙ্‌টা গাঢ় বাদামী ধরণের এবং লেজের দিকে হল্‌দে রঙের মোটা ডোরা দেওয়া থাকে। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রায় বোল্‌তাদেরি মত। কিন্তু বোল্‌তার
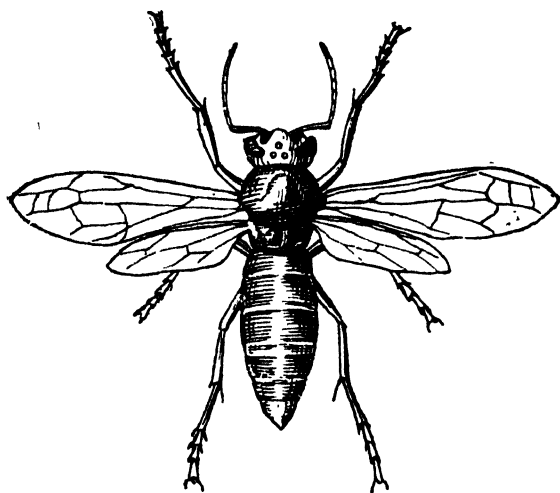
চিত্র ৩৯—ভীমরুল

চেয়ে ইহারা বেশি রাগী। অনেক সময়ে মিছামিছি রাগ করিয়া মানুষ ও পশুদের তাড়া করে ও গায়ে হুল ফুটাইয়া দেয়। ভীমরুলের হুলে ভয়ানক বিষ। দশ বারোটা ভীমরুলে কামড়াইলে মানুষ মরিয়া যায়।

বোল্‌তাদেরি মত ভীমরুলেরা চাক্ করে। কিন্তু বোল্‌তা যেমন খোলা জায়গায় চাক্ বাঁধে, ইহারা প্রায়ই

তাহা করে না। ইহাদের চাক্ ফুটবলের মত গোল আবরণের মধ্যে থাকে। আবরণের গায়ে ছিদ্র থাকে। ভীমরুলেরা সেই পথ দিয়া ভিতরে যাওয়া-আসা করে। কাজেই, বোল্‌তার চাক্ তোমরা যেমন সর্ব্বদাই দেখিতে পাও, ভীমরুলের চাক্ সে-রকমে দেখিতে পাইবে না। হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, চাকের আবরণটি বুঝি কাদা দিয়া গড়া,—কিন্তু তাহা নয়। ভীলরুলেরা দাঁত দিয়া কাঠ গুঁড়া করে এবং পরে তাহার সঙ্গে মুখের লালা মিশাইলে যে কাদার মত জিনিস হয়, তাহা দিয়া আবরণটা প্রস্তুত করে। এই জন্যই চাকের আবরণ পেষ্ট্-বোর্ডের মোটা কাগজের মত শক্ত হয়।

ভীমরুলেরা ঠিক বোল্‌তাদেরি মত বাচ্চাদের যত্ন লয়। কিন্তু ইহাদের চাক্ আবরণের মধ্যে থাকে-থাকে সাজানো দেখা যায়। ভীমরুল ছোট পোকা-মাকড়ের পরম শত্রু। এই সকল পোকাই উহাদের প্রধান খাদ্য। বোল্‌তারা ভীমরুলকে বড়ই ভয় করে। বোল্‌তার চাকের সন্ধান পাইলে ভীমরুলের দল সেখানে গিয়া ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড সুরু করিয়া দেয় এবং চাকে ডিম বাচ্চা যাহা-কিছু থাকে, সকলি খাইয়া ফেলে।

আগেই বলিয়াছি, ভীমরুলেরা ভয়ানক রাগী; এই জন্য ইহারা চাকে কি-রকমে চলা-ফেরা করে তাহা দেখিবার সুবিধা হয় না। চাকের কাছে গেলেই ইহারা ছুটিয়া তাড়া করে। ভীমরুলের জীবনের অনেক কথা এখনো জানিতে বাকি আছে।

কুমরে-পোকা

ইহারাও বোল্‌তা ও ভীমরুলের মত প্রাণী। আকারে ছোট হইলেও, ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক বোল্‌তাদেরি মত। এখানে কুমরে-পোকার একটা ছবি দিলাম। দেখ, বোল্‌তার চেয়ে ইহার মাজা কত সরু এবং পা-কয়েক-খানি কত লম্বা।
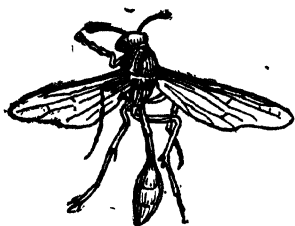
বোল্‌তার মত ইহারা দল বাঁধিয়া চাকে বাস করে না। এক একটা পোকা নিজেদের বাচ্চাদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঘর তৈয়ারি করে।

চিত্র ৪০—কুমরে-পোকা ও তাহার ঘর

কুমরে-পোকার ঘর তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। দেওয়ালের গায়ে, দরজা, জানালা ও কপাটের উপরে, ইহারা মাটি দিয়া ঘর তৈয়ার করে। আলমারিতে বই সাজাইয়া রাখিলে কখনো কখনো বইয়ের গায়ে বা কাগজের উপরেও ইহারা মাটির ঘর প্রস্তুত করে।

বোল্‌তাদের মত ইহাদের কতকগুলি স্ত্রী এবং কতক-গুলি পুরুষ হইয়া জন্মে। কিন্তু স্ত্রী-পোকারাই ঘর তৈয়ার

করে। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বাস করিবার জন্য ইহারা ঘর বানায়। কিন্তু তাহা নয়; বাচ্চাদের জন্যই ইহারা ঘর তৈয়ারি করে।

গ্রীষ্মের সময়ে কুমরে-পোকা বেশি দেখা যায়। এই সময়ে একটু নজর রাখিলেই তোমরা ঘরের কোণে, ছাদের কড়ি-কাঠের কাছে বা টেবিলের নীচে ইহাদিগকে ভন্-ভন্ করিয়া উড়িতে দেখিবে। ইহারা সময়ে সময়ে মুখের কাছে বার বার ঘুরিয়া বড়ই বিরক্ত করে। আমরা ঘর-বাড়ী প্রস্তুত করিবার সময়ে যেমন খুঁজিয়া পাতিয়া ভালো জায়গা বাছিয়া লই, ইহারাও এই রকমে উড়িয়া উড়িয়া বাসার উপযুক্ত জায়গা ঠিক্ করে।

সকল কুমরে-পোকা এক রকম নয়; নানা রকমের কুমরে-পোকা দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেকের দেহের আকৃতি ও ঘরের আকৃতি পৃথক্। আমাদের ঘরে-দুয়ারে সর্ব্বদা যে পোকা বাস করে, তাহাদের অনেকেরই সর্ব্বাঙ্গের রঙ্ গাঢ় বাদামী এবং কেবল মুখখানি হল্‌দে দেখা যায়।

যাহা হউক, বাসা করিবার জায়গা ঠিক্ হইলেই, ইহারা বিলম্ব না করিয়া কাজে লাগিয়া যায়। কাদাই ইহাদের ঘরের একমাত্র মাল-মসলা। কাছাকাছি কোনো জায়গায় ইহারা মুখের লালা দিয়া কাদা তৈয়ারি করে। তার পরে তাহা সম্মুখের দুখানি পায়ে আট্‌কাইয়া বাসার জায়গায় বহিয়া আনে। আমরা ঘর প্রস্তুত করিবার সময়ে কত

যন্ত্রপাতি ব্যবহার করি। কুমরে-পোকাদের কেবল পা ও মুখই যন্ত্রের কাজ করে। পিছনের চারিখানি লম্বা পা ও মুখের শক্ত ধারালো দাঁত দিয়া তাহারা কাদা বিছাইয়া শীঘ্রই ঘরের ভিত পত্তন করে। তার পরে, ক্রমাগত কাদা বহিয়া আনিয়া চার-পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে একটা গোলাকার গলা-সরু ঘর তৈয়ার করিয়া ফেলে। কুমরে-পোকার ছবিতে উহাদের গলা-সরু ঘরের ছবিও দেখিতে পাইবে।

ঘর প্রস্তুতের কাজে একবার লাগিয়া গেলে, যতক্ষণ কাজ শেষ না হয় ততক্ষণ ইহারা একটুও বিশ্রাম করে না। আমাদের ঘর প্রস্তুতের সময়ে কুলি-মজুরেরা ছাদ পিটাইতে পিটাইতে কত গান করে, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। কুমরে-পোকারাও ঘর বানাইবার সময়ে অবিরাম ভন্-ভন্ শব্দ করে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, এত পরিশ্রমের মধ্যেও তাদের যেন আনন্দ আছে।

যাহা হউক, বাসা প্রস্তুত হইলে কুমরে-পোকাদের ডিম-পাড়ার সময় উপস্থিত হয়। কিন্তু ডিম-পাড়ার সময়ে ইহারা কখনই বাসার ভিতরে যায় না; বাসার সরু গলীর ফাঁকে লেজ প্রবেশ করাইয়া ডিম পাড়ার কাজ শেষ করে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, বাসা প্রস্তুত ও ডিম-পাড়ার কাজ শেষ করিয়াই কুমরে-পোকারা মুক্তি পায়। কিন্তু তাহা নয়। বাচ্চারা ডিম হইতে বাহির হইয়া কি খাইবে, তাহার জোগাড় করিবার জন্য পোকারা এই সময়ে ব্যস্ত হইয়া

পড়ে। ছোট ছোট নরম শুঁয়ো-পোকা ইহাদের প্রিয় খাদ্য। তাই কুমরে-পোকারা ডিম পাড়িয়া শুঁয়ো-পোকার সন্ধানে ভোঁ ভোঁ করিয়া নিকটের বন-জঙ্গলে বা বাগানের ঝোপ্-ঝাপে ঘুরিয়া বেড়ায়। সবুজ রঙের শুঁয়ো-পোকাগুলিকেই পাখী ও বোল্‌তারা পছন্দ করে; ইহা তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। যে-সকল শুঁয়ো-পোকার গায়ে নানা রকম রঙ্ থাকে বা লম্বা লম্বা শুঁয়ো লাগানো থাকে, সেগুলি বড়ই বিস্বাদ ও বিষাক্ত। কোনো প্রাণীই এইগুলিকে ছোঁয় না। এইজন্য সবুজ পোকা খুঁজিয়া বাহির করিতে কুমরে-পোকাদের অনেকটা সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু ভালো পোকা পাইলে, তাহারা তখনি উহা বুকের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া বাসায় হাজির হয় এবং পোকাটিকে জীবন্ত অবস্থায় বাসার মধ্যে রাখিয়া দেয়।

জীবন্ত পোকাকে কোনো জায়গায় আট্‌কাইয়া রাখা বড় দায়। সুবিধা পাইলেই তাহারা পলাইয়া যায়। কুমরে-পোকারা যে উপায়ে তাহাদের ঐ শিকারগুলিকে জীবন্ত অবস্থায় বাসায় আট্‌কাইয়া রাখে, তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক। প্রাণিদেহে যে স্নায়ু-মণ্ডলী থাকে তাহা দিয়া কি কাজ হয়, সে-কথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। স্নায়ু-মণ্ডলী দিয়াই প্রাণীরা ইচ্ছামত হাত, পা, মুখ, চোখ নড়াইতে পারে এবং আরাম ও বেদনা বোধ করিতে পারে। পতঙ্গদের দেহের তলা দিয়া এক জোড়া স্নায়ুর সূতা মাথা হইতে লেজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং প্রত্যেক সূতা হইতে কয়েকটি শাখা বাহির

হইয়া দেহের ডাইনে ও বামে গাঁইটের মত জটলা পাকায়। এই গাঁটগুলি ছোট ছোট স্নায়ু-কেন্দ্র। ইহা প্রাণীর মস্তিষ্কের মত ভিন্ন ভিন্ন অংশে হুকুম চালায়। কুমরে-পোকারা এমন দুষ্ট যে, বাচ্চাদের জন্য শুঁয়ো-পোকা ধরিয়া উহাদের স্নায়ু-কেন্দ্রে হুল ফুটাইয়া দেয়। ইহাতে স্নায়ু-কেন্দ্রগুলি বিকল হইয়া পড়ে মাত্র, কিন্তু পোকারা প্রাণে মরে না। পক্ষাঘাত বা।রামের রোগী ইচ্ছা করিলেও হাত-পা নাড়াইতে পারে না। পোকাদের অবস্থা ঠিক্ পক্ষাঘাতের রোগীর মত হয়। তাহারা কোনোক্রমে ঘরের গর্ত্ত ছাড়িয়া নড়িতে পারে না। এই রকমে কুমরে-পোকারা নিজেদের বাসার মধ্যে শুঁয়ো-পোকা রাখিয়া বেশ নিশ্চিন্ত থাকে এবং একটা পোকাকে বাসায় রাখিয়া আবার নূতন পোকা ধরিবার জন্য ছুটিয়া বাহির হয়। এই রকমে পাঁচ-ছয়টা পোকা বাসার গর্ত্তে জমা হইলে, তাহারা বাসার সেই সরু মুখটা কাদা দিয়া বন্ধ করিয়া ফেলে। এই রকমে একটা ঘরের কাজ শেষ হইয়া যায়। দরকার হইলে কুমরে-পোকারা ইহারি উপরে বা পাশে আরো ঘর প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ রকমে ডিম ও বাচ্চার খাবার বোঝাই করিতে থাকে; কিন্তু ইহারা এক ঘরে একটির বেশি ডিম পাড়ে না।

বোলতারা বাচ্চাদিগকে কত যত্ন করিয়া পালন করে, তাহা তোমরা আগে শুনিয়াছ। কিন্তু কুমরে-পোকারা ডিমের পাশে বাচ্চাদের খাইবার পোকা রাখিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করে।

ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইল কি না এবং তাহারা রীতিমত খাওয়া-দাওয়া করিতেছে কি না, কুমরে-পোকারা তাহার একটুও খবর লয় না।

যাহা হউক, সাত-আট দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া বোল্‌তার বাচ্চার মত কুমরে-পোকার বাচ্চা বাহির হয়। সম্মুখে পাঁচ-সাতটা তাজা পোকা আট্‌কানো থাকে, জন্মিয়াই তাহারা সেই পোকা খাইতে আরম্ভ করে এবং কয়েক দিনের মধ্যে খুব মোটা হইয়া উঠে। তার পরে সাত-আট দিন পুত্তলির অবস্থায় মড়ার মত থাকিয়া তাহারা পা, ডানা ও মুখ-ওয়ালা সম্পূর্ণ পতঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

সম্পূর্ণ আকার পাইলে কুমরে-পোকারা আর সেই ছোট ঘরের অন্ধকারে আটক্ থাকিতে চায় না। দাঁত ও পা দিয়া বাসার দেওয়ালে ছিদ্র করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। ইহাই সাধারণ কুমরে-পোকাদের ঘর-বাড়ীর ও জীবনের কথা।

কাঁচ-পোকা

তোমরা কাঁচ-পোকা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহাদের গায়ের রঙটি কেমন চক্‌চকে নীল! শরীরটা কাচের মত চক্‌চকে বলিয়াই বোধ হয় ইহাদিগকে কাঁচ-পোকা বলা হয়। কাঁচ-পোকা ধরিবার জন্য ছেলেবেলায় যে কত ছুটাছুটি করিয়াছি, তাহা এখনো মনে আছে। ইহাদের লেজে যে-সকল শক্ত আংটির মত আবরণ থাকে, তাহা কাটিয়া মেয়েদিগকে টিপ পরিতে দেখিয়াছি।
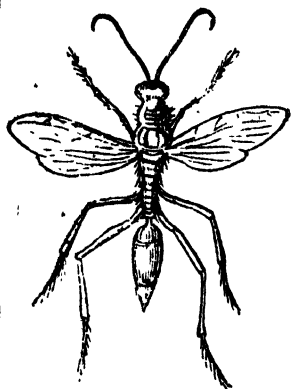
চিত্র ৭১—কাঁচ-পোকা

কাঁচ-পোকা বোল্‌তা-জাতীয় পতঙ্গ। কিন্তু ইহারা কখনই বোল্‌তাদের মত চাক্‌ বাঁধে না বা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে না এবং কুমরে-পোকাদের মত ঘরও বানায় না। ইহারা একেবারে বুনো পতঙ্গ। গাছের পচা রকমের কাঠে গর্ত্ত করিয়া ইহারা বাস করে। কয়েক জাতি কাঁচ-পোকাকে আমরা মাটিতে গর্ত্ত করিয়াও থাকিতে দেখিয়াছি।

ছোট বা বড় পোকা-মাকড়ই কাঁচ-পোকাদের প্রধান খাদ্য। যখন ইহারা তোমাদের বাগানে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন কেবল পোকা ধরিবারই ফন্দি করে। অনেক কাঁচ-পোকাকে গর্ত্তের মধ্যে গিয়া পোকা ধরিয়া আনিতে দেখা গিয়াছে।

ইহারা কি-রকমে আরসুলা শিকার করে, তোমরা দেখ নাই কি ? আরসুলার মত বড় প্রাণীকে কাঁচ-পোকারা জব্দ করিয়া ছাড়ে। একটা ছোট কাঁচ-পোকা প্রকাণ্ড আরসুলাকে শুঁয়ো ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিতেছে, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। তখন আরসুলা বেচারা দড়ায়-বাঁধা শান্ত গোরুর মত কাঁচ-পোকার পিছনে পিছনে চলে। ইহা দেখিলে সত্যই হাসি পায় এবং দুঃখও হয়। নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য আরসুলার হুল নাই, দাঁতে বিষ নাই, কেবল ছয়খানা পায়ে করাতের মত দাঁত লাগানো থাকে। আরসুলা দেখিলেই চতুর কাঁচ-পোকা তাহার পিঠে চড়িয়া বসে এবং হুল বাহির করিয়া তাহার গলার কাছে স্নায়ু-কেন্দ্রে খোঁচা দিতে থাকে। স্নায়ু-কেন্দ্রই প্রাণীদের বুদ্ধি-বিবেচনা ও চলা-ফেরার যন্ত্র। হুলের খোঁচায় তাহা নষ্ট হইয়া গেলে, আরসুলার অঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে এবং সে বুদ্ধি-বিবেচনা হারায়। কাজেই তখন ছোট কাঁচ-পোকা আরসুলার গোঁফ ধরিয়া যেখানে ইচ্ছা টানিয়া লইতে পারে।

কাঁচ-পোকারা এই রকমে যে-সকল আরসুলা বা মাকড়সা শিকার করে, তাহা উহারা নিজে প্রায়ই খায় না। আধ্-মরা শিকারগুলিকে বাসায় রাখিয়া সেখানে ডিম পাড়ে। ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া ঐ-সকল শিকারকে খাইয়া শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়। পুরুষ কাঁচ-পোকাদের পিছনে হুল থাকে না। ইহারা নিরীহ প্রাণী। স্ত্রীরাই পোকা-মাকড় শিকার করিয়া বেড়ায়।

মৌমাছি

এইবার তোমাদিগকে মৌমাছির কথা বলিব। ইহারা বোল্‌তা-জাতীয় পতঙ্গ। বোল্‌তাদের মত ইহাদের চারিখানি ডানা, ছয়খানি পা, মাথার উপরে তিনটা ছোট চোখ, এবং দুই পাশে দুইটা বড় চোখ আছে। কিন্তু ইহাদের মুখ ঠিক্ বোল্‌তাদের মুখের মত নয় এবং গায়ের রঙ্ বোল্‌তার রঙের মত উজ্জ্বল নয়।

এখানে মৌমাছির মুখের একটা ছবি দিলাম। দেখ, মুখে এক জোড়া দাঁত আছে। ইহা দিয়া মৌমাছিরা কাটাকুটির ও চিবাইবার কাজ চালায়। ইহার নীচে যে আঙুলের মত অংশ রহিয়াছে, তাহা দিয়া ইহারা খাবার আঁক্‌ড়াইয়া ধরে। সকলের নীচে শুঁড়ের মত জিনিসটা ইহাদের জিভ্। মৌমাছির ওষ্ঠ লম্বা হইয়া এই জিভের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং দেখা

চিত্র ৪২—মৌমাছির মুখ
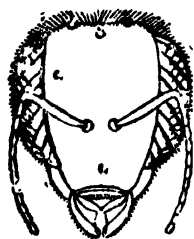
যাইতেছে, বোল্‌তার মুখের চেয়ে মৌমাছির মুখ কতকটা উন্নত। ইহাদের মাজা বোল্‌তার মাজার মত সরু নয়।

মৌমাছির সর্ব্বাঙ্গ—বিশেষতঃ পেটের তলার আগা-গোড়া বুরুসের মত ছোট লোমে ঢাকা থাকে। ফুলে মধু খাইতে বসিলে ঐ লোম দিয়া উহারা ফুলের রেণু সংগ্রহ করে। কুকুর ও ঘোড়া ছাই-গাদা ও ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কি-রকমে গায়ে ধূলামাটি মাখে, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। মৌমাছিরা সুন্দর ফুল দেখিলেই ফুলের কেশরের উপর পড়িয়া লুটাপুটি খায়। ইহাতে উহাদের গায়ে ফুলের রেণু ধূলার মত আট্‌কাইয়া যায়। কিন্তু কুকুর যেমন গা-ঝাড়া দিয়া ধূলা ফেলিয়া দেয়, মৌমাছিরা তাহা করে না। মাথার চুলে ধূলা-বালি বা কাটাকুটা লাগিলে আমরা তাহা বুরুস বা চিরুণী দিয়া ঝাড়িয়া ফেলি। উহারাও সেই রকমে পায়ের-গায়ে-লাগানো চিরুণীর মত কাঁটাগুলি দিয়া সর্ব্বাঙ্গের রেণু ঝাড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু সেগুলিকে ফেলিয়া দেয় না। যেমন এক একটু রেণু জড় হয়, তেমনি তাহারা উহা মুখের মধ্যে জমা করিতে আরম্ভ করে এবং শেষে মুখের লালার সহিত মিশাইয়া তাহা দিয়া ছোট ছোট বড়ি পাকাইতে সুরু করে। বড়ি তৈয়ারি হইলে তাহা আর মুখে রাখে না। মুখ হইতে তাহা প্রথমে সম্মুখের পায়ে, তার পরে মাঝের পায়ে এবং শেষে পিছনের পায়ে চালান করে। এই পা দুটির মাঝামাঝি অংশে

লোমে-ঢাকা কৌটার মত দুইটি খাঁজ কাটা থাকে। মৌমাছিরা পিছনের পা হইতে রেণুর বড়িগুলিকে ঐ কৌটায় জড় করিতে আরম্ভ করে।

ফুলের রেণুর বড়ি পাকাইয়া মৌমাছিরা কি করে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। উহাই মৌমাছির বাচ্চাদের প্রধান খাদ্য। আমরা ভাত ডাল দুধ খাইয়া বাঁচিয়া থাকি। মৌমাছির বাচ্চারা ফুলের রেণু না খাইলে বাঁচে না। ফুলের রেণুর বড়ির সঙ্গে একটু মধু এবং একটু জল মিশাইয়া মৌমাছিরা বাচ্চাদের জন্য উপাদের খাদ্য তৈয়ার করে। দেখ, ইহারা কত সৌখীন প্রাণী। ভালো খাবার ভিন্ন অন্য কিছু ইহাদের মুখে ভালোই লাগে না। ইহাদের খাওয়া-দাওয়ার আরো অনেক কথা তোমরা পরে জানিতে পারিবে।

এখানে মৌমাছির পিছনের পায়ের একটা ছবি দিলাম। ছবি দেখিলেই বুঝিবে, ফুলের রেণু রাখিবার জন্য পায়ে কেমন সুন্দর কৌটা রহিয়াছে! মৌমাছির সম্মুখের বা মাঝের পায়ে এই রকম কৌটা থাকে না।
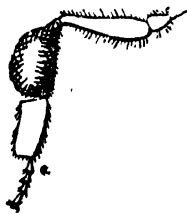
চিত্র ৪৫—মৌমাছির পিছনের পা

বোল্‌তার মধ্যে যেমন স্ত্রী, পুরুষ এবং কর্ম্মী এই তিন রকমের পতঙ্গ দেখা যায়, মৌমাছির মধ্যেও ঐ রকম তিনটি পৃথক্ জাতি আছে। এই তিন জাতি প্রাণী একই চাকে বাস করিলেও তাহাদের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।
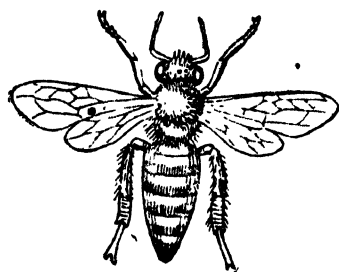
আমরা এখানে কর্ম্মী মাছির ছবি দিলাম। স্ত্রী ও পুরুষ মৌমাছির মুখে লম্বা জিভ্ থাকে না। ইহাদের কেহই মধু সংগ্রহ করিতে বাহির হয় না, এই জন্য লম্বা জিভের দরকারও থাকে না। স্ত্রী-মাছিরা একটু লম্বা এবং তাহাদের গায়ের রঙ্ বেশ উজ্জ্বল, কিন্তু ডানা লম্বা নয়। পুরুষদের শরীর বেশ মোটা ও তাহাদের গায়ে লোমের পরিমাণ যেন বেশি। স্ত্রী ও পুরুষের লেজে হুল থাকে না। স্ত্রীদের লেজে হুলের মত যে একটা অংশ থাকে, তাহা দিয়া উহারা ডিম পাড়ে। মাথায় কি-রকমে চোখ লাগানো আছে, তাহা দেখিয়াও পুরুষ, স্ত্রী ও কর্ম্মী মৌ-মাছিদের চিনিয়া লওয়া যায়। পুরুষের বড় চোখ দুটি প্রায় গায়ে-গায়ে মাথার খুব উপর দিকে থাকে। কর্ম্মী ও স্ত্রী মাছির চোখ মাথার এত উপর দিকে থাকে না।

চিত্র ৪৪—কর্ম্মী মৌমাছি

মৌমাছির চাক্

তোমরা নিশ্চয়ই মৌমাছির চাক্ দেখিয়াছ। যেখানে বেশ আলো-বাতাস লাগে, অথচ রৌদ্র বা বৃষ্টির উৎপাত

নাই, এমন জায়গায় ইহারা চাক্ বাঁধে। বাগানের গাছের ডালে বা বাড়ীর বারান্দা বা কড়ি-বরগার গায়ে মৌচাক্ প্রায়ই দেখা যায়। হিমালয় পর্ব্বতের জঙ্গলে বুনো-মৌ-মাছিরা খুব বড় চাক্ প্রস্তুত করে। লোকে তাহা ভাঙ্গিয়া মধু সংগ্রহ করে এবং তাহা বিক্রয় করে। তোমরা মৌ-চাকের সন্ধান পাইলে দূরে দাঁড়াইয়া চাক্‌খানিকে ভালো করিয়া দেখিয়ো। দেখিবে, হাজার হাজার মাছি জটলা পাকাইয়া চাকের উপরে বিজ্-বিজ্ করিতেছে। হয় ত দেখিবে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি একের পায়ে অপরের পা বাধাইয়া শিকলের মত ঝুলিতেছে। খানিক দাঁড়াইয়া থাকিলে দেখিতে পাইবে, হঠাৎ কতকগুলি ভোঁ করিয়া চাক্ হইতে কোথায় উড়িয়া গেল এবং আবার কতকগুলি হয় ত কোথা হইতে তাড়াতাড়ি উড়িয়া আসিয়া চাকের উপরে বসিল। কিন্তু এত আনাগোনা, এত যাওয়া-আসা এবং এত জটলার মধ্যে মাছিরা পরস্পর ঝগড়া-ঝাঁটি বা মারামারি করে না। ইহা খুব আশ্চর্য্যের কথা নয় কি? আমাদের এক একটা সহরে বিশ হাজার বা ত্রিশ হাজার লোক বাস করে, ইহারা পরস্পর কত হানাহানি মারামারি করে, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? একজন কিছু টাকা উপার্জ্জন করিলে, আর একজন তাহা চুরি করিবার ফন্দি করে। এই রকমে আমাদের গ্রামে নগরে নানা উৎপাতের সৃষ্টি হয়। ইহা নিবারণ করিবার জন্য কত চৌকিদার ও পুলিশের

লোক দিবারাত্রি গলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কত আইন করিয়া অপরাধীদিগকে দণ্ড দিতে হয়। এক একটা চাকে কুড়ি বা ত্রিশ হাজার মাছি বাস করে, কিন্তু ইহারা কখনই পরস্পরের উপরে অত্যাচার করে না। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য !

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, মৌমাছিরা খুব কড়া আইন মানিয়া চলে এবং এবং ইহাদের যে রাজা আছে সে-ও বুঝি খুব কড়া ; তাই চাকের মধ্যে ঝগড়া বা মামামারি হয় না। এই কথাটা খুবই সত্য। চাকের প্রত্যেক মাছিকে খুব কড়া নিয়ম মানিয়াই চলিতে হয়, কিন্তু নিয়মগুলি কেহ ভাঙিতেছে কি না দেখিবার জন্য পাহারা-ওয়ালা নাই। শরীরে যত দিন বল থাকে, তত দিন প্রত্যেকেই আপনার কাজ করিয়া যায়। কাজে লাগাইবার জন্য বা কাজ আদায় করিবার জন্য ইহাদের মধ্যে তাগিদ দিবার কেহ নাই। ইহাদের রাজা বা শাসনকর্ত্তাও নাই। প্রত্যেক চাকে একটিমাত্র স্ত্রী-মাছি থাকে, তাহাকেই মাছিরা রাণী বলিয়া মানে। সকলে মিলিয়া রাণীকে যত্ন করে। কিন্তু সে কখনো কাহাকেও শাসন করে না ; শান্ত প্রজাদিগকে শাসন করিবার দরকারও হয় না !

আমরা এখন মৌচাকের পত্তনের সময় হইতে তাহার শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত সকল কথা তোমাদিগকে বলিব।

কি-রকমে নূতন চাকের পত্তন হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা দেখ নাই। আমরা অনেক দেখিয়াছি। এক দিন

হঠাৎ কোথা হইতে শত শত মাছি ভয়ানক বন্-বন্ শব্দে ঘুরিতে ঘুরিতে, হয় ত বারান্দায়, কড়ি-কাঠে বা বাগানের কোনো গাছের ডালে আসিয়া বসে। তখন সেখানে চাক্ থাকে না। কিন্তু তাহারা এমন জটলা করিয়া থাকে যে, দেখিলে মনে হয় যেন সকলেই চাকের উপরে বসিয়া আছে। তোমরা যদি এই সময়ে মৌমাছিদিগকে পরীক্ষা কর, তবে হাজার হাজার মাছির মধ্যে কেবল একটি মাত্র স্ত্রী-মাছি দেখিতে পাইবে। পুরুষ-মাছি হয় ত খুঁজিয়াই পাইবে না। সুতরাং বলিতে হয়, আমরা সর্ব্বদা চাকে যে-সকল মাছি দেখিতে পাই, সেগুলির প্রায় সকলেই কর্ম্মী মাছি।

কর্ম্মী মৌমাছি

চাকের জায়গা ঠিক হইলেই কর্ম্মী মাছির দল চাক্ গড়িতে লাগিয়া যায়। বোল্‌তারা কি-রকমে দাঁতে কাঠ গুঁড়া করিয়া কাগজের মত জিনিসে চাক তৈয়ারি করে, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। মৌমাছিরা সে-রকম জিনিস চাকে ব্যবহার করে না। ইহাদের চাক্ মোম দিয়া প্রস্তুত। কিন্তু এই মোম তাহারা অন্য জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া আনে না; কর্ম্মী মাছিরা নিজেদের দেহেই উহা প্রস্তুত করে। ইহাদের পেটের তলায় যে আংটির মত কঠিন আবরণ থাকে, তাহারি পাশে পাশে মোম জড় হয়। আমাদের গা হইতে

যেমন ঘাম বাহির হয়, কর্ম্মী মাছিদের শরীর হইতে সেই রকমে মোম বাহির হয়। মধু খাইয়া হজম করিলেই পাত্‌লা আঁইসের মত উহা পেটের তলায় জমে। মাছিরা তাহাই সম্মুখের পা দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া মুখে পূরিয়া দেয় এবং দাঁতে চিবাইয়া ও লালার সঙ্গে মিশাইয়া জিনিসটাকে কাদার মত করিয়া ফেলে। ইহা দিয়াই চাকের ভিত পত্তন হয়। যে কর্ম্মীরা ভিত পত্তন করে, তাহারা ঠিক জায়গায় মুখের মোম রাখিয়া উড়িয়া অন্য কাজে চলিয়া যায়। মোম জমা হইয়াছে দেখিলেই আর এক দল কর্ম্মী মাছি দাঁত, মুখ ও পা দিয়া তাহা ছড়াইয়া চাক্ গড়িতে সুরু করে।

আমাদের বড় বড় কল-কারখানায় কি-রকমে কাজ চলে, তোমরা হয় ত দেখিয়াছ। কুলি-মজুরেরা এলোমেলো ভাবে কাজ করে না। সমস্ত কাজকে ভাগ করিয়া লইয়া এক-এক দল কুলি এক একটা কাজে লাগিয়া যায়। মৌমাছিরাও ঠিক এই রকমে ভাগাভাগি করিয়া চাকের কাজ চালায়। যাহারা মোম তৈয়ারি করে, তাহারা ঐ কাজটি ছাড়া প্রায়ই অন্য কাজ করে না। যাহারা ঘরে মোম বিছাইয়া দেয়, তাহারাও ঐ কাজেই দিবারাত্রি কাটায়। এই রকমে ঘরে ছিদ্র করা, ছিদ্রগুলিকে ঠিক ছয়-কোণা করিয়া গড়িয়া তোলা এবং সেগুলিকে পালিস করা ইত্যাদি সকল কাজই এক-এক দল পৃথক্ কর্ম্মীরা করে। এক রকমে চাকের কাজ খুব শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়।

এখানে মৌচাকের একটা ছবি দিলাম। কর্ম্মী মাছিরা কত কৌশলে চাক্ তৈয়ারি করিয়াছে, ছবিখানি দেখিলেই

চিত্র ৪৫—মৌচাকের ছবি

তোমরা বুঝিতে পারিবে। চাকের প্রত্যেক ছিদ্রটি বোল্‌তার চাকের ছিদ্রের মত ছয়-কোণা।

চাক্ প্রস্তুত হইলে কর্ম্মী মাছিদের খুব কাজ বাড়িয়া যায়। তখন খাওয়ার জন্য যাহা দরকার, তাহা ছাড়া আরো মধু সংগ্রহ করিবার জন্য তাহারা চেষ্টা করে। উদ্বৃত্ত মধু না খাইয়া মাছিরা তাহা গলার থলিতে বোঝাই করে ও চাকে ফিরিয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে পিছনের পায়ের সেই কৌটার মত পাত্রে ফুলের রেণু সংগ্রহ করিয়া আনে। ফুলের রেণুর সহিত মধু মিশাইলে যে কাদার মত জিনিস হয়, ইহাই মাছির বাচ্চাদের খাদ্য। কর্ম্মী মাছিরাই চাকে আসিয়া ঐ দুই দ্রব্য মিশাইয়া বাচ্চাদের খাওয়ায়। এই রকমে খাওয়ানো শেষ হইলে, যে মধু বাকি থাকে, তাহা উহারা চাকের শূন্য ছিদ্রে জমা রাখে। ফুলের টাট্‌কা মধু কি-রকম, তাহা বোধ হয় তোমরা দেখিয়াছ। এই মধু জলের মত পাত্‌লা ও পরিষ্কার। এই জিনিসই চাকের ছিদ্রের মধ্যে কিছুদিন থাকিয়া বাদামী রঙের গাঢ় মধু হইয়া দাঁড়ায়। ছিদ্রের মধুর এই পরিবর্ত্তন হইলে কর্ম্মী মাছিরা মোমের পাত্‌লা ঢাক্‌নি দিয়া ছিদ্রগুলি ঢাকিয়া ফেলে। ইহাই চাকের মাছিদের ভবিষ্যতের খাবার। বর্ষার দিনে যখন টাট্‌কা মধু সংগ্রহ করা যায় না, তখন মাছিরা ঐ-সকল ছোট ছোট ভাণ্ডারের দরজা খুলিয়া খাওয়া-দাওয়া করে।

কর্ম্মী-মাছি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলাম। ইহা ছাড়া কর্ম্মীদের আরো অনেক কাজ করিতে হয়। ডিম হইতে সদ্য সদ্য যে-সকল বাচ্চা বাহির হয়, তাহারা ফুলের রেণু ও মধু

খাইতে পারে না। দুধের মত এক রকম জিনিস ছোট বাচ্চাদের একমাত্র খাদ্য। কর্ম্মী মাছিরাই শরীর হইতে এই দুধ বাহির করিয়া বাচ্চাদের খাওয়ায়। তা ছাড়া মৌ-চাকে বেশি গরম হইলে ডানা নাড়িয়া বাতাস দেওয়া, চাকে বাচ্চা বা বড় মাছি মরিলে সে-গুলিকে ফেলিয়া দেওয়া এবং রাণী যখন ডিম পাড়ে তখন ডিমগুলিকে যত্ন করা—এই সকল কাজ কর্ম্মী মাছিদিগকেই করিতে হয়। রাণী প্রতিদিন হাজার হাজার ডিম প্রসব করে। সুতরাং জোরালো খাবার না খাইলে সে বাঁচে না। কর্ম্মী মাছিরাই নিজের শরীর হইতে দুধ বাহির করিয়া রাণীকে খাওয়ায়।

যে মাছিদের উপরে এত কাজের ভার, তাহাদের কত পরিশ্রম করিতে হয় একবার ভাবিয়া দেখ। এই প্রকার খাটিয়া কর্ম্মী মাছিরা বেশি বাঁচে না,—জন্মের পর প্রায়ই দুই মাসের মধ্যে ইহারা মারা যায়। কিন্তু ইহাতে চাকের কাজের ক্ষতি হয় না। বড় বড় চাকে যেমন প্রতিদিন শত শত কর্ম্মী মারা যায়, তেমনি শত শত নূতন কর্ম্মী জন্মিয়া তাহাদের জায়গায় কাজ চালায়।

রাণী-মাছি ও পুরুষ-মাছি

কর্ম্মী মাছিদের কথা বলিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। এখন তোমাদিগকে স্ত্রী-মাছি অর্থাৎ রাণী এবং পুরুষ-মাছির

কাজ-কর্ম্মের কথা বলিব। ইহাদের চলাফেরা সকলি বড় মজার।

চাক্ প্রস্তুত হইলে রাণী বড় চঞ্চল হইয়া পড়ে এবং এক-একবার চাক্ ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু কর্ম্মী মাছিরা সাধা-সাধনা করিয়া তাহাকে আট্‌কাইয়া রাখে। শেষে একদিন হঠাৎ সে উড়িয়া পলাইয়া যায় এবং চাকে যে দুই একটি পুরুষ-মাছি থাকে, তাহারাও রাণীর পিছনে ছুটিয়া যায়। রাজা রাস্তায় বাহির হইলে যেমন অনেক সিপাহী ও পাহারা-ওয়ালা তাঁহার সঙ্গে চলে, রাণী বেড়াইতে বাহির হইলে তেমনি পুরুষ-মাছিরা তার সঙ্গে যায়। এক ঘণ্টার মধ্যে রাণীর বেড়ানো শেষ হয় এবং সে আবার চাকে ফিরিয়া আসে। কিন্তু পুরুষদের আর দেখা পাওয়া যায় না। তাহারা রাণীর সঙ্গে একটু এদিক্ ওদিক্ আনন্দে বেড়াইয়া প্রায়ই মারা যায়।

ইহার দুই-তিন দিন পরে রাণীর ডিম পাড়িবার সময় উপস্থিত হয়। সময় আসিতেছে বুঝিয়া কর্ম্মী-মাছিরা আগেই চাকে অনেক ঘর তৈয়ার করিয়া রাখে। কয়েকটি কর্ম্মীকে সঙ্গে লইয়া রাণী প্রত্যেক ছিদ্রে এক-একটি ডিম প্রসব করিতে থাকে। এই রকমে প্রতিদিন প্রায় দুই-তিন শত ছিদ্রে ডিম জমা হয়।

মৌমাছির ডিম ফুটিতে দেরি হয় না। দুই তিন দিনের মধ্যেই ছিদ্রের ডিম হইতে এক একটি শুঁয়ো-পোকার

মত বাচ্চা বাহির হয়। এই সময়ে কর্ম্মীদের খুব পরিশ্রম করিতে হয়। কিন্তু ডিম প্রসব করিয়া রাণী তাহার সন্তানদের দিকে ফিরিয়াও চায় না। কর্ম্মী-মাছিরাই বাচ্চাদের পালন করে। ফুলের রেণু ও মধু মিশাইয়া যে মিষ্ট খাদ্য তৈয়ারি করা হয়, তাহা উহারাই প্রত্যেক বাচ্চার মুখের কাছে রাখিয়া খাওয়ায়। এই রকমে আট দশ দিনের মধ্যে বাচ্চারা বেশ বড় হইয়া পড়ে।

ইহার পরে বাচ্চারা পুত্তলি-অবস্থায় আসিয়া পড়ে। তখন ইহারা একেবারে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করিয়া দেয় এবং কর্ম্মী-মাছিরা সেই সময়ে মোমের খুব পাত্‌লা পর্‌দা দিয়া ছিদ্রের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। ছিদ্রের মধ্যে বাচ্চারা এই রকমে দশ বারো দিন নিরিবিলি বাস করে এবং মুখের লালা দিয়া এক রকম সূতা প্রস্তুত করিয়া নিজেদের দেহগুলিকে ঢাকিয়া ফেলে।

এই রকমে নিভৃত-বাস শেষ হইলে, সেই শুঁয়ো-পোকা আকারের বাচ্চারা ডান পা এবং মুখওয়ালা মৌমাছি হইয়া দাঁড়ায়। শেষে দাঁত দিয়া ছিদ্রের ঢাক্‌নি কাটিয়া চাকের উপরে আসিয়া উপস্থিত হয়। বিড়াল, কুকুর, মানুষ, গোরু ইত্যাদি প্রাণীরা অল্প বয়সে আকারে ছোট থাকে। তার পর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া তাহারা বড় হয়। বোল্‌তা ও মৌমাছিদের মধ্যে ইহা দেখা যায় না। শুঁয়ো-পোকার আকারের চেহারা বদ্‌লাইয়া মৌমাছি ও বোল্‌তারা যে আকার পায়, তাহা আর বয়সের সঙ্গে বাড়ে না।

যাহা হউক, ছিদ্র হইতে ডানাওয়ালা বাচ্চারা বাহির হইতেছে দেখিলেই, কর্ম্মী-মাছিরা তাহাদের নিকটে ছুটিয়া যায় এবং দুই দিন ধরিয়া তাহাদিগকে টাট্‌কা মধু ও ফুলের রেণু খাওয়াইতে থাকে। ইহাতে বাচ্চারা গায়ে বল পাইয়া বেশ উড়িতে ও কাজকর্ম্ম করিতে শিখিয়া ফেলে। তৃতীয় দিনে ইহাদিগকে আর যত্ন করার দরকার হয় না। তখন ইহারা অন্য কর্ম্মী-মাছিদেরই মত চাকের কাজে লাগিয়া যায়।

এখানে মৌমাছির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ছবি দিলাম।
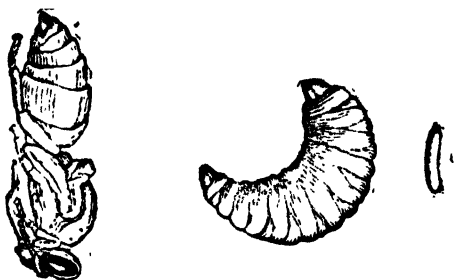
চিত্র ৪৬—ডিম, পোকা, পুত্তলি

ডিম, বাচ্চা ও পুত্তলি কি রকম, ছবিটি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে।

চাক্ বাঁধার পরে দুই মাসের মধ্যে মৌমাছিদের রাণী যে-সকল ডিম পাড়ে, তাহা হইতে কেবল কর্ম্মী-মাছিই জন্মে। কাজেই অনেক মাছিতে চাক্ বড় হইয়া পড়ে এবং অনেক ছিদ্রে মধু জমা হয়। এই সময়ে মাছিদের কাহারো কোনো অভাব থাকে না। চাকের কাজ বেশ ভালোই চলে। কিন্তু

এই সুখের অবস্থা বেশি দিন থাকে না। তোমরা যদি কখনো মৌমাছির বড় চাক্ পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাও, তবে দেখিবে, চাকের এক প্রান্তে কতকগুলি বড় ছিদ্রযুক্ত ঘর আছে। কর্ম্মী মাছিরা চাক্ বাঁধার দুই তিন মাস পরে এই সকল বড় ছিদ্র প্রস্তুত করে। চাক্ বড় হইয়া পড়িলে রাণী যে-সকল ডিম পাড়ে, তাহা হইতে প্রায়ই পুরুষ ও স্ত্রী মাছি জন্মে। ঐ বড় ঘরগুলি পুরুষ ও স্ত্রীদের জন্যই প্রস্তুত থাকে।

চাকের ঐ-সকল ছিদ্রে রাণী ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিলেই কর্ম্মী মাছিদের আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়া যায়। তাহারা তখন দিবারাত্রি স্ত্রী ও পুরুষ বাচ্চাদের যত্ন করিতে সুরু করে। এই সময়ে বাচ্চাদের মুখের গোড়ায় ভারে-ভারে খাবার ঢালিয়া দিতে হয়। স্ত্রী-বাচ্চারা বেশি পেটুক হইয়া জন্মে। কর্ম্মী-মাছিরা নিজের শরীর হইতে দুধ বাহির করিয়া তাহাদের খাওয়ায়। ইহাতে বাচ্চারা শীঘ্র সবল হইয়া উঠে।

এক রাজার রাজ্যে আর এক রাজা রাজত্ব করিতে ইচ্ছা করিলে, রাজায় রাজায় লড়াই বাধে। তখন রাজা-প্রজা সকলকেই অস্থির হইয়া পড়িতে হয়—দেশে একটুও শান্তি থাকে না। পুরাতন রাণীর ডিম হইতে যখন বাচ্চারা নূতন রাণী সাজিয়া বাহির হইতে চায়, তখন চাকে ঠিক সেই রকম অশান্তি দেখা দেয়। পুরানো রাণী নূতনদের ভয়ে কাঁপিতে থাকে এবং চাক্ ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করে। কর্ম্মী-

মাছিরা পুরানো রাণীকে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া চাকে আট্‌কাইয়া রাখে এবং নূতন রাণীরা যাহাতে বাহির না হয়, তাহার জন্য ছিদ্রের মুখে ক্রমাগত মোম চাপাইতে থাকে। কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইয়া যায়; নরম মোমের ঢাক্‌নি নূতন রাণীকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারে না। হঠাৎ একদিন নূতন রাণী ঢাক্‌নি কাটিয়া ছিদ্রের বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় এবং পুরানো রাণী কয়েকটি পুরুষ ও কয়েক হাজার কর্ম্মীকে সঙ্গে লইয়া চাক্ ছাড়িয়া আর এক জায়গায় চাক্ বাঁধিবার চেষ্টা করে।

নূতন রাণী বুড়ো-রাণীকে তাড়াইয়া কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটায়। চাকের কর্ম্মীরা ইহাকই রাণী বলিয়া মানে ও তাহার মুখে ভালো ভালো খাবার গুঁজিয়া দেয়। কিন্তু নূতন রাণীরও এই সুখ বেশি দিন থাকে না। চাকের আর এক ছিদ্র হইতে আর একটি রাণী বাহির হইতেছে দেখিয়া সে বুড়ো-রাণীর মতই বিপদে পড়ে এবং কতকগুলি সঙ্গী লইয়া চাক্ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। যদি কোনো গতিকে দুই রাণী মুখোমুখী হইয়া পড়ে, তবে আর রক্ষা থাকে না। দু'জনের মধ্যে ভয়ানক লড়াই বাধিয়া যায় এবং যতক্ষণ দুইয়ের মধ্যে একটি মারা না যায় ততক্ষণ ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে।

যাহা হউক, এই রকমে এক-একটি রাণী এক এক দল মাছিকে সঙ্গে লইয়া পলাইলে, চাক্ বেশ খালি হইয়া পড়ে।

কখনো কখনো এই রকমের চাকে একটি মাছিও থাকে না ; কর্ম্মী-মাছিরা ডিম ও বাচ্চাদের মুখে লইয়া রাণীর সঙ্গে নূতন চাক্ বাঁধিবার চেষ্টায় বাহির হয়। কিন্তু সকলেই নূতন চাকে পৌঁছিতে পারে না। কতক কর্ম্মী জলে ডুবিয়া মরে, কতক হয় ত আগুনে বা রৌদ্রে পুড়িয়া মারা যায়। যদি পুরাতন চাকের বাস করার সুবিধা থাকে, তবে নূতন রাণী রণমূর্ত্তি ধরিয়া ভয়ানক মারামারি আরম্ভ করে। রাণীর এই সময়ের চেহারা দেখিলে ভয় হয়। সে ডানা মেলিয়া প্রত্যেক ছিদ্রে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সেখানে যে স্ত্রী ও পুরুষ বাচ্চা থাকে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। এই হত্যাকাণ্ডে কর্ম্মী মাছিরাও যোগ দেয়। এই রকমে স্ত্রী ও পুরুষেরা মরিয়া গেলে নূতন রাণী পুরানো চাকের একমাত্র অধীশ্বরী হইয়া পড়ে। পুরুষ মাছিরা মরিয়া যাওয়ায় কর্ম্মীদের কাজ অনেক কমিয়া আসে, কারণ তখন ভারে-ভারে খাবার আনিয়া পুরুষদের খাওয়াইতে হয় না। তখন কর্ম্মীরা নিশ্চিন্ত হইয়া নূতন করিয়া ঘর তৈয়ারি সুরু করিতে পারে এবং নানা প্রকার গাছ হইতে আঠা সংগ্রহ করিয়া ভাঙা ঘর জোড়া দিতে থাকে। মারামারি ও হানাহানির পরে এই রকমে চাকে আবার শান্তি ফিরিয়া আসে।

মৌমাছির আয়ু

মৌমাছিরা বেশি দিন বাঁচে না। কর্ম্মী মাছিদের খুব বেশি পরিশ্রম করিতে হয়। এই কারণে দেড় মাসের

মধ্যে ইহারা মারা যায়। যখন পরিশ্রম বেশি না থাকে, তখন ইহারা তিন মাস পর্য্যন্ত বাঁচে। পুরুষ-মাছিরা কখনো কখনো দু'মাস পর্য্যন্ত বাঁচে। কিন্তু প্রায়ই ইহারা রাণীর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া মারা যায়। পুরুষ-মাছি একবার চাক্ ছাড়িয়া উড়িয়া গেলে, সে আর প্রায়ই চাকে ফিরিয়া আসে না। স্ত্রী-মাছিদেরই আয়ু বেশি। কখনো কখনো ইহাদিগকে দুই হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে দেখা যায়।

মৌমাছির দল

প্রত্যেক দলে হাজার হাজার মাছি থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, কোনো মাছি নিজের দল ছাড়িয়া অন্য দলের চাকে যায় না এবং গেলেও সেখানে জায়গা পায় না। তোমাদের গ্রামে যদি তিন হাজার লোক বাস করে, তবে প্রত্যেক লোককে চিনিয়া রাখা কত কঠিন, তাহা মনে করিয়া দেখ। কিন্তু মৌমাছিরা নিজের দলের সকল মাছিকেই চিনিয়া রাখে। যদি অপর চাকের মাছি ভুল করিয়া তাহাদের চাকে আসিতে চায়, তবে পাহারা-ওয়ালা মাছিরা নূতন মাছিকে তাড়াইয়া দেয়। মাছিরা দলের সকলকে কি-রকমে চিনিয়া রাখে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। যাঁহারা মৌমাছির চলা-ফেরা অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, প্রত্যেক চাকের মৌমাছিদের

গায়ে এক-এক রকম গন্ধ আছে। এই গন্ধ শুঁকিয়া মাছিরা আপনার দলের মাছিদিগকে চিনিয়া লয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যদি কোনো চাকের কতকগুলি মাছিকে তিন-চারি ঘণ্টা ধরিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে উহাদের গায়ের গন্ধ লোপ পায়। তখন সেই মাছিদিগকে ছাড়িয়া দিলে, তাহারা মহা বিপদে পড়ে। গায়ের গন্ধ না থাকায় নিজের চাকের মাছিরা তাহাদিগকে চিনিতে পারে না। কাজেই, অনেক সাধাসাধনা করিয়াও তাহারা চাকে জায়গা পায় না।

তোমাদিগকে এ-পর্য্যন্ত কেবল চাকের মাছিদের কথাই বলিলাম। ইহা ছাড়া আরো অনেক রকম মৌমাছি আছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই চাক্ বাঁধিয়া একত্র বাস করে না। অনেকেই কুমুরে-পোকাদের মত পৃথক্ বাসা বাঁধিয়া বাচ্চাদের লালন-পালন করে। এক রকম মাছি গাছের আঠা জোগাড় করিয়া বইয়ের আলমারির গায়ে বাসা বাঁধে,—ইহারাও মৌমাছি-জাতীয় প্রাণী। আবার এক জাতি মৌমাছিকে গাছের পাতা কাটিয়া বাসা তৈয়ার করিতে দেখা যায়।

যাহা হউক, মৌমাছির জীবনের সকল কথাই বড় আশ্চর্য্যজনক। এ-রকম ছোট প্রাণী যে এত বুদ্ধি খাটাইয়া চাক্ বাঁধিয়া বাসা করিতে পারে, ইহা যেন আমাদের বিশ্বাসই হয় না। কিন্তু ইহার সকলি সত্য।

পিপীলিকা

এইবার আমরা পিঁপ্‌ড়ের কথা বলিব। ইহারা মৌমাছি ও বোল্‌তার দলের প্রাণী, কিন্তু তাহাদের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান্‌। হাতী ঘোড়া বাঘ ভালুক প্রভৃতি বড় প্রাণীরা বুদ্ধি খরচ করিয়া যাহা করিতে না পারে, পিঁপ্‌ড়েরা তাহা করে। এই পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীই পিঁপড়ের মত বুদ্ধিমান্‌ নয়।

পিঁপ্‌ড়েরা নিজের তৈয়ারি ঘরে দল বাঁধিয়া বাস করে, দলের উন্নতির জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করে, নিজেদের ঘর বাড়ী ও ছেলেপিলেদের রক্ষা করিবার জন্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে। ইহাদের ভাষা নাই বটে, কিন্তু নানা রকমে মনের ভাব পরস্পরকে জানাইতে পারে। আমরা যেমন গোরু পুষিয়া তাহার দুধ খাই, ইহারাও তেমনি এক রকম পোকা পুষিয়া সেগুলির নিকট হইতে মিষ্ট খাদ্য আদায় করিয়া লয়। আবার দুই এক রকম পিঁপ্‌ড়ে আমাদের মত চাষ-আবাদও করে। ইহারা ঘাসের ছোট বীজ মুখে করিয়া বহিয়া আনে এবং তাহা বুনিয়া শস্য উৎপন্ন করে। সুতরাং সাধারণ বুদ্ধিতে পিঁপ্‌ড়েরা মানুষের চেয়ে খুব কম নয়।

ভালো আতসী-কাচ দিয়া দেখিলে পিঁপ্ড়েকে যে-রকম
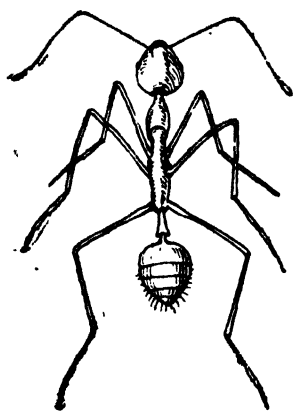
চিত্র ৪৭—পিঁপড়ে

দেখায় এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম। ছবিতে পিঁপ্ড়ের বুক ও লেজের জোড়ের জায়গায় বলের মত দুইটি পিণ্ড আছে। ইহা পিঁপ্ড়ের দেহের প্রধান চিহ্ন। কোনো কোনো পিঁপ্ড়ের দেহে ঐ-রকম একটি মাত্র পিণ্ড থাকে।

মৌমাছি ও বোল্তার মতই পিঁপ্ড়েদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ও কর্ম্মী এই তিন জাতি আছে। স্ত্রী ও কর্ম্মী পিঁপ্ড়ের লেজের অংশটা প্রায়ই ছয় থাক্ আংটি জুড়িয়া প্রস্তুত হয়। পুরুষদের লেজে সাত থাক্ আংটি থাকে। কিন্তু ইহাদের সকলেরি ছয়খানা লম্বা পা এবং মাথায় একজোড়া শুঁয়ো থাকে। পিঁপ্ড়ের শুঁয়ো বোল্তা বা মৌমাছির শুঁয়ের মত নয়। আমাদের হাত ও পা যেমন কতকগুলি ছোট ও বড় খণ্ড খণ্ড অংশ জুড়িয়া প্রস্তুত, পিঁপ্ড়ের শুঁয়োও ঠিক সেই রকম দুইটি খণ্ড জুড়িয়া প্রস্তুত হয়। মৌমাছিদের পায়ে চিরুণীর দাঁতের মত যে-সকল কাঁটা লাগানো আছে, ইহাদের পায়েও ঠিক তাহাই দেখা যায়। গায়ে মাথায় বা শুঁয়োতে ধূলা মাটি বা অন্যান্য কোন আবর্জ্জনা লাগিলে,

উহারা পায়ের চিরুণী দিয়া তাহা ঝাড়িয়া ফেলে। তোমরা যদি কিছুক্ষণ কোনো পিঁপ্ড়ের চলা-ফেরা লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, সে মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া পা দিয়া শুঁয়ো ঘসিতেছে। শরীরের ময়লা মাটি ছাড়াইবার জন্যই উহারা ঐ-রকম করে। গোরু যেমন জিভ দিয়া বাছুরের গা চাটে ও গায়ের ময়লা ছাড়াইয়া দেয়, পিঁপ্ড়েরা সেই রকমে পরস্পরে গায়ে পা বা শুঁয়ো বুলাইয়া শরীরের ধূলা মাটি পরিষ্কার করে।

এখানে পিঁপ্ড়ের মুখের একটা বড় ছবি দিলাম। দেখ, কি বিশ্রী মুখ! অন্য পতঙ্গের মুখ কতকটা ছুঁচলো, কিন্তু পিঁপ্ড়ের মুখ একবারে চেপ্টা এবং চোখ দু'টা নিতান্ত ছোট। তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, এত ছোট চোখ লইয়া উহারা কি করিয়া চলা-ফেরা করে। মাটির তলায় অন্ধকারে পিপ্ড়েরা যখন ঘর-দুয়ার প্রস্তুত করে, তখন চোখের দরকারই হয় না, শুয়ো দিয়া সব জিনিসকে ছুঁইয়াই কাজ চালায়। চোখের দরকার হয় না বলিয়াই পিঁপ্ড়েদের চোখ এত ছোট হইয়াছে।
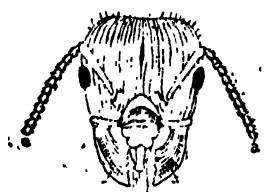
চিত্র ৪৮—পিঁপ্ড়ের মাথা।

পিঁপ্ড়ের শুঁয়ো বড় আশ্চর্য্য জিনিস। চোখ নাক ও কান দিয়া আমরা যে-সব কাজ করি, সম্ভবত উহারা শুঁয়ো দিয়াই সেই সকল কাজ চালায়। সুতরাং বলিতে হয়, পিঁপ্ড়ের চোখ কান ও নাক এই তিন ইন্দ্রিয়ই শুঁয়োতে

আছে। কোথাও এক কণা চিনি পড়িয়া থাকিতে দেখিলে পিঁপ্ড়েরা কি করে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। সে ছুটিয়া গিয়া বাসায় খবর দেয়। তার পরে দলে দলে পিঁপ্ড়ে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া মিষ্ট খাইয়া ফেলে বা তাহা বাসায় বহিয়া লইয়া যায়। পিঁপ্ড়েরা আমাদের মত কথা বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে না, সম্ভবত তাহারা শুঁয়ো নাড়িয়া দলের পিঁপ্ড়েদের কাছে খবর দেয়। পথে চলিতে চলিতে দুইটি পিঁপ্ড়ে মুখোমুখি হইলে, তাহারা দাঁড়াইয়া কি রকমে শুঁয়ো নাড়ানাড়ি করে, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? সম্ভবত এই রকমে শুঁয়ো নাড়িয়াই তাহারা পরস্পর আলাপ করে এবং দলের পিঁপ্ড়েদের চিনিয়া লয়।

পিঁপ্ড়ের মুখের চোয়াল দুইটি করাতের মত কি-রকম ধারালো তোমরা হয় ত তাহা দেখিয়াছ। ডেয়ো-পিঁপ্ড়েরা এই রকম দাঁত দিয়া কামড়াইয়া ধরিলে রক্তপাত করিয়া দেয়। ছাড়াইতে গেলে প্রায়ই ইহাদের গলা ছিঁড়িয়া যায়, কিন্তু তবুও কামড় ছাড়ে না। মাটি কাটিয়া ঘর প্রস্তুতের সময়ে ইহারা ঐ দাঁত জোড়াটা খুব কাজে লাগায়। যখন পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধে, তখন ইহারা ঐ দাঁত দিয়াই শত্রুকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে। কিন্তু ইহাই পিঁপ্ড়েদের আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র নয়। কোনো কোনো পিঁপ্ড়ের লেজের শেষে হুলও আছে। কাঠ-পিঁপ্ড়ে দাঁত দিয়া কামড়াইয়া শরীরটাকে বাঁকাইয়া ফেলে এবং ক্ষত স্থানে

বিষযুক্ত হুল বসাইয়া দেয়। যে-সকল পিঁপ্ড়ের বুক ও লেজের জোড়ের জায়গায় দুইটা করিয়া বলের মত পিণ্ড থাকে প্রায়ই তাহাদের পিছনে হুল দেখা যায়। এই সকল পিঁপ্ড়েই বিষাক্ত; ইহারা কামড়াইলে ভয়ানক জ্বালা যন্ত্রণা হয়।

দাঁত দিয়া আমরা খাবার চিবাইয়া খাই কিন্তু পিঁপ্ড়েরা সম্মুখের ঐ দু'টা দাঁত দিয়া কখনই খাবার চিবায় না। চিবাইবার জন্য ভিতর দিকে এক জোড়া ছোট দাঁত আছে এবং জিভও আছে। মিষ্ট জিনিস, ফল এবং ছোট পোকা-মাকড় পিঁপ্ড়েদের প্রধান খাদ্য। খাদ্য কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবার সময়ে উহারা সেই সাঁড়াশির মত দাঁত জোড়াটা ব্যবহার করে; কিন্তু খাদ্য মুখে দিবার পরে তাহারা ভিতরকার দাঁত ও জিভ ছাড়া আর কিছুরই ব্যবহার করে না।

অনেক পতঙ্গেরই ডানা থাকে, কিন্তু সকল পিঁপ্ড়ের ডানা হয় না। ইহাদের মধ্যে যাহারা স্ত্রী এবং পুরুষ, কেবল তাহাদেরই শরীরে ডানা দেখা যায়। কর্ম্মী পিঁপ্ড়েদের ডানা নাই। তোমরা ঘরে বাহিরে যে-সব পিঁপ্ড়েকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখ, তাহাদের সকলেই কর্ম্মী। তাই ইহাদের ডানা নাই।

কর্ম্মী পিঁপ্ড়েদের মধ্যে অনেক কাজের ভাগ আছে। কেহ বাসায় পাহারা দেয়, কেহ সৈনিকের কাজ করে, কেহ ঘর বানায়, কেহ বাহির হইতে খাবার জোগাড় করিয়া আনে,

কেহ-বা শিশু সন্তানদিগকে লালন-পালন করে। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে পিঁপ্ড়ের গাদার অসংখ্য পিঁপ্ড়ের মধ্যে কতকগুলির আকার বড় দেখিতে পাইবে,— ইহাদের মাথাগুলো যেন শরীরের তুলনায় অনেক বড়। ইহারা সৈনিক পিঁপ্ড়ে। অন্য পিঁপ্ড়ের সঙ্গে যখন লড়াই বাধে তখন উহারা মস্ত মাথার ধারালো দাঁত দিয়া লড়াই করে। সাধারণ কর্ম্মীরাই ছোট আকারে জন্মে। স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপ্ড়ের আকার কিছু বড়, কিন্তু ইহারা প্রায়ই গর্ত্ত ছাড়িয়া বাহিরে আসে না।

পিঁপ্ড়েরা কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, তোমরা জান কি? এক কথায় বলিতে গেলে ইহারা সর্ব্বভুক্। মাছ, মাংস, ফল-মূল, চাল, ডাল, ঘি, তেল, মিষ্টি, টক্ কিছুই ইহাদের অখাদ্য নয়। একবার একটা পুঁটি মাছ মাটিতে ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। পাঁচ মিনিটেই দলে দলে লাল পিঁপ্ড়ে আসিয়া মাছটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে খাইয়া শেষ করিয়াছিল। মাছের কেবল কাঁটা কয়েকটি পড়িয়াছিল। ফড়িং বা অপর পোকা-মাকড় আধমরা হইয়া মাটিতে পড়িয়া থাকিলে, পিঁপ্ড়ের দল তাহা কি রকমে খাইয়া ফেলে দেখ নাই কি? কেবল নিজের খাওয়া নয়,—বাচ্চাদের এবং বাসায় থাকিয়া যাহারা কাজ করে তাহাদের খাওয়াইবার জন্যও ইহারা খাদ্য মুখে করিয়া বাসায় লইয়া যায়।

মৌমাছিদের মত পিঁপড়েদেরও গলার নীচে থলি থাকে।

নিজের পেট ভরিলে ইহারা খাদ্য চিবাইয়া ঐ থলিতে ভরিয়া রাখে। তার পরে উহা উগ্‌লাইয়া বাচ্চাদের বা কর্ম্মীদের প্রয়োজন-অনুসারে খাইতে দেয়। ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমাদের এক-এক সমাজে হয় ত আট-দশ হাজার লোক থাকে। ইহাদের মধ্যে ধনী ও গরীব দুই রকমেরই লোক দেখা যায়। কিন্তু ধনীরা সহজে গরীবদের সাহায্য করে না। তাহারা নিজের ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয় স্বজনকে লইয়া সুখে থাকিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পিঁপ্‌ড়েদের মধ্যে এই ভাবটি একেবারে নাই। বহু কষ্টে কিছু খাবার সংগ্রহ করিয়া পিঁপ্‌ড়েরা যখন বাসার দিকে ছুটিয়া চলে, তখন পথের মাঝে যদি নিজের দলের কোনো পিঁপ্‌ড়ে শুঁয়ো নাড়িয়া খাবার চায়, তবে তাহারা তখনি গলার থলি হইতে খাবার উগ্‌লাইয়া ক্ষুধার্ত্ত পিঁপ্‌ড়েকে খাওয়াইতে থাকে। এই রকম ব্যবস্থা আছে বলিয়াই, পিঁপ্‌ড়েদের সমাজের কাজ সুন্দরভাবে চলে। যাহারা খাবার সংগ্রহ করে, তাহারা সেই খাবার আবশ্যকমত সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। যাহারা ঘর তৈয়ারি করে, তাহারা কেবল নিজের জন্য ঘর তৈয়ারি করে না, দলের সকলেই যাহাতে সুখে থাকিতে পারে, সেই দিকে নজর রাখে। যাহারা সিপাহী বা পাহারাওয়ালার কাজ করে, তাহারা দলের প্রত্যেককে রক্ষা করিবার জন্য শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করে। যাহাদের হাতে সন্তানপালনের ভার আছে, তাহারা সব কাজ ফেলিয়া দিবারাত্রি বাসার মধ্যে

থাকে এবং সর্ব্বদা ডিম ও বাচ্চাদের খোঁজ-খবর লয়। এমন সুব্যবস্থা এক মানুষের সমাজ ভিন্ন অন্য প্রাণীর সমাজে দেখা যায় না।

পিঁপ্ড়ের বাসা

পিঁপ্ড়েরা মাটির তলায় যে বাসা করে, গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার ভিতরটা বোধ হয় তোমরা দেখ নাই। বাগানের মধ্যে বা মাঠে পিঁপ্ড়েরা ভিতর হইতে মাটি তুলিয়া যে বাসা প্রস্তুত করে, তাহা খুঁড়িয়া দেখিয়ো। পিঁপ্ড়ের বাসা চিনিয়া লওয়া কঠিন নয়! একটু নজর রাখিলেই তোমরা দেখিতে পাইবে, মাঠের এক-এক জায়গায় কালো বা লাল পিঁপ্ড়েরা গর্ত্ত হইতে দাঁতে করিয়া একটু একটু মাটি উঠাইয়া তাহা গর্ত্তের মুখে গোলাকারে সাজাইয়া রাখিতেছে। পিঁপ্ড়েরা এই রকমে যে কণা কণা মাটি উঠায়, তাহাতে গর্ত্তের মুখের চারিদিক্টা যেন প্রাচীর দিয়া ঘেরা হইয়া পড়ে। তোমরা যদি এই রকম পিঁপ্ড়ের গর্ত্ত খুঁজিয়া পাও, তবে সেখানে খুঁড়িলে মাটির ভিতরে উহাদের বাসা দেখিতে পাইবে।

পিঁপ্ড়ের বাসা বড়ই অদ্ভুত। ঘরের পর ঘর থাকে-থাকে মাটির ভিতরে সাজানো দেখা যায়। যাওয়া-আসা এবং চলাফেরার জন্য অনেক পথও সেই বাসার ভিতরে থাকে। রাজাদের বা বড়লোকদের বাড়ীর ঘরগুলি বেশ সাজানো

গুছানো থাকে মাত্র, সেগুলিতে প্রায়ই কেহ বাস করে না। পিঁপ্‌ড়েদের সকল ঘরই পূর্ণ দেখিতে পাইবে। কোনো ঘরে কর্ম্মী পিঁপ্‌ড়েরা ডিমগুলিকে যত্নে রাখিয়া পাহারা দেয়। শুঁয়ো-পোকার আকারে যে-সকল বাচ্চা বাসায় থাকে, কোনো ঘরে তাহাদের যত্ন করা হয়। সেখানে অনেক কর্ম্মী পিঁপ্‌ড়ে গা চাটিয়া বাচ্চাদের শরীরের ধূলা-মাটি সাফ্ করে এবং গলার থলিতে খাবার বোঝাই করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে থাকে। কোনো ঘরে হয় ত, পুত্তলি-অবস্থায় বাচ্চারা নিজের মুখের লালায় প্রস্তুত সূতা দিয়া আপাদমস্তক ঢাকিয়া মড়ার মত পড়িয়া থাকে এবং শত শত কর্ম্মী পিঁপ্‌ড়ে পুত্তলিদের গায়ের মলা-মাটি মুছিয়া যত্ন করে।

বাসার উপর ও মাঝের তলার ঘরগুলিতে এই সকল কাজ চলে, এবং সকলেই ব্যস্ত হইয়া নিজেদের কর্ত্তব্য করিয়া যায়। কোনো উপর-ওয়ালার তাগিদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করে না।

বাসার নীচের তলাটা অনেকটা নিরিবিলি। ইহাই পিঁপ্‌ড়েদের রাণীর অন্দর মহল। কর্ম্মীদের মুখ হইতে খাবার লইয়া আহার করা এবং ধারাবাহিক ডিম-পাড়াই রাণীর কাজ। আমাদের রাণীর যেমন অনেক দাস-দাসী ও সহচরী সঙ্গে থাকিয়া রাণীর হুকুম তামিল করে, পিঁপ্‌ড়েদের রাণীর সঙ্গেও সেই রকম অনেক সঙ্গী ঘুরিয়া বেড়ায়। পিঁপ্‌ড়েদের রাণী সৌখীন নয়; কাজেই তাহার মন

জোগাইবার জন্য সঙ্গীদের বিশেষ খাটিতে হয় না। অন্দর মহলের ঘরে ঘরে বেড়াইয়া রাশি রাশি ডিম পাড়াই রাণীর একমাত্র সখ্। ডিম পাড়িবা-মাত্র রাণীর সঙ্গীরা সেগুলিকে মুখে করিয়া পৃথক্ ঘরে যত্ন করিয়া রাখিয়া দেয়। পাছে ডিম নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়েই অনেক কর্ম্মী পিঁপ্ড়ে সর্ব্বদা রাণীর পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়।

স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপ্ড়ে

রাণী প্রথমে কেবল কর্ম্মী পিঁপ্ড়ের ডিম প্রসব করে। ইহা শেষ হইলে সে কিছুদিন ধরিয়া স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপ্ড়ের ডিম পাড়িতে থাকে। এই ডিমগুলির আকার কিছু বড়। যাহা হউক, সেগুলি হইতে সম্পূর্ণ আকারে পিঁপ্ড়ে বাহির হইলে বাসার সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপ্ড়ের ডানা থাকে। তাহারা জন্মিয়াই গর্ত্তের বাহিরে আসিবার চেষ্টা করে। কর্ম্মী পিঁপ্ড়েরা জোর করিয়া তাহাদিগকে গর্ত্তের মধ্যে ধরিয়া রাখে। কিন্তু মৌমাছির চাকে যেমন স্ত্রী-মাছিদের মধ্যে ক্রমাগত ঝগ্ড়াঝাঁটি চলে, ইহাদের মধ্যে তাহা দেখা যায় না। স্ত্রী, পুরুষ এবং কর্ম্মী সকলে মিলিয়া মিশিয়া বাস করে।

যাহা হউক, বাসায় স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপ্ড়ের সংখ্যা যখন বেশি হইয়া পড়ে, তখন কর্ম্মীরা তাহাদিগকে আর আট্কাইয়া

রাখিতে পারে না। শেষে হঠাৎ এক দিন গর্ত্ত ছাড়িয়া দলে দলে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। পুরুষ-পিঁপ্ড়েরা একবার উপরে উঠিলে আর গর্ত্তে ফিরিয়া আসে না। কিছুক্ষণ উড়িলেই তাহাদের ডানা খসিয়া যায় এবং অনেকেই মরিয়া যায়; আবার কতকগুলিকে পাখী, ব্যাঙ্ প্রভৃতি কাছে পাইয়া খাইয়া ফেলে। ডানা-ওয়ালা অনেক স্ত্রী-পিপ্ড়েরও এই রকমে অপমৃত্যু হয়। কিন্তু কর্ম্মীরা সকলগুলিকে মরিতে দেয় না। তাহারা দলের স্ত্রীদের বিপদ্ দেখিলেই চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসে এবং সেই সাঁড়াসির মত দাঁত দিয়া ধরিয়া তাহাদিগকে গর্ত্তের ভিতরে লইয়া যায়। ইহার পর স্ত্রীরা আর গর্ত্তের বাহিরে আসে না। গর্ত্তের ভিতরে গিয়া উহাদের প্রত্যেকেই একএকটি রাণী হইয়া দাঁড়ায় এবং ডিম পাড়িতে সুরু করে। যে-সকল স্ত্রী-পিঁপ্ড়ে উড়িতে উড়িতে গর্ত্ত হইতে দূরে আসিয়া পড়ে, কর্ম্মীরা তাহাদের সন্ধান পায় না। ইহারা নিজেই নিজেদের ডানা কাটিয়া ফেলে এবং পরে একটি ছোট গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেখানে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। এই রকমে কখনো কখনো পিঁপ্ড়েদের এক-একটা নূতন বাসার সৃষ্টি হইয়া পড়ে।

পিঁপ্ড়ের বাসা-ত্যাগ

এক জায়গায় বহুকাল বাস করিলে, তাহা ক্রমে বাসের অনুপযুক্ত হয়। তখন হয় ত মড়ক বা অন্য কিছু উৎপাত

দেখা দিয়া সেখানকার লোকজনকে দেশ-ছাড়া করে। আমাদের দেশের অনেক পুরানো গ্রাম ও নগর এই রকমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান রাজাদের রাজধানী গৌড় এক সময়ে খুব বড় সহর ছিল। ইহা বোধ হয় তোমরা ইতিহাসে পড়িয়াছ। কিন্তু এখন তাহা জনশূন্য ঘোর জঙ্গল। গৌড়ের বড় বড় সুন্দর বাড়ী ভাঙিয়া চুরিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। এক সময়ে ভয়ানক মড়কের ভয়ে লোকজন দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছিল বলিয়াই গৌড়ের এমন দুর্দ্দশা। পিঁপ্ড়েরা মাটির নীচে যে-সকল নগরের মত বাসা বানায়, তাহাতে উহারা চিরকাল থাকিতে পারে না। বাসের একটু অসুবিধা হইলে বা কোনো রকম মড়ক দেখা দিলে, তাহারা বাসা ছাড়িয়া নূতন জায়গায় বাসা তৈয়ার করে। তোমরা এই রকম বাসা-ভাঙা পিঁপ্ড়ের দল দেখ নাই কি? বাসা ভঙার সময়ে অসংখ্য পিঁপ্ড়ে সারি বাঁধিয়া নূতন জায়গার দিকে চলে। বাসায় যে-সকল ডিম, বাচ্চা ও পুত্তলি-পিঁপ্ড়ে থাকে, সেগুলিকে তাহারা ফেলিয়া যায় না। তোমরা যদি লক্ষ্য কর তবে প্রত্যেক কর্ম্মী পিঁপ্ড়েকে তখন একএকটি সাদা জিনিষ মুখে লইয়া চলিতে দেখিবে। ঐ জিনিষগুলি পুত্তলি-পিঁপ্ড়ে। পুত্তলি-অবস্থায় পিঁপ্ড়ের বাচ্চা মড়ার মত পড়িয়া থাকে, এজন্য সেগুলিকে মুখে করিয়া লইয়া যাইতে কর্ম্মীদের কোনো কষ্ট হয় না।

আমরা এ-পর্য্যন্ত মাটির তলাকার পিঁপড়েদের কথা

বলিলাম। পৃথিবীতে প্রায় তিন হাজার রকমের পিঁপড়ে আছে। ইহাদের সকলেই মাটির তলায় বাস করে না। কেহ গাছের শুক্‌নো পাতা একত্র করিয়া বাসা বাঁধে। আবার কেহ আমাদের ফকির ও সন্ন্যাসীর মত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যেখানে-খুসি-সেখানে বাস করে,—ইহাদের স্থান বা অস্থানের জ্ঞান নাই। এই তিন হাজার পিঁপড়ের জীবনের কথা মোটামুটি এক রকম হইলেও, তাহাদের চাল-চালনে অনেক পার্থক্য আছে। কাজেই ইহাদের একটু একটু পরিচয় দিতে গেলেও একখানা প্রকাণ্ড বই লেখা দরকার হয়। আমরা এখানে অন্য পিঁপড়েদের কথা না বলিয়া আমাদের বাংলা দেশের কয়েকটি পিঁপড়ের কথা বলিব।

বাংলা দেশের পিঁপড়ে

আমরা যে-সব পিঁপড়ে দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে মোটামুটি,—(১) ডেঁয়ে (২) সুড়সুড়ে বা ধাওয়া (৩) কাঠ-পিঁপড়ে বা মেঝেল (৪) লাল-পিঁপড়ে—এই চারি জাতি দেখা যায়।

ডেঁয়েদের দাঁত খুব বড় ও ধারালো কিন্তু হুল থাকে না। কাঠ-পিঁপড়ের হুল ও দাঁত দুইই আছে,—ইহারা ভয়ানক বিষাক্ত। ধাওয়া বা সুড়সুড়ে পিঁপড়েরা বড় ভালোমানুষ তাহাদের দাঁত বড় নয় এবং হুলও থাকে না।

তোমরা ভিঁয়ে এবং লাল ক্ষুদে পিঁপ্‌ড়ে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহারা ভয়ানক রাগী ও বিষাক্ত। ডেঁয়ে, কাঠ-পিঁপড়ে এবং সুড়সুড়ে পিঁপ্‌ড়েরা প্রায়ই একা একা ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু ভিঁয়ে ও ক্ষুদে পিঁপ্‌ড়েরা তাহা করে না। ইহারা দল বাঁধিয়া চলা-ফেরা করে। জ্যান্ত কেঁচো বা আধ-মরা ফড়িং শিকার করিবার জন্য যখন ভিঁয়েরা সার বাঁধিয়া চলে তখন মনে হয় যেন, তাহারা যুদ্ধ করিতে চলিয়াছে। শিকারের সময়ে সত্যই ইহারা যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া চলে। সম্মুখে সৈনিক ও দূতেরা থাকে। তাহারা একটু আগাইয়া গিয়া কোথায় শিকার আছে বা কোথায় বিপদের সম্ভাবনা, তাহা জানিয়া লয় এবং সেই খবর দলের পিঁপ্‌ড়েদের জানায়।

রান্নাঘরে ও ভাঁড়ার ঘরে ভিঁয়েদের উৎপাত বেশি। হাঁড়ির ভিতরকার ভাজা মাছ পর্য্যন্ত ইহারা খাইয়া ফেলে। ইহাদের অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য বাড়ীর মেয়েরা দুই একটা পিঁপ্‌ড়েকে আধ্‌মরা করিয়া মাটিতে ফেলিয়া রাখেন। কয়েক মিনিটেই দলের দুই চারিটি পিঁপ্‌ড়ে সেখানে আসিয়া দাঁড়ায় এবং শুঁয়ের দিয়া আহত পিঁপ্‌ড়েকে পরীক্ষা করে। যখন দেখে সঙ্গীরা সত্যই মৃতপ্রায়, তখন তাহারা ভয় পাইয়া গর্ত্তের সকল পিঁপ্‌ড়েদের বিপদের কথা জানায়। ইহার পরে অনেকক্ষণ কোনো পিঁপ্‌ড়েই গর্ত্তের বাহিরে আসে না।

রাঙী পিঁপড়ে তোমরা দেখ নাই কি? ইহারা ভিঁয়েদের

চেয়ে ছোট, কিন্তু কম কামড়ায় না। ইহারাও একা চলে না। বর্ষাকালে দিনের বেলায় যদি একটা কেঁচো গর্ত্তের উপরে উঠে, তবে রাঙীর দল তাহাকে আক্রমণ করিয়া খাইয়া ফেলে বা খণ্ড খণ্ড করিয়া বাসায় টানিয়া লইয়া যায়। ইহারা জিঁয়েদের মত মাটির উপরে চলিতে ভালবাসে না; মাটির তলায় সুড়ঙ্গ করিয়া সারি বাঁধিয়া চলে এবং মাঝে মাঝে উপরে উঠিবার পথ রাখে। বৃষ্টির পরে ইহারা বাসার ভিতর হইতে অনেক মাটি তুলিয়া গর্ত্তের মুখে আল্ বাঁধে।

তোমরা গাছের লাল-পিঁপ্ড়ে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। এই পিঁপ্ড়েদের কেহ লাসা কেহ-বা নাল্সো বলে। বাগানের কলা পেঁপে আম প্রভৃতি বড় বড় গাছেই ইহাদের প্রধান আড্ডা। সাধারণ পিঁপ্ড়ের চেয়ে ইহারা আকারে বড়, পা ও শুঁয়ো বেশ লম্বা। বুক ও লেজের জোড়ে কেবল একটি 'বল' অর্থাৎ পিণ্ড আছে। ইহাদের লেজে হুল্ নাই। কিন্তু দাঁত সাঁড়াসির মত জোরালো। তোমরা যদি কোনো নাল্সো পিঁপ্ড়েকে বিরক্ত কর, তবে সে শুঁয়ো উঁচু করিয়া তোমাকে কামড়াইতে আসিবে। কাড়াইলে মনে হয় যেন কামড়ের জায়গাটা আগুনে পুড়িয়া গেল। ইহারা দাঁত দিয়া কামড়াইয়া কামড়ের জায়গায় একরকম পাত্লা জিনিস্ ঢালিয়া দেয়। ইহাই তাহাদের বিষ। লেজের দিকে একটা ছিদ্রে বিষ থাকে। কিন্তু ইহা মারাত্মক বিষ নয়। গায়ে লাগিলে কিছুক্ষণ খুব কষ্ট দেয়, তার পরে জ্বালা-যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

নাল্‌সো-পিঁপ্‌ড়ের বাসা হয় ত তোমরা বাগানের গাছ-পালায় দেখিয়াছ। গাছের যে-সকল সরু ডালে বেশি পাতা থাকে, তাহারি কতকগুলি তাজা পাতা মাকড়সার জালের মত সূতা দিয়া জড়াইয়া ইহারা বাসা বাঁধে। পাতাগুলি কিছুদিন বেশ তাজা থাকে, কিন্তু পরে শুকাইয়া যায়। এই রকম পাতার ঘরে নাল্‌সো-পিঁপ্‌ড়েরা ডিম, বাচ্চা ও খাবার বোঝাই করিয়া বাস করে। যদি বাসার কাছে কোনো গোলযোগ হয়, তবে তাহারা দলে-দলে ঘর হইতে বাহির হইয়া লড়াই করিবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং সারে সারে দাঁড়াইয়া শুঁয়ো নাড়িতে থাকে।

নাল্‌সো-পিঁপ্‌ড়েরা কি রকমে বাসা বাঁধে তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। ইহা বড়ই মজার। দাঁত দিয়া ধরিয়া ইহারা প্রথমে কতকগুলি কচি পাতাকে বাঁকাইয়া ফেলে। কিন্তু তাজা পাতাকে একবার বাঁকাইলে তাহা বেশি ক্ষণ বাঁকিয়া থাকে না; একটু পরেই আবার সোজা হইয়া উঠে। কাজেই এই সকল পাতা দিয়া স্থায়ী রকম ঘর প্রস্তুত করিতে হইলে, সেগুলিকে কিছু দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়। মাকড়সা বা গুঁটিপোকারা যেমন শরীরের লালা দিয়া সূতা প্রস্তুত করিতে পারে, এই পোকারা তাহা পারে না। কিন্তু ইহাদের বাচ্চারা এক রকম সূতা তৈয়ার করিতে পারে। পিঁপ্‌ড়েরা পুত্তলি-অবস্থায় এই সূতায় সর্ব্বশরীর ঢাকিয়া ঘুম দেয়। যাহা হউক, নাল্‌সো

পিঁপ্‌ড়েরা বাসার পাতাগুলিকে সূতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার জন্য তাহাদের বাচ্চাদের সাহায্য লয়। ঘর বাঁধিবার সময়ে কর্ম্মী পিঁপ্‌ড়েরা এক-একটা বাচ্চা মুখে করিয়া বাঁকানো পাতার কাছে লইয়া যায়। বাচ্চারা মুখ হইতে লালা বাহির করিয়া যেমন সরু সূতা প্রস্তুত করিতে থাকে, তেমনি অপর কর্ম্মী পিঁপ্‌ড়েরা সেই সূতা দিয়া পাতাগুলিকে বেশ শক্ত করিয়া জড়াইয়া ফেলে। নাল্‌সো-পিঁপ্‌ড়েরা কেমন ফাঁকি দিয়া ঘর বাঁধে, একবার ভাবিয়া দেখ। এমন ফন্দি মানুষের মাথাতেও হঠাৎ আসে না।

নাল্‌সো-পিঁপ্‌ড়েরা সর্ব্বভুক্ প্রাণী। শুঁয়ো-পোকা, ফড়িং, গোবরে-পোকা, প্রজাপতি প্রভৃতি সকল রকম ছোট প্রাণী শিকার করিয়া ইহারা বাসায় আনে এবং তার পরে পরমানন্দে সেগুলি সকলে ভাগ করিয়া আহার করে। আমাদের বাড়ীতে ভাণ্ডার ঘর আছে। এই ঘরে আমরা কেবল খাবার জিনিষ জড় করিয়া রাখি। নাল্‌সো-পিপ্‌ড়েরা খাবার রাখিবার জন্য গাছের পাতা দিয়া ভাণ্ডার ঘর তৈয়ার করে। এই ঘরে তাহারা বাস করে না, খাবার জিনিস রাখিয়া ঘরের চারিদিকে পাহারা দেয়।

পিঁপ্‌ড়েদের গোরু

আমরা গোরু পুষি এবং ঘাস খড় খাওয়াইয়া তাহাদিগকে যত্ন করি; তার পরে তাহারা বচ্চা প্রসব করিয়া আমাদিগকে

দুধ দেয়। পিঁপ্ড়েরা দুধ খাইবার জন্য গোরুর মত করিয়া এক রকম প্রাণী পোষে—কথাটা আশ্চর্য্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য। নাল্‌সো ও ডেঁয়ো পিঁপ্ড়েদেরই গোরু-পোষা স্বভাব বেশি দেখা যায়।

বর্ষার এবং শীতের শেষে যে সবুজ রঙের ছোট পোকা প্রদীপের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তোমরা তাহা বোধ হয় দেখিয়াছ। কপি গোলাপ শশা মূলা প্রভৃতি গাছের পাতাতে এই জাতীয় অনেক পোকা দেখা যায়। ইহাদের সকলেরই রঙ যে সবুজ হয়, তাহা নয়। এই জাতীয় মেটে ও কালো রঙের পোকাও দেখা যায়। অনেক জায়গায় এই পোকাকে জাব-পোকা বলে। লাল্‌সো পিঁপ্ড়েরা প্রায়ই জাব-পোকার ডিম আনিয়া বাসায় পালন করে। আমরা যেমন গোরু পালন করি, ঠিক সেই রকম যত্নেই উহারা পোকা পালন করে। ডিম যাহাতে নষ্ট না হয়, ডিম ফুটিলে বাচ্চারা যাহাতে প্রচুর খাবার পায় এবং বাহির হইতে শত্রু আসিয়া যাহাতে ডিম নষ্ট না করে—এই সকল বিষয়ে পিঁপ্ড়েদের খুব নজর থাকে। তাহারা কিসের জন্য এত যত্ন ও চেষ্টা করিয়া পোকা পোষে, তাহা বোধ হয় তোমরা এখনো বুঝিতে পার নাই। আমরা গোরুদিগকে খাওয়াইয়া যেমন ভাঁড়ে-ভাঁড়ে দুধ আদায় করিয়া লই, পিঁপ্ড়েরাও ঐ-সব পোকাদের কাছ হইতে মধুর মত মিষ্ট এক রকম রস আদায় করিয়া লয়।

এখানে পিঁপ্ড়েদের গোরুর একটা বড় ছবি দিলাম। কিন্তু ইহাদের প্রকৃত আকার এত ছোট যে, দশ বারোটিকে পর পর না সাজাইলে এক ইঞ্চি জায়গা জোড়া যায় না। ইহাদের সকলের ডানা গজায় না এবং পাগুলিও খুব লম্বা হয় না। এজন্য ইহারা তাড়াতাড়ি চলা-ফেরা করিতে পারে না। গাছের রসই ইহাদের প্রধান খাদ্য। তাই যে গাছে পিঁপ্ড়ের গোরু বেশি থাকে, সেই গাছ প্রায়ই মরিয়া যায়।
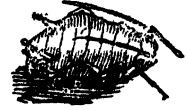
চিত্র ৪৯
পিঁপড়েদের গোরু

এখানে যে পোকাটির ছবি দিলাম, তাহার পিছনে নলের মত দুইটি অংশ দেখিতে পাইবে। এই দুইটি মধুর নল। গোরুর বাঁটে যেমন আপনা হইতেই অনেক দুধ জন্মে, পিঁপ্ড়েদের গোরুর দেহের ঐ দুইটি নলে সেই রকমে আপনিই অনেক মধু জমা হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আমগাছের পাতায় কখনো কখনো এক রকম চক্‌চকে মধু লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই মধুও এক রকম পতঙ্গের শরীর হইতে বাহির হয়। আমগাছের তলায় গেলে, এক রকম ছোট পোকাকে চড়বড় শব্দ করিয়া এক পাতা হইতে

চিত্র ৫০—পিঁপ্ড়েরা মিষ্টরস খাইতেছে

লাফাইয়া অন্য পাতায় যাইতে দেখা যায়। এক-একটি আমগাছে বোধ হয়, লক্ষ লক্ষ পোকা থাকে। এইগুলিই শরীর হইতে মধু বাহির করিয়া গাছের পাতায় লাগায়। ইহারাও পিঁপড়েদের গোরুজাতীয় প্রাণী। তোমরা যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিতে পাইবে,—যে গাছে এই পোকা বেশি থাকে, সেখানে নানাজাতীয় পিঁপড়েও দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়ায়।

দুধ সংগ্রহ করিতে হইলে আমরা গোরুকে দুহিয়া থাকি। পিঁপ্ড়েরা জাব-পোকার মধু সংগ্রহ করিবার সময়ে বড় মজা করে। মধু খাইবার ইচ্ছা হইলেই তাহারা লম্বা শুঁয়ো দিয়া পোকাদের লেজের কাছে সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করে। ইহাতে পোকাদের শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু মধু বাহির হইতে থাকে। পিঁপ্ড়েরা তাহাই পরমানন্দে চাটিয়া খাইতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পিঁপড়েরা যে পোকাগুলিকে গোরুর মত পোষে তাহা নয়, আমরা যেমন গোরুর দুধ দুহিয়া লই, উহারাও সেই রকমে মধু দুহিয়া লয়।

নাল্‌সো-পিঁপ্ড়েরা জাব-পোকাগুলিকে অতি যত্নে পালন করে। যাহাতে সেগুলি পালাইতে না পারে, তাহার জন্য জাল বুনিয়া খোঁয়াড় তৈয়ারি করে। কখনো কখনো নিজেদের বাসাতেও পোকাগুলিকে আট্‌কাইয়া রাখে। এই গোরু লইয়া এক দল পিঁপ্ড়ের সহিত আর এক দলের প্রায়ই লড়াই বাধিয়া যায়।

পিঁপ্ড়ের লড়াই

তোমরা পিঁপ্ড়ের লড়াই দেখিয়াছ কি? আমরা অনেক দেখিয়াছি। এক রাজার সঙ্গে আর এক রাজার কেন লড়াই বাধে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। প্রায়ই স্বার্থ লইয়া লড়াই বাধে। এক রাজা অন্য রাজার রাজ্যের ধন-সম্পত্তিতে লোভ করিয়া সেই রাজ্য আক্রমণ করে। ইহাতে দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া যায়। দুই দল পিঁপ্ড়ের মধ্যেও ঠিক এই কারণে লড়াই বাধে। এক দল যেই আর এক দলের অধিকারে আড্ডা করিতে যায়, অপর দল তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া হাজারে হাজারে গর্ত্ত হইতে বাহির হয় ও লড়াই সুরু করে। কুকুর ও পাখীরা যেমন পায়ে পা বাধাইয়া কামড়াকাম্ড়ি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, পিঁপ্ড়ের লড়াই কতকটা সেই রকমের। দিনের পর দিন, দুই দল পিঁপ্ড়ের মধ্যে এই রকম লড়াই চলে। এই যুদ্ধে সন্ধি হয় না। এক পক্ষ সম্পূর্ণ হারিয়া গেলে যুদ্ধ থামে।

যুদ্ধক্ষেত্রে যে-সব সৈনিক মারা পড়ে, আমরা তাহাদের দেহ আনিয়া গোর দিই বা পুড়াইয়া ফেলি। পিঁপ্ড়েরা মৃত সৈনিকের দেহ টানিয়া গর্ত্তে লইয়া যায়। কিন্তু গোর দেয় না। পিঁপ্ড়েরা মৃত দেহ পাইলে খুব আনন্দ করে এবং সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া খাইয়া ফেলে। কাণা খোঁড়া

স্বজাতীয়দের উপরেও তাহাদের দয়ামমতা নাই,—কোন নিষ্কর্ম্মা লোককে তাহারা দলে থাকিতে দেয় না। কোনো রকমে দলের পিঁপ্‌ড়ে আহত হইলে, সকলে মিলিয়া তাহাকে বাসায় টানিয়া লইয়া খাইয়া ফেলে।

তোমরা হয় ত ইতিহাসে পড়িয়াছ, অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীর সকল দেশেই মানুষ কেনা-বেচা চলিত। লোকে যাহাকে টাকা দিয়া কিনিত, তাহাকে পশুর মত খাটাইত। এক দল লোক এক দেশ হইতে মানুষ ধরিয়া আনিয়া আর এক দেশে বিক্রয় করিত। এখন পৃথিবীর কোনো দেশে মানুষ-ধরার ব্যবসায় নাই। কিন্তু পিঁপ্‌ড়েদের মধ্যে এই চুরি-বিদ্যা খুব আছে। পিঁপ্‌ড়েরা অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া হঠাৎ আর এক দলের গর্ত্তে প্রবেশ করে এবং তাহদের ডিম ও পুত্তলি চুরি করিয়া নিজেদের গর্ত্তে আনিয়া ফেলে। এই চুরি লইয়াও দুই দলে কখনো কখনো লড়াই বাধে। চুরি-করা ডিম হইতে যে পিঁপ্‌ড়ে জন্মে, সেগুলি চোর পিঁপ্‌ড়েদেরই দলভুক্ত হয়।

পিঁপ্‌ড়ের বাসা চেনা

গর্ত্ত ছাড়িয়া পিঁপ্‌ড়েরা কত দূরে দূরে বেড়ায়, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। আমরা এক রকম পিঁপ্‌ড়েকে চারি শত বা পাঁচ শত গজ দূরে বেড়াইতে দেখিয়াছি।

পিঁপ্‌ড়েদের দৃষ্টি-শক্তি খুব ভালো নয়, কিন্তু তথাপি তাহারা কখনো পথ ভুলে না। এত দূরে গিয়াও তাহারা কি রকমে নিজের গর্ত্তে আসিয়া পৌঁছায়, তাহা বড় আশ্চর্য্যজনক মনে হয়। এ-সম্বন্ধে বড় বড় পণ্ডিতেরা অনেক খোঁজ খবর লইতেছেন, কিন্তু আজও ঠিক কথাটি জানা যায় নাই। অনেকে বলেন, পিঁপ্‌ড়ের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল, তাই গন্ধ শুঁকিয়া শুঁকিয়া ইহারা নিজেদের বাসা বাহির করিতে পারে। হাজার হাজার পিঁপ্‌ড়ে একত্র থাকিলে, তাহাদের মধ্যে কোনগুলি নিজের দলের ইহাও পিঁপ্‌ড়েরা অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে। সম্ভবতঃ, এখানেও গন্ধ শুঁকিয়া পিঁপ্‌ড়েরা আপন ও পর ঠিক করিতে পারে।

ইংলণ্ডের একজন প্রধান পণ্ডিত লর্ড আভারির নাম বোধ হয় তোমরা শুন নাই। তিনি সমস্ত জীবনই কেবল পোকা-মাকড় লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় পোকা-মাকড়ের জীবনের অনেক নূতন কথা জানা গিয়াছে। তিনি একবার একটি পিঁপ্‌ড়েকে দল হইতে ছাড়াইয়া লইয়া বহুকাল পৃথক্ রাখিয়াছিলেন। এত দিনেও সে নিজের দলের কথা ভুলে নাই, ছাড়িয়া দিবামাত্র সে দলে মিশিয়া গিয়াছিল। ইহাতে মনে হয়, কেবল গন্ধ শুঁকিয়াই পিঁপ্‌ড়েরা দল চিনিয়া লয় না। কোনো পিঁপ্‌ড়ে হঠাৎ পরের দলে প্রবেশ করিলে সেখানে জায়গা পায় না। দলের পিঁপ্‌ড়েরা দুই চারিবার গায়ে শুঁয়ো বুলাইয়াই তাহাকে অন্য দলের পিঁপ্‌ড়ে বলিয়া

চিনিতে পারে এবং শেষে তাহাকে জোর করিয়া দল হইতে তাড়াইয়া দেয়।

পিঁপ্ড়ের আয়ু

লর্ড আভারি একটি পিঁপ্ড়েকে বিশেষ যত্ন করিয়া প্রায় ছয় বৎসর বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন। সুতরাং পিঁপ্ড়েরা বেশি দিন বাঁচে না বলিয়া আমাদের যে ধারণা আছে, তাহা ভুল। নিজের ইচ্ছায় চলা-ফেরা করার সুবিধা পাইলে, ইহারা সাত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

শিরা-পক্ষ পতঙ্গ

(NEUROPTERA)

উই

তোমরা সকলেই উই দেখিয়াছ। ইহারা শুক্‌নো জায়গায় বাস করিতে ভালবাসে। বাঁশ কাঠ শুক্‌নো লতা-পাতা ইহাদের খাদ্য। কিন্তু যেখানে উই বেশি থাকে, সেখানে খাতা-পত্র মোজা-কাপড় এমন কি জুতা পর্য্যন্ত তাহাদের গ্রাস হইতে রক্ষা করা যায় না। শুক্‌নো কাঠ বা বাঁশ মাটিতে পোঁতা থাকিলে, সেগুলির ভিতরে উইয়ে বাসা করে। যদি একখানা উই-ধরা বাঁশ পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাও, তবে দেখিবে, বাঁশের ভিতরে উইরা মাটি দিয়া সরু পথ ও সুড়ঙ্গ তৈয়ার করিয়াছে।

যেখানে বাঁশ বা কাঠ নাই, সেখানে উই পোকারা মাটির তলায় ঘর প্রস্তুত করে। তোমরা মাঠে নিশ্চয়ই উইদের ঢিবি দেখিয়াছ। এ-সকল ঢিবির নীচে মাটির মধ্যে উহাদের ঘরবাড়ী থাকে। বৃষ্টির জল বা রৌদ্রের তাপ যাহাতে বাসায় না লাগে, তাহারি জন্য উহারা বাসার উপরে ঢিবি করিয়া রাখে। আমাদের দেশে সাধারণ উইয়ের ঢিবি এক হাত বা দেড় হাতের বেশি উঁচু হয় না, কিন্তু আফ্রিকায় এক জাতি উইকে বারো চৌদ্দ হাত উঁচু ঢিবি বানাইয়া তাহার নীচে নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে দেখা যায়।

উই পতঙ্গজাতীয় প্রাণী, কিন্তু বোল্‌তা বা পিঁপ্‌ড়ের জাতীয় নয়। সাধারণ পতঙ্গদেরই মত ইহাদের ছয়খানা পা আছে এবং খাদ্য কাটিয়া খাইবার জন্য এবং ঘরের মাল-মসলা জোগাড় করিবার জন্য সাঁড়াশির মত দুইটা দাঁতও আছে। তা' ছাড়া এক জোড়া শুঁয়ো আছে। উইয়ের শুঁয়ো খুব লম্বা হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাদের চোখ নাই। ইঁহারা অন্ধ প্রাণী। যে-সব পোকা-মাকড়ের চোখ নাই, তাহারা আলোতে থাকিতে চায় না। উই-পোকাও আলো ভালবাসে না। যখন দেওয়াল বা মাটির উপর দিয়া যাওয়া-আসার দরকার হয়, তখন উহারা মাটি দিয়া সুড়ঙ্গ বানায় এবং সুড়ঙ্গের পথে যাওয়া-আসা করে। সুড়ঙ্গের জন্য যে মাটির দরকার হয়, তাহা উহারা দাঁত দিয়া কাটিয়া আনে এবং তাহার সহিত মুখের লালা মিশাইয়া কাদা তৈয়ারি করে। ইহা দিয়াই উইদের সুড়ঙ্গ ও বাসা তৈয়ারি হয়।

স্ত্রী, পুরুষ ও কর্ম্মী উই

পিঁপ্‌ড়ে ও মৌমাছিদের দলে যেমন স্ত্রী, পুরুষ ও কর্ম্মী আছে, উইদের মধ্যেও ঠিক তাহাই দেখা যায়। যদি কখনো উইয়ের ঢিবি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাও, তবে তোমরা সেখানে ছোট ও বড় দুই রকম উই দেখিতে পাইবে। ইহারা সকলেই কর্ম্মী। ছোট উইগুলিরই সংখ্যা বেশি।

ইহারা ঘর-দুয়ার তৈয়ারি প্রভৃতি পরিশ্রমের কাজ করে। বড় উইগুলি সৈনিক ও পাহারা-ওয়ালা। দেহের তুলনায় ইহাদের মাথা যেন একটু বড় এবং সম্মুখের দাঁতগুলি লম্বা। ছোট কর্ম্মী উইদের মধ্যে পাহারা দেওয়াই ইহাদের কাজ। বাহির হইতে কোনো শত্রু আসিয়া পড়িলে, ছোট কর্ম্মীর দল নিরাপদ জায়গায় লুকাইয়া পড়ে। তখন কেবল সৈনিকেরাই তাহাদের সেই ধারালো দাঁত দিয়া শত্রুকে তাড়া করে। ইহাদেরও চোখ নাই। কোথায় শত্রু আছে, তাহা বোধ হয় শুঁয়ো দিয়াই ইহারা জানিতে পারে। কে শত্রু এবং কে মিত্র, তাহা বুঝিয়া লইতে ইহারা কখনই ভুল করে না।

স্ত্রী ও পুরুষ উই বোধ হয় তোমরা দেখ নাই। এক-একটি ঢিবিতে কেবল একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী উই থাকে। ইহাদিগকে উইদের রাজা ও রাণী বলা যাইতে পারে। মাটির ভিতরকার বাসার সকলের নীচের ঘরে রাজা ও রাণী বাস করে। রাণী-উইকে দেখিতে অতি বিশ্রী। সাধারণ উই কত বড় তাহা তোমরা দেখিয়াছ। রাণীর আকার তাহারি ত্রিশ হাজার গুণ বড়। দেহে পা শুঁয়ো প্রভৃতি সকল অঙ্গই থাকে। কিন্তু সেগুলি দেহের তুলনায় এত ছোট যে দেখাই যায় না। এক-একটা প্রকাণ্ড উদর লইয়াই ইহাদের দেহ। এই পেটে অসংখ্য ডিম থাকে এবং প্রতি মিনিটে ইহারা ষাট্ বা সত্তরটা ডিম পাড়ে।

রাজা অর্থাৎ পুরুষ-উইদের শরীর রাণীর মত বড় না হইলেও, সাধারণ উইয়ের চেয়ে অনেক বড়। এখানে রাজা, রাণী ও কর্ম্মী উইদের ছবি দিলাম। সাধারণ উইয়ের চেয়ে
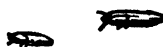
চিত্র ৫১—'ক' উইয়ের রাণী, 'খ' পক্ষযুক্ত উই, 'গ' উই, 'ঘ' ডিম্ব

রাজা ও রাণী কত বড়, তাহা ছবিটি দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে। আকারে বড় হইলেও, রাজা ও রাণীর মত অক্ষম প্রাণী পৃথিবীতে দেখা যায় না। তাহাদিগকে একই ঘরে মড়ার মত যাবজ্জীবন পড়িয়া থাকিতে হয়। মোটা দেহ লইয়া তাহারা একটুও নড়াচড়া করিতে পারে না। এজন্য অনেক কর্ম্মী ও সৈনিক উই দিবারাত্রি রাজা-রাণীকে যত্ন করে এবং ডিম পাড়া হইলে সেগুলিকে মুখে করিয়া অন্য

ঘরে লইয়া যায়। ক্ষুধার সময়ে কর্ম্মীরাই রাজা-রাণীর মুখে খাবার তুলিয়া দেয়।

পাছে রাজা বা রাণী পলাইয়া যায়, এই ভয়ে কর্ম্মী-উইরা রাজার ঘরের দরজা কাদা দিয়া এমন ছোট করিয়া তৈয়ারি করে যে, রাজা-রাণী ইচ্ছা করিলে কখনই ঘরের বাহিরে আসিতে পারে না। পাখী, ব্যাঙ্, টিক্‌টিকি ও ইঁদুর উইয়ের পরম শত্রু। ইহাদের অত্যাচারে প্রতিদিনই হাজার হাজার উই মারা যায়। উইদের রাণী ক্রমাগত ডিম পাড়িয়া এই ক্ষয়ের পূরণ করে। এই জন্যই বাসার সকল উই রাজারাণীকে খুব যত্নে রাখে এবং কোনোখানে পলাইতে দেয় না।

উইয়ের ঘরকন্না

বোল্‌তা, মৌমাছি ও পিঁপ্‌ড়েরা কেমন দল বাঁধিয়া বাস করে এবং বাসার কাজকর্ম্ম কেমন ভাগ করিয়া চালায়, তাহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। উইদের মধ্যে ঠিক সেই রকম কর্ম্ম-বিভাগ আছে। বাসার সমস্ত উই দলে দলে বিভক্ত হইয়া, কেহ খাবার আনিতে যায়, কেহ ঘর প্রস্তুত করে এবং কেহ ডিম ও বাচ্চাদের যত্ন লয়। কর্ম্মীরা সঙীন্-ওয়ালা সিপাহীর মত বাসার ভিতরে এবং বাহিরে পাহারা দেয়। ইহারা পাহারার কাজে এমন মজবুত যে, বাহির হইতে কোনো শত্রু ভিতরে আসিয়া হঠাৎ কোনো ক্ষতি

করিতে পারে না। পিঁপ্‌ড়ে বা অন্য পোকা-মাকড় বাসার কাছে আসিলেই, সৈনিকদের সহিত তাহাদের লড়াই বাধিয়া যায়। ইহাতে উইয়েরাই জয়লাভ করে।

উইয়ের বাসা

উইয়েরা মাটির তলায় যে বাসা তৈয়ারি করে, তোমরা যদি সুবিধা পাও তবে তাহা পরীক্ষা করিয়ো। পিঁপ্‌ড়েদের বাসার মত ইহা কেবল মাটি দিয়া প্রস্তুত নয়। নরম বা পচা কাঠ দাঁতে কুরিয়া এবং তাহার সহিত মুখের লালা ও মাটি মিশাইয়া ইহারা এক রকম কাদার মত জিনিস প্রস্তুত করে। ইহাই উইদের বাসা প্রস্তুতের মসলা। পিঁপ্‌ড়ের বাসা মাটি খুঁড়িয়া পরীক্ষা করিতে গেলে, তাহা ভাঙিয়া-চুরিয়া নষ্ট হয়। উইয়ের বাসার মাল-মসলা শক্ত বলিয়া, তাহা ঐ-রকমে সহজে ভাঙে না। স্পঞ্জের গায়ে কত ছোট ছিদ্র থাকে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। উইয়ের বাসা কতকটা স্পঞ্জের মত ছিদ্রযুক্ত, কিন্তু ছিদ্রগুলি কিছু বড়। এইগুলিই উইদের ঘর ও বাসায় যাইবার পথ।

উইয়ের বাসাগুলি এক একটা নগরের মত,—তাহাতে যে কত বড় বড় রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, তাহার হিসাবই হয় না। ঘরের সংখ্যাও অনেক। কোনো ঘরে ডিম বোঝাই থাকে, কোনো ঘরে বাচ্চাদের লালন-পালন করা হয়। আবার কতকগুলি ঘরের দেওয়ালে ও সুড়ঙ্গের

গায়ে চাষ-আবাদের কাজ চলে। এক রকম ছোট ব্যাঙের ছাতা উইয়েরা খাইতে বড় ভালবাসে। আমরা যেমন জমিতে সার দিয়া ধান, গম, ছোলা, মটর প্রভৃতি আবাদ করি, উহারা সেই রকমে ঘরের ও সুড়ঙ্গের দেওয়ালে ব্যাঙের ছাতার বীজ বুনিয়া চাষ করে। উইয়ের বাসা খুঁড়িয়া বাহির করিলে সেখানে ঐ-রকম ব্যাঙের ছাতা অনেক দেখা যায়। যে ছোট প্রাণী মানুষের মত চাষ-আবাদ করিতেও জানে, তাহারা কত বুদ্ধিমান্ একবার ভাবিয়া দেখ।

রাজা-রাণীর জন্ম

উইয়েরা সাধারণতঃ আকারে খুবই ছোট, কিন্তু তাহাদের রাজা ও রাণী কিপ্রকারে হঠাৎ বড় আকার লইয়া জন্মে, এখন তোমাদিগকে তাহারি কথা বলিব। রাণী সমস্ত জীবন ধরিয়া যে গাদা গাদা ডিম পাড়ে, তাহার সকলগুলি হইতে ছোট কর্ম্মী উই জন্মে না। কতক ডিম হইতে পুরুষ এবং স্ত্রী বাচ্চাও বাহির হয়। কর্ম্মীরা নির্দ্দিষ্ট আকারের বেশি বড় হয় না। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রীর দল শীঘ্র শীঘ্র পুত্তলি-অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ উই হইয়া দাঁড়াইলে, তাহাদের প্রত্যেকের দুইটি করিয়া চোখ এবং চারিখানা ডানা গজাইয়া উঠে। ডানা বাহির হইলে পুরুষ ও স্ত্রী উইয়েরা আর ঘরে থাকিতে চায় না। তখন তাহারা দল বাঁধিয়া বাসার বাহিরে আসে এবং উড়িতে আরম্ভ করে। কোনো কোনো দিন

বৃষ্টির পরে যে বাদল-পোকা আকাশে উড়িতে দেখা যায়, তাহারাই সেই ডানাওয়ালা স্ত্রী ও পুরুষ উই।

দেহে চারিখানা করিয়া ডানা থাকিলেও, ভারী শরীর লইয়া পুরুষ ও স্ত্রী উইয়েরা বেশিক্ষণ আকাশে উড়িতে পারে না। কাজেই তাহাদিগকে মাটিতে নামিতে হয় এবং নামিলেই ডানা ছিঁড়িয়া যায়। পাখী, পিঁপ্‌ড়ে, টিক্‌টিকি ও ব্যাঙেরা এই সকল উইয়ের পরম শত্রু। মাটিতে পড়িবামাত্র তাহাদের অনেকে ঐ-সকল শত্রুর হাতে মারা যায়; আবার কতক আগুনে পুড়িয়া বা জলে ডুবিয়া মারা পড়ে। এই রকমে ডানাওয়ালা স্ত্রী ও পুরুষ-উইদের অনেকেরই জীবন শেষ হইয়া যায়। কেবল যেগুলি দৈবাৎ কর্ম্মী উইদের সম্মুখে পড়ে তাহাদের মধ্যে দুই চারিটি বাঁচিয়া থাকে। কর্ম্মীরা একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রী-উইকে মুখে করিয়া মাটির তলার বাসায় লইয়া যায় এবং শেষে সেই দুটির একটিকে রাণী এবং অপরটিকে রাজা বলিয়া মানিয়া, তাহাদিগকে পৃথক্ ঘরে আট্‌কাইয়া রাখে। এই রাণীই পরে বড় হইয়া রাশি রাশি ডিম পাড়ে।

তোমরা উইয়ের ডানা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। গাছের পাতার শিরা-উপশিরার মত ইহাদের ডানাতে শিরা দেখিতে পাইবে। এইজন্য উইকে শিরা-পক্ষ পতঙ্গ বলা হয়।

জল-ফড়িং

তোমরা এই পোকা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। পুষ্করিণী বা অন্য জলাশয়ের ধারে ইহাদিগকে অনেক দেখা যায়। জলে যদি বাঁশ বা কাঠ পোঁতা থাকে, তবে ইহারা ডানা মেলিয়া সেগুলির উপরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কখনো কখনো জলাশয় হইতে দূরেও জল-ফড়িংকে উড়িতে দেখা যায়। চিল শকুনি আকাশে ডানা মেলিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহাদিগকেও সেই রকমে অবিরাম উড়িয়া বেড়াইতে দেখা যায়। ইহারা মৌমাছির মত কখনই ডানা গুটাইতে পারে না।

এখানে জল-ফড়িঙের একটা ছবি দিলাম। আমরা
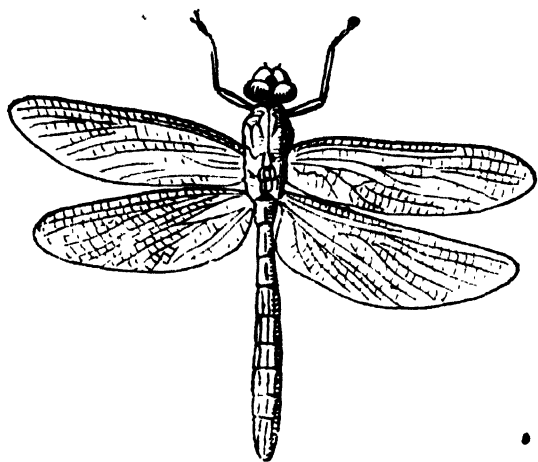
চিত্র ৫২—জল-ফড়ং

কোন্ পোকাকে জল-ফড়িং বলিতেছি, ছবি দেখিলেই তোমরা

বুঝিতে পারিবে। অনেক জায়গায় ইহাদিগকে জল-ঝিঁঝি বা ঝিঁজি বলে। সত্যই ইহারা ঝিঁজি নয়। পুরুষ ও স্ত্রী-উইয়ের ডানায় যেমন শিরার মত দাগ কাটা থাকে, ইহাদের ডানাতেও সেই রকম দাগ থাকে। ডানাগুলি খুব পাত্‌লা ও স্বচ্ছ। এইজন্য জল-ফড়িংকে উইয়ের দলের শিরা-পক্ষ পতঙ্গ বলা হয়। কিন্তু উইয়ের মত ইহারা দলবদ্ধ হইয়া কখনই বাস করে না।

জল-ফড়িং আকারেও নিতান্ত ছোট হয় না। এক একটি দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। ইহাদের গায়ের রঙ্‌ লাল হল্‌দে সবুজ নানা রকম দেখা যায়। মাথাটা প্রায়ই শরীরের তুলনায় বড় এবং চোখ দুটাও প্রকাণ্ড হয়। একএকটা চোখ প্রায় বারো চৌদ্দ হাজার ছোট চোখ লইয়া প্রস্তুত। সুতরাং বলিতে হয়, ইহাদের আটাশ হাজার চোখ আছে। অনেক পতঙ্গেরই এই রকম হাজার হাজার চোখ আছে, কিন্তু জল-ফড়িঙের চোখ অন্যদের চোখের চেয়ে অনেক উন্নত। আমাদের মাথায় দুটা বড় বড় চোখ আছে, কিন্তু এই চোখের গঠন এমন খারাপ যে, তাহা দিয়া খুব কাছের বা খুব দূরের জিনিস দেখিতে গেলে মুস্কিলে পড়িতে হয়। আমরা চোখের খুব কাছে বই রাখিয়া পড়িতে পারি না, আবার দশ হাত দূরে বই রাখিয়াও অক্ষর চিনিতে পারি না। জল-ফড়িঙের মাথার দুই ধারে যে দুই-গাদা চোখ বসানো আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি দিয়া উহারা কাছের জিনিস দেখে এবং

আর কতকগুলিকে দূরের জিনিস দেখিবার সময়ে কাজে লাগায়। কাজেই অন্য পোকাদের চেয়ে ইহাদের দৃষ্টি-শক্তি অনেক বেশি।

উইয়েরা গাছ-পালা ও বাঁশ-খড় খায়। জল-ফড়িং উহাদের মত প্রাণী হইয়াও কিন্তু নিরামিষ খাবার ছোঁয় না। ছোট ছোট পোকা ও মশা-মাছি ইহাদের প্রধান খাদ্য। উড়িবার সময়ে ইহারা কেবল ছোট পোকারই সন্ধান করে। কাছে কোনো পোকাকে উড়িতে দেখিলে জল-ফড়িংরা তাহার উপরে চিলের মত ছোঁ মারে এবং ছয়খানা পা দিয়া তাহাকে আট্‌কাইয়া ফেলে। তার পর উড়িতে উড়িতেই শিকারটিকে দাঁত দিয়া পিষিয়া ফেলে। ইহাদের পা-গুলি মুখের খুব কাছে সাজানো থাকে, এজন্য শিকার ধরিয়া মুখে গুঁজিয়া দিবার খুব সুবিধা হয়। কিন্তু এই পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইবার কাজ চলে না। জল-ফড়িং কখনই পিঁপ্‌ড়ে, বোল্‌তা বা উইয়ের মত হাঁটিতে পারে না। গোরুর গাড়ীর পিছনটা যদি সাম্‌নের চেয়ে ভারী হয়, তবে গাড়ী ওলা হইয়া যায়। তখন গাড়ী আর চালানো যায় না। জল-ফড়িঙের মাথা ও বুকের চেয়ে লেজের অংশটা বেশি ভারী। এইজন্য হাঁটিয়া বেড়াইতে গেলে, তাহাদের লেজ মাটিতে লুটাইতে থাকে। কাজেই, তাহাদের হাঁটিয়া চলা একেবারে অসম্ভব। তোমরা এইবার যখন জল-ফড়িং দেখিবে, তখন উহাদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা সকলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো।

কাক, শালিক প্রভৃতি পাখীরা যখন উড়িতে উড়িতে বামে, ডাহিনে বা পিছনে যাইতে চায়, তখন আগে মুখটাকে সেই দিকে ফিরায়, তার পরে সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া চলে। জল-ফড়িং বামে বা ডাইনে যাইবার সময়ে সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া উড়ে না,—অনায়াসে পাশা-পাশি উড়িয়া বেড়াইতে পারে। হাল ঘুরাইয়া যেমন নৌকাকে যে-দিকে খুসি চালানো যায়, লম্বা লেজে মোচড় দিয়া উহারা সেই রকমে যে-দিকে-ইচ্ছা যাওয়া-আসা করে।

জল-ফড়িঙের জীবনের কথা বড়ই অদ্ভুত। বাচ্চা অবস্থায় ইহারা খাল বিল বা পুষ্করিণীর জলে বাস করে, তার পরে ডানাযুক্ত সম্পূর্ণ পতঙ্গ হইয়া দাঁড়াইলে জল ছাড়িয়া আকাশে উড়িয়া বেড়ায়। স্ত্রী-জল-ফড়িং কখনই ডাঙায় ডিম পাড়ে না। প্রসবের সময় হইলে ধীরে ধীরে উড়িয়া পুঁকুরের ধারে যায় এবং জলে-পোঁতা কোন বাঁশ বা কাঠ বাহিয়া জলে ডুব দেয়। তার পরে জলের তলায় শেওলার গায়ে বা কাদার মধ্যে ডিম পাড়িয়া আবার উপরে উঠিয়া আসে। কখনো কখনো আবার জলের উপরকার লতা-পাতায় বসিয়াই ইহারা ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলি আপনা হইতেই জলে পড়িয়া ডুবিয়া যায়।

যাহা হউক, জলে ডিম পাড়ার পর জল-ফড়িং আর ডিমের খবর লয় না। সেগুলি জলের তলায় থাকিয়া আপনা হইতেই ফুটিয়া যায় এবং প্রত্যেক ডিম হইতে এক একটা

বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চারা ছয়খানা পা এবং এক কিম্ভূত-কিমাকার মুখ লইয়া জন্মে। মুখের নীচেকার ওষ্ঠখানি এত লম্বা থাকে যে, দেখিলেই মনে হয়, যেন সেটা একখানি প্রকাণ্ড হাত। এই ওষ্ঠ সাধারণ অবস্থায় মাথার নীচে গুটানো থাকে। কাছে ছোটখাটো জলের পোকা বা মাছ দেখিলেই উহারা সেই ওষ্ঠ বাড়াইয়া শিকারগুলি ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করে।

জল-ফড়িঙের উৎপাতে ডাঙার পোকা-মাকড় যেমন অস্থির থাকে, উহাদের বাচ্চাদের উপদ্রবে জলের পোকা-মাকড়দেরও সেই রকম ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়।

জলে বাস করিতে গেলে জল হইতে অক্সিজেন্ টানিয়া লওয়া দরকার, নচেৎ জলের প্রাণী বাঁচে না। এই কথাটা তোমাদিগকে বার বার বলিয়াছি। মাছ, কাঁকড়া প্রভৃতির শরীরে সেই জন্য কান্‌কো থাকে। কান্‌কোর উপর দিয়া জল চলিতে থাকিলে, জলে-মিশানো অক্সিজেন্ রক্তের সহিত মিশিতে পারে। কিন্তু জল-ফড়িংদের বাচ্চার দেহে কান্‌কো থাকে না। ইহাদের দেহে লেজ হইতে আরম্ভ করিয়া মুখ পর্য্যন্ত একটা নল আছে। লেজের ছিদ্র দিয়া জল টানিয়া তাহারা সেই জল ক্রমাগত মুখ দিয়া বাহির করিতে থাকে। এদিকে আবার এই বড় নলের সঙ্গে অনেক ছোট নলের যোগ থাকে। এই ব্যবস্থায় জলের অক্সিজেন্ ঐ-সকল সরু নলের দ্বারা শরীরের সকল অংশে ছড়াইয়া পড়ে।

জল-ফড়িঙের বাচ্চারা এই রকমে প্রায় এক বৎসর জলের তলায় বাস করে। কিন্তু ইহারা অন্য পতঙ্গের মত পুত্তলি-অবস্থায় মড়ার মত পড়িয়া থাকে না। এক বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই ইহাদের গায়ের চামড়ার নীচে ডানা গজাইতে আরম্ভ হয়। তার পরে ধীরে ধীরে ইহারা সম্পূর্ণ জল-ফড়িঙের চেহারা পায়। এই অবস্থায় ইহারা আর জলে ডুব দিয়া থাকিতে চায় না। জলের কোনো গাছ-পালা আঁক্‌ড়াইয়া আস্তে আস্তে উপরে আসে এবং জোর করিয়া গায়ের ছাল ছিঁড়িয়া সম্পূর্ণ জল-ফড়িঙের আকারে উড়িতে আরম্ভ করে।

যাহারা বাচ্চা অবস্থায় এক বৎসর জলের তলায় বাস করে, তাহারা সম্পূর্ণ পতঙ্গের আকারে পাঁচ সাত বৎসর বাঁচিবে, ইহাই আমাদের মনে হয়। কিন্তু জল-ফড়িং সম্পূর্ণ আকারে বেশি দিন বাঁচে না। সম্ভবতঃ দুই তিন মাসেই উহারা মারা যায়।

ভুঁই-কুমীর

তোমরা এই পোকাদের জীবনের কথা বোধ হয় জান না। ইহাদিগকে তোমরা দেখিয়াছ কি না, তাহাও জানি না। বাংলা দেশের অনেক জায়গাতেই কিন্তু ভুঁই-কুমীর দেখা যায়। এই পোকার ইংরাজি নাম Ant Lion অর্থাৎ পিঁপ্ড়েদের সিংহ। বাংলা দেশের কতক কতক অংশে ইহাদিগকে ভুঁই-কুমীর বলা হয়। তাই আমরা ইহাদিগকে ভুঁই-কুমীর নাম দিলাম।

ভুঁই-কুমীর, জল-ফড়িং পোকাদের জ্ঞাতি, অনেক সময়ে ইহাদিগকে জল-ফড়িং বলিয়াই ভুল হয়। কারণ জল-ফড়িঙের মত ইহাদের চারিখানি পাত্‌লা শিরাযুক্ত ডানা থাকে, শরীর-খানাও সেই রকমের লম্বা কিন্তু আকারে ছোট। ইহারা দিনের বেলায় বড় বাহির হয় না। রাত্রিই ইহাদের চরিয়া বেড়াইবার সময়। কখন কখন রাত্রিতে প্রদীপের কাছে আসিয়া ইহারা ডানা ঝট্‌পট্‌ করে।

যাহা হউক, ভুঁই-কুমীরের ইতিহাস বড় মজার। ইহারা জলে ডিম পাড়ে না; ধূলা বা বালির উপরে ডিম পাড়িয়া

উড়িয়া যায়। ডিম হইতে শীঘ্রই বাচ্চা বাহির হয়। এই বাচ্চাদের চেহারা বড় অদ্ভুত। এখানে একটা ভুঁই-কুমীরের বাচ্চার ছবি দিলাম। ছবিতে মুখের সম্মুখে এক-জোড়া প্রকাণ্ড বাঁকানো দাঁত দেখিতে পাইবে। চেহারাটাও কতকটা কুমীরের মত। বোধ হয় এইজন্যই ইহাদিগকে ভুঁই-কুমীর নাম দেওয়া হয়। ইহারা শুক্‌নো বালি, মাটি, বা ধূলাতে বোতলে তেল-ঢালার ফনেলের মত এক-একটা গর্ত্ত করিয়া লুকাইয়া থাকে। আমরা বীরভূম জেলার বেলে মাটির ধূলায় এই পোকাদের গর্ত্ত যে কত দেখিয়াছি, তাহা গুণিয়া শেষ করা যায় না। গর্ত্ত খুঁড়িবার সময়ে ইহারা নরম বালিতে মাথা ডুবাইয়া সমস্ত দেহটাকে ঘুরাইতে থাকে। ইহাতে গুঁড়ো বালি-মাটি সরিয়া গেলে, ছোট পেয়ালার মত একটি গোলাকার গর্ত্ত হইয়া পড়ে। এই গর্ত্তের সব দিক্‌ই খুব ঢালু থাকে। ভুঁই-কুমীরের বাচ্চারা ইহারি তলায় সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ঢাকিয়া চুপ্‌ করিয়া পড়িয়া থাকে। কোনো নূতন জিনিস দেখিলে, তাহা হাতে করিয়া
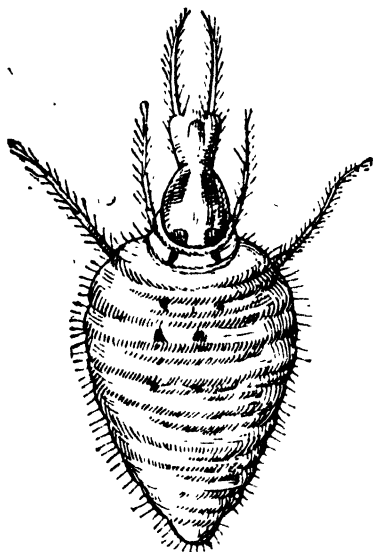
চিত্র ৫৩—ভুঁই-কুমীরের বাচ্চা

নাড়াচাড়া করা ছোট ছেলেপিলেদের একটা বিশেষ স্বভাব। পিঁপ্‌ড়েদেরও এই রকম স্বভাব দেখা যায়। কোনো জিনিস সম্মুখে পড়িলে উঁকি মারিয়া বা দুই চারিবার শুঁয়ো বুলাইয়া তাহা না-দেখিলে তাহাদের যেন তৃপ্তি হয় না। পথের মাঝে পেয়ালার মত এক একটা গর্ত্ত দেখিলেই, পিঁপ্‌ড়েরা তাহা উঁকি মারিয়া দেখিতে চায় এবং ইহাতে প্রায়ই পা ফস্‌কাইয়া গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া যায়। এই রকমে একবার গর্ত্তের ভিতরে পড়িলে আর রক্ষা থাকে না। গর্ত্তের তলায় বালির মধ্যে ভুঁই-কুমীরের যে বাচ্চা লুকাইয়া থাকে, সে চট্‌ করিয়া বাহির হইয়া তাহার সাঁড়াশির মত দাঁত দিয়া পিঁপ্‌ড়েকে ধরিয়া ফেলে। পিঁপ্‌ড়েরা পলাইবার জন্য খুবই চেষ্টা করে এবং কখনো কখনো শত্রুর হাত হইতে ছাড়াও পায়, কিন্তু তখনি তাহাদিগকে আবার ধরা দিতে হয়। গর্ত্তের চারিদিকে যে ঢালু বালি-মাটি থাকে, তাহার উপর দিয়া উঠিতে গেলেই পিঁপ্‌ড়েদের পা পিছ্‌লাইয়া যায়। কাজেই, তখন গড়াইতে গড়াইতে তাহারা আবার শত্রুর মুখের গোড়ায় আসিয়া হাজির হয়।

ভুঁই-কুমীরের বাচ্চারা পিঁপ্‌ড়ে বা অপর শিকারগুলিকে চিবাইয়া খায় না; দাঁত দিয়া ধরিয়া শরীরের সার অংশটা শুষিয়া লয় এবং খোলাটি ফেলিয়া দেয়।

যাহারা ফাঁদ পাতিয়া শিকার করে, তাহাদের অদৃষ্টে সকল দিন শিকার জুটে না। ভুঁই-কুমীরদের অদৃষ্টে প্রায়ই

তাহা ঘটে ; শিকার না পাইলে তাহাদিগকে উপবাসী থাকিতে হয়। সপ্তাহে প্রায়ই দুই-তিন দিন, ইহারা কিছু না খাইয়া কাটায়। অন্য পতঙ্গদের বাচ্চার মত ইহারা পেটুক নয়, তাই এত অল্প খাইলেও ইহাদের কোনো ক্ষতি হয় না।"

পাখীর গায়ের উকুন

তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পাখী পুষিয়া থাক, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, পাখীরা এক রকম উকুনের উৎপাতে অস্থির হয়। কেবল পোষা পাখী নয়,—সকল পাখীর গায়েই এই উকুন দেখা যায়। উকুন তাড়াইবার জন্য পাখীরা ধূলা গায়ে মাখে; কখনো কখনো আবার জলে স্নান করে। পোষা পাখীর গায়ের উকুন মারিবার জন্য আমরা পাখীকে রস্থন খাওয়াই এবং হলুদ দিয়া স্নান করাই।

পাখীর গায়ের উকুন এবং আমাদের মাথার উকুন এক রকমের পতঙ্গ নয়। সাধারণ উকুন আমাদের মাথার রক্ত শুষিয়া খায়। পাখীদের উকুন দাঁত দিয়া গা কাটিয়া আহার করে, ইহাতে গায়ে ঘা হয়। গায়ের পালকের মধ্যে আশ্রয় না লইলে ইহারা বাঁচে না। এইজন্য পাখী মরিয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে উকুনগুলাও মারা যায়।

এই উকুনেরা উইদের মত প্রাণী, কিন্তু ইহাদের ডানা থাকে না; এক জায়গা হইতে অন্য জায়গা যাইবার ক্ষমতা নাই। গায়ের পালকের উপরে তাহারা ছোট ছোট ডিম পাড়ে। পাখীর গায়ের গরমে সেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়।

তোমাদের পোষা পাখীর গায়ে যদি এই রকম উকুন হয়, তবে অল্প পরিমাণে নারিকেল তেল তাহার পালক ও গায়ে মাখাইয়া দিয়ো। উকুন পতঙ্গজাতীয় প্রাণী। ইহাদের গায়ে নিশ্বাস টানিবার ছিদ্র আছে। তেলে সেই সকল ছিদ্র বন্ধ হইয়া গেলে উকুনরা নিশ্বাস ফেলিতে না পারিয়া মারা যায়।

কঠিন-পক্ষ পতঙ্গ

(COLOEPTERA)

এই দলে এত নানা রকম পতঙ্গ আছে যে, তাহার হিসাব করাই কঠিন। গোবরে-পোকার মত বড় পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া উকুন ও ঘুণের মত ছোট পোকা পর্য্যন্ত সকলেই এই দলে আছে। ইহাদের শরীর কি রকম, তাহা আগেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। এই পতঙ্গদের প্রায় সকলেরই চারিখানি করিয়া ডানা থাকে। উপরকার দুখানা ডানা হাড়ের মত শক্ত। তার নীচেই দুখানা পাত্‌লা ডানা থাকে। উপরকার শক্ত ডানা উড়িবার কাজে লাগে না। ইহা নীচের পাত্‌লা ডানা এবং শরীরটাকে ঢাকিয়া রাখে।

সাধারণ পতঙ্গদের মতই ইহাদের ডিম হইতে শুঁয়ো-পোকার আকারে বাচ্চা হয় এবং তাহাই পুত্তলি-অবস্থায় থাকিয়া ডানাওয়ালা সম্পূর্ণ পতঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাদের সকলেই ডাঙায় বাস করে না। কয়েক জাতি কঠিন-পক্ষ পতঙ্গ জলের মধ্যে থাকিয়া বড় হয় এবং মাঝে মাঝে জল হইতে উঠিয়া ডাঙায় চলা-ফেরা করে।

এই পতঙ্গদের ডিম হইতে যে শুঁয়ো-পোকার আকারের বাচ্চা হয়, তাহাদের গায়ে প্রায়ই শুঁয়ো হয় না।

গোবরে পোকা

গোবরে পোকার দল কঠিন-পক্ষ পতঙ্গদের মধ্যে প্রধান। আমাদের দেশে এই জাতের পোকা যে কত রকম আছে, তাহার হিসাব হয় না। ইহাদের শরীর জল-ফড়িং প্রভৃতির মত লম্বা হয় না। গোলাকার গোবরে পোকাই বেশি দেখা যায়। ইহাদের মাথার উপরটা হাড়ের মত শক্ত এবং ধারালো আবরণে ঢাকা থাকে। আমরা যেমন খুরপি বা নিড়ানি দিয়া মাটি খুঁড়ি, উহাদের মধ্যে অনেকেই মাথার উপরকার সেই ধারালো আবরণ দিয়া সেই রকমে মাটি কাটিতে পারে।

মাথা, বুক ও লেজ লইয়াই পতঙ্গদের দেহ। গোবরে পোকার শরীরে এই তিনটা ভাগ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। লেজটা তাহাদের শক্ত ডানার আবরণে প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে। তা ছাড়া যে দুখানা পাত্‌লা ডানায় ভর দিয়া তাহারা রাত্রিতে ভোঁ-ভোঁ করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহা ঐ কঠিন ডানা দুখানিরই তলায় লুকানো থাকে। এই রকমে গোবরে পোকার মাথা, বুক ও লেজ সকলি কঠিন আবরণে ঢাকা দেখা যায়। এইজন্যই যখন প্রদীপের কাছে আসিয়া ভয়ানক উৎপাত করে, তখন বিশেষ আঘাত না দিলে ইহারা মরে না।

গোবরে পোকার পা কয়েকটি সাধারণ পতঙ্গদের পায়ের মত দুর্ব্বল নয়। কেবল পায়ে ঠেলিয়া ইহারা গোবরের বড় বড় গোলা কি-রকমে বাসার দিকে লইয়া যায় তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। পায়ে বিলক্ষণ জোর না থাকিলে এই রকমে গোবরের গোলা ঠেলিয়া লওয়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য হইত। পরপৃষ্ঠায় একটি গোবরে পোকার ছবি দিলাম। ইহার মাথা বুক এবং লেজ কেমন শক্ত আবরণে ঢাকা থাকে, ছবি দেখিলেই তোমরা তাহা বুঝিবে।

গোবরে পোকাদের অনেকেরই জীবনের কথা প্রায় এক রকম। কোনো জায়গায় গোবর বা অপর ময়লা জিনিস পড়িয়া থাকিলে দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে ছোট বড় ও মাঝারি অনেক পোকা সেখানে হাজির হয়। ছোট পোকারা প্রথমে সেই ময়লা জিনিস পেট ভরিয়া খায়; একটুও ঘৃণা করে না। পরে মাথায় লাগানো সেই খুরপির মত অস্ত্র দিয়া সেই সব ময়লার নীচে গর্ত্ত করে। শেষে সেগুলি গর্ত্তের ভিতরে বোঝাই দেয়। এই রকমে খাবার সংগ্রহ হইলে, পোকারা গর্ত্ত ছাড়িয়া পলায় না; সেখানে লুকাইয়া ধীরে ধীরে খাবার খাইয়া ফেলে। যে-সকল পোকার ডিম পাড়িবার সময় আসে, তাহারা কিন্তু ঐ-রকমে গোবর বা ময়লা খায় না। তাহারা ঐ-সকল খাবার জিনিসের মধ্যে ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। ইহা হইতে যে-সকল বাচ্চা হয়, তাহারাই ঐ খাবার খাইয়া বড় হয়।

বড় ও মাঝারি গোবরে পোকাকে কিন্তু ঐ-রকমে গোবর পুঁতিয়া রাখিতে দেখা যায় না। তাহারা মাথা ও সম্মুখের পা দু'খানা দিয়া গোবরের ছোট তাল পাকায় এবং তার পরে পিছনের চারিখানি লম্বা পা দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে সেগুলিকে মাটির তলাকার বাসায় জমা করে।

তোমরা হয় ত পাড়াগাঁয়ের পথে ঘাটে গোবরে পোকাদিগকে ঐ-রকমে গোবরের গুলি লইয়া যাইতে দেখিয়াছ। বাঁটুলের মত গোবরের দলাকে ইহারা এমন উৎসাহের সঙ্গে গড়াইয়া লইয়া যায় যে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। পথ উঁচু-নীচু হইলেও তাহারা ছাড়ে না; যে-রকমে হউক গোবরের দলাগুলিকে বাসায় আনিয়া হাজির করে। উঁচু পথ দিয়া যাইতে হইলে গোবরের গোলা প্রায়ই গড়াইয়া

চিত্র ৫৪—গোবরে পোকা

বার বার নীচে পড়িয়া যায়। কিন্তু ইহাতে পোকারা একটুও বিরক্ত হয় না। খুব ধৈর্য্যের সঙ্গে পাঁচ-ছয় বার, কখনো

আট-দশ বার পর্য্যন্ত সেগুলিকে নীচু জমি হইতে সমতল জায়গায় উঠাইবার চেষ্টা করে।

কোনো মূল্যবান্ জিনিস বা টাকাকড়ি নির্জ্জন পথের মধ্য দিয়া লইয়া যাইবার সময়ে, চোর-ডাকাতের হাতে পড়িতে হয়। ডাকাতেরা ঐ সকল মূল্যবান্ জিনিস কাড়িয়া পলাইয়া যায়। গোবরের গোলা গোবরে পোকাদের অতি আদরের দ্রব্য। ইহারা যখন গোবরের গোলা গড়াইতে গড়াইতে বাসায় লইয়া যায়, তখন তাহাদের উপরে প্রায়ই ডাকাতি হয়। হঠাৎ একটি নূতন গোবরে পোকা আসিয়া গোলার উপরে চাপিয়া বসে এবং মালিককে তাড়াইয়া গোলাটিকে নিজের দখলে আনিতে চায়। কিন্তু মালিক নিজের সম্পত্তি ছাড়িতে চায় না। কাজেই, দুই পোকায় খুব ঝগড়া-ঝাঁটি ও মারামারি হয়। ইহাতে যে জিতে, সে গোবরের গোলা লইয়া পলাইয়া যায়।

কখনো কখনো একটি গোলাতে দুইটি পোকা দেখিলে হঠাৎ মনে হয়, যেন দুইটির মধ্যে খুব বন্ধুত্ব আছে, তাই বুঝি দুটিতে মিলিয়া গোলা বাসায় লইয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। এই রকম দুইটি পোকার মধ্যে একটি ডাকাত পোকা থাকে। সে গোলা ঠেলিয়া লইয়া যাইতে যাইতে অন্য পোকাটিকে ফাঁকি দিবার জন্যই কেবল সুবিধা খোঁজ করে। নিরীহ পোকাটি যে-ই একটু অন্যমনস্ক হয়, অমনি ডাকাত পোকা গোলাটিকে ঠেলিয়া নিজের গর্ত্তের দিকে ছুট

দেয়। ডাকাতের এই অত্যাচারে ভালোমানুষ পোকাটি খুবই আপত্তি করে এবং কখনো কখনো লড়াই বাধায়, কিন্তু ডাকাতের হাত হইতে সম্পত্তি রক্ষা পায় না। অগত্যা হতাশ হইয়া সে আবার নূতন গোবরের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়ে।

গোবরের গোলা কোনো গতিকে বাসায় পৌঁছিলে, গোবরে পোকাদের খুব আনন্দ হয়। তখন তাড়াতাড়ি মাটি দিয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া তাহারা সেই উপাদেয় সামগ্রী খাইতে লাগিয়া যায়। একবার খাওয়া আরম্ভ করিলে, তাহাদের আর জ্ঞান থাকে না। যতক্ষণ এক কণা গোবর বাকি থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খাওয়া চলে। এই রকমে দশ বারো ঘণ্টায় এক-একটি সাধারণ পোকা একটি বড় গোবরের গোলা খাইয়া ফেলিতে পারে। তোমার শরীরের ওজন কত জানি না। হয় ত পঁয়ত্রিশ সের, না হয় এক মণ। তুমি একদিনে নিজের ওজনের সমান খাবার খাইতে পার কি? কখনই পার না। হয় ত আধ সের ওজনের খাবার খাইলেই তোমার পেট ভরিয়া যায়। গোবরে পোকারা নিজের দেহের ওজনের সমান গোবর বারো ঘণ্টার মধ্যে খাইয়া শেষ করিতে পারে। একবার ভাবিয়া দেখ, ইহারা কত পেটুক এবং ইহাদের হজম করিবার শক্তিই বা কত!

ডিম্ব পাড়িবার সময় হইলে বড় বড় স্ত্রী-গোবরে পোকা যে-সব গোলা গর্ত্তে লইয়া যায়, তাহা খায় না। ভাঙিয়া চুরিয়া সেগুলিকে বড় এবং লম্বা করে। লাউয়ের

আকৃতি যেমন বোঁটার দিকে সরু ও তলার দিকে চওড়া হয়, স্ত্রী-পোকারা গোবরের গোলা ভাঙিয়া ঠিক সেই রকম আকারে গড়িয়া তোলে। ডিম পাড়িবার সময় হইলে উহারা এ-সকল গোবরের তালের সরু দিক্‌টায় ডিম পাড়িয়া রাখে।

বর্ষাকালে যে বড় বড় গোবরে পোকা উড়িয়া প্রদীপের আলোর কাছে আসে, তাহাদের ডিম শীঘ্র ফুটিয়া যায় এবং তাহা হইতে শুঁয়ো-পোকার আকারে ছোট বাচ্চা বাহির হয়। খাবারের গাদার মধ্যে ইহাদের জন্ম। কাজেই, খাবারের অভাব হয় না। প্রায় এক মাস ধরিয়া বাচ্চারা অবিরাম আহার করে এবং শীঘ্রই বেশ মোটা হইয়া দাঁড়ায়। গোবরের পচা সার বা পচা খড়ের গাদা খুঁড়িতে গেলে সেখানে প্রায়ই সাদা রঙের মোটা শুঁয়ো-পোকা দেখা যায়। সেইগুলিই বড় গোবরে পোকার বাচ্চা।

এই দলের সকল পোকাকেই গোবরে পোকা নাম দিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদের সকলেই যে গোবর বা ময়লা জিনিস খাইয়া বাঁচে, ইহা মনে করিয়ো না। অনেক গোবরে পোকা ভয়ানক মাংসভক্ত। মাঠে-ঘাটে ইঁদুর, পাখী বা অন্য কোনো ছোট জানোয়ার মরিয়া পড়িয়া থাকিলে, নানা রকম গোবরে পোকা মরা জন্তুদের কাছে আসে এবং পা ও মাথা দিয়া চারি পাশের মাটি খুঁড়িয়া সমস্ত জন্তুটাকে মাটি চাপা দেয়। তার পরে যেমন দরকার হয় তেমনি তাহারা সেই মরা জন্তুর পচা মাংস খাইতে আরম্ভ করে।

খুব বিশ্রী প্রাণী হইলেও গোবরে পোকারা মানুষের খুব উপকার করে। ইহারা গোবর ইত্যাদি ময়লা তাড়াতাড়ি মাটির তলায় পুঁতিয়া না ফেলিলে, আমাদের রাস্তা ঘাট এই সব নোংরা জিনিসে নিশ্চয়ই অস্বাস্থ্যকর হইয়া দাঁড়াইত। চীন দেশের কাছে হাওয়াই দ্বীপে এক সময়ে গোবরে পোকা ছিল না। গোরু ঘোড়া ও মানুষের ময়লা পথে ঘাটে পড়িয়া পচিত এবং তাহাতে অসংখ্য মাছি জন্মিয়া ভয়ানক উৎপাত করিত। এই সকল ময়লা পরিষ্কার করিবার অন্য উপায় না পাইয়া, সেই দ্বীপে নানা জাতীয় গোবরে পোকা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন সেই পোকায় হাওয়াই দ্বীপ ছাইয়া পড়িয়াছে। আগেকার মত এখন সেখানকার পথে-ঘাটে গোবর ইত্যাদি পচিতে পায় না এবং তাহাতে মাছি জন্মিয়া উৎপাতও করে না।

মাল-পোকার নাম বোধ হয় তোমরা শুনিয়াছ। ইহারা দেখিতে ঠিক্ বড় গোবরে পোকারই মত, কিন্তু ইহাদের মাথায় এক-একটা বাঁকানো শিং থাকে। গণ্ডারের মাথায় যেমন খড়্গ, ইহা যেন সেই রকমই খড়্গ। মাল-পোকা নারিকেল গাছের পরম শত্রু। নারিকেল গাছ হইতে কচি পাতা বাহির হইলে তাহার গোড়ায় গর্ত্ত করিয়া ইহারা একবারে গাছের ভিতরে আড্ডা করে এবং গাছ মারিয়া ফেলে।

চিত্র ৫৫—মাল-পোকা

ধাম্‌সা পোকা

ধাম্‌সা পোকা কঠিন-পক্ষ পতঙ্গ। ইহাদের দলে ছোট বড় অনেক পোকা আছে। আমরা যাহাকে ধাম্‌সা পোকা বলিতেছি, ইংরাজিতে তাহাকে Tiger Beetle অর্থাৎ বাঘা পোকা বলে। ইহারা বাঘের মতই বটে। ইহাদিগকে অনেকে "সাপের মাসি-পিসি"ও বলে। যে দুইটা শক্ত ডানায় ধাম্‌সা পোকাদের শরীর ঢাকা থাকে, তাহা প্রায়ই কালো, সবুজ বা বাদামী রঙের হয়। বাঘের গায়ে যেমন গোল গোল দাগ থাকে, ইহাদের কঠিন ডানার উপরে সেই রকম ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে। এই দলের অনেকের আবার এই ডানা দুটা জোড়া থাকে। তাহারা উড়িতে পারে না। অন্য পতঙ্গদের চেয়ে ইহাদের পা কয়েকখানি খুব লম্বা,—সেই লম্বা পা ফেলিয়া ধাম্‌সা পোকারা ছুটিয়া বেড়ায়। চোখ দুটি চিংড়ি-মাছের চোখের মত মাথার দুই পাশে উঁচু হইয়া থাকে। ইহাদের মুখের বাঁকানো দাঁত জোড়াটি দেখিলে বাস্তবিকই ভয় হয়। ছোট পোকা-মাকড় ও ফড়িং ভিন্ন অন্য কিছু ইহারা খায় না। একটা ধাম্‌সা পোকা ধরিয়া যদি গোটা কুড়ি-পঁচিশ ফড়িং তাহার সম্মুখে ধরা যায়, তবে একটাও

চিত্র ৫৬—ধাম্‌সা পোকা।

পড়িয়া থাকে না। বাঘ যেমন কুকুরের বাচ্চাকে চিবাইয়া খায়, উহারা ঠিক্ সেই রকমে ফড়িংগুলিকে কড়মড় করিয়া চিবাইয়া খাইয়া ফেলে।

জলা-জায়গায় মাটির তলায় ধাম্‌সা পোকারা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিলে যে শুঁয়ো-পোকার আকারে বাচ্চা বাহির হয়, তাহারা গর্ত্তের বাহিরে চলা-ফেরা করে। ইহাদেরও প্রধান খাদ্য ছোট পোকা-মাকড়। এক বছর না হইলে এই পোকারা সম্পূর্ণ পতঙ্গ হয় না। কিন্তু সম্পূর্ণ আকার পাইলে ইহারা বেশি দিন বাঁচে না; মাসখানেক পোকা-মাকড় খাইয়া ও ডিম পাড়িয়া মরিয়া যায়।

গান্ধী-পোকাদের গা হইতে কি-রকম খারাপ গন্ধ বাহির হয়, তোমরা তাহা জান। ধাম্‌সা পোকারা গান্ধী-পোকার জাতীয় পতঙ্গ নয়, কিন্তু তথাপি ইহারা লেজের দিক্ হইতে এক রকম গন্ধ-ওয়ালা রস বাহির করিতে পারে। বোধ হয়, এই গন্ধে অন্য পোকা-মাকড় বা বড় প্রাণী ইহাদের কাছে আসিয়া অনিষ্ট করিতে পারে না।

জোনাক পোকা

জোনাক পোকা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। খুব শুক্‌নো জায়গায় ইহাদিগকে বেশি দেখা যায় না। বর্ষার শেষে জলা জায়গায় ইহারা এক-এক সময়ে গাছপালায় এত বেশি জমা হয় যে, অন্ধকার রাত্রিতে দেখিলে মনে হয়, যেন গাছে আগুন লাগিয়াছে।

জোনাক পোকার চেহারা কি-রকম, তাহা বোধ হয় তোমরা সকলে ভালো করিয়া দেখ নাই। রাত্রিতে একটা পোকা ধরিয়া গ্লাস্ বা বাটি চাপা দিয়া রাখিয়ো এবং প্রাতে তাহার চেহারাটা দেখিয়ো।
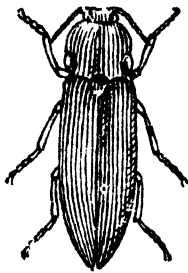
জোনাক পোকা নানা রকমের দেখা যায় এবং প্রত্যেক রকম পোকার গায়ের রঙ্ পৃথক্। হল্‌দে, বাদামী, লাল প্রভৃতি নানা রঙের জোনাক পোকা আছে। আকারেও এগুলির মধ্যে কেহ বড় এবং কেহ বা ছোট। আমরা যে-সব জোনাক পোকাকে বাগানের গাছে বা ঘরের ভিতরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখি, এখানে তাহার একটা ছবি দিলাম।

চিত্র ৫৭—জোনাক পোকা

ইহাদের শরীর কতকটা লম্বা ধরণের। ছবি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে। কঠিন-পক্ষ পতঙ্গদের শরীর যেমন

হাড়ের মত শক্ত, ইহাদের দেহ কিন্তু সে-রকম নয়; দেহের আবরণ কতকটা নরম। দিনের বেলায় জোনাক পোকারা লুকাইয়া থাকে এবং সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে আনন্দে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করে। গাছের নরম পাতা, ডাল ইত্যাদিই অধিকাংশ জোনাক পোকার প্রধান খাদ্য। আবার ছোট পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়, এমন জোনাক পোকাও আছে।

জোনাক পোকাদের আলো তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহা বাতির আলো, উনুনের আলো বা সূর্য্যের আলোর মত নয়। এই আলোতে যেন একটু নীল রঙ্ থাকে। আমরা বাতি জ্বালিয়া যে আলো পাই, তাহা কেবলি আলো নয়, উহার সঙ্গে তাপও মিশানো থাকে। সূর্য্যের আলো ও বিদ্যুতের আলোতেও তাপ থাকে। কিন্তু জোনাক পোকারা যে আলো দেয়, তাহা কেবলি আলো, তাহাতে একটুও তাপ মিশানো থাকে না। লেজের যে-অংশটা দপ্ দপ্ করিয়া আলো দেয়, তোমরা নির্ভয়ে তাহাতে হাত দিয়া দেখিয়ো—একটুও গরম বোধ করিতে পারিবে না।

লাল দিয়াশলাইয়ের কাঠিতে এক রকম জিনিস মাখানো থাকে, তাহাতে ফস্‌ফরস্ বলে। ফস্‌ফরসের গায়ে বাতাস লাগিলেই উহা জ্বলিয়া উঠে। দেওয়ালের গায়ে লাল দিয়াশলাইয়ের কাঠি ঘসিলে দেওয়াল কি-রকম উজ্জ্বল হয়, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত তাহা দেখিয়াছ। জোনাক

পোকার আলো কতকটা ফস্‌ফরসের আলোরি মত। তফাতের মধ্যে ফস্‌ফরসের আলোতে তাপ থাকে, জোনাকের আলোতে মোটেই তাপ থাকে না। অনেকে বলেন, জোনাক পোকার গায়ে ফস্‌ফরস্ আছে, তাহাই আলো দেয়। কিন্তু এই কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। ফস্‌ফরসের সঙ্গে জোনাক পোকার আলোর একটুও সম্বন্ধ নাই। তাপ না জন্মাইয়া ইহারা কি রকমে ঠাণ্ডা আলো জন্মায় তাহা আজো ঠিক করা যায় নাই। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ্‌পিণ্ডের উঠা-নামা যেমন তালে তালে চলে, জোনাক পোকার আলোও ঠিক সেই রকমে তালে তালে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। ইহা দেখিয়া মনে হয়, আমরা যেমন শরীরের শক্তি ক্ষয় করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ও চলা-ফেরার কাজ চালাই, জোনাক পোকারা ঠিক সেই রকমেই আলো উৎপন্ন করে। কিন্তু কোন্ প্রণালীতে দেহের শক্তি দিয়া আলো উৎপন্ন হয়, তাহা আজও জানা যায় নাই।

আমরা যখন কেরোসিন বা অন্য কোন তেল পুড়াইয়া আলো উৎপন্ন করি, তখন তেলের সকল শক্তিই আলোর আকার পায় না; ঐ শক্তির বেশির ভাগই অনাবশ্যক তাপ জন্মাইয়া নষ্ট হইয়া যায়। জোনাক পোকারা কি-রকমে তাপ উৎপন্ন না করিয়া কেবল মাত্র আলো উৎপন্ন করে, তাহা জানা গেলে আমাদের অনেক লাভ হইবে। তখন আমরা ল্যাম্প হইতে কেবল তাপহীন আলো পাইব। কাজেই আলোর সঙ্গে

সঙ্গে তাপ জন্মিয়া এখন তেলের যে বাজে খরচ করে, তখন তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে।

জোনাক পোকা কেন শরীর হইতে আলো বাহির করে, তাহা লইয়া বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও সকলে এ-সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। আগুনকে সকলেই ভয় করে। কেহ কেহ বলেন, আগুনের মত আলো বাহির করিয়া জোনাক পোকারা নিশাচর পাখী প্রভৃতি শত্রুদের ভয় দেখায়। শত্রুরা জোনাক পোকাকে আগুন মনে করিয়া কাছে ঘেঁসে না। আবার কেহ কেহ বলেন, জোনাক পোকার আলো শিকার ধরিবার ফাঁদ ভিন্ন আর কিছুই নয়। আলো দেখিলেই ছোট পোকা-মাকড় তাহা লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসে। ঘরের দরজা জানালা খুলিয়া আলো জ্বালিলে, কত পোকা আলের কাছে জড় হয়, তোমরা তাহা দেখ নাই কি? জোনাক পোকার আলো যখন আগুনের মত দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে থাকে, তখন ছোট পোকারা আগুন মনে করিয়া কাছে ছুটিয়া আসে। জোনাক পোকারা এই সুযোগে গণ্ডায় গণ্ডায় ছোট পোকা ধরিয়া আহার করিয়া লয়। আবার একদল লোক বলেন, এই সব কথার কোনোটাই ঠিক্ নয়। দিনের বেলায় জোনাক পোকারা যে যেখানে পারে দূরে দূরে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রিকালেই তাহারা এক সঙ্গে বাস করিবার সুযোগ পায়। তাই রাত্রি আসিলেই

তাহারা শরীর হইতে আলো বাহির করিয়া সঙ্গীদিগকে কাছে আসিবার জন্য সঙ্কেত করে।

যাহা হউক, জোনাক পোকা বড়ই অদ্ভুত পতঙ্গ, ইহাদের জীবনের কাজ ও চলা-ফেরা বড়ই আশ্চর্য্যজনক।

শল্ক-পক্ষ পতঙ্গ

(LEPIDOPTERA)

ইহারা প্রজাপতি ও রাত্রিচর পতঙ্গ। ইহাদিগকে কেন শল্ক-পক্ষ নাম দেওয়া হইল, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। মাছের গায়ে যেমন শল্ক অর্থাৎ আঁইস থাকে, এই পতঙ্গের ডানায় সেই রকম খুব ছোট আঁইস বসানো থাকে। ইহা কেবল প্রজাপতি ও কতকগুলি নিশাচর পতঙ্গের ডানাতেই দেখা যায়। এই জন্যই আমরা ইহাদিগকে শল্ক-পক্ষ পতঙ্গ (Lepidoptera) বলিলাম।

এই পতঙ্গের চারিখানি করিয়া রঙিন্ ডানা থাকে এবং তাহাতেই রঙিন্ আঁইস লাগানো দেখা যায়। প্রজাপতির ডানায় তোমরা আঙ্গুল দিয়া পরিক্ষা করিয়ো, দেখিবে, সেই রঙিন্ আঁইস রঙের গুঁড়ার মত আঙুলে লাগিয়া যাইতেছে। প্রজাপতির ডানায় কত রঙের কত চিত্রই তোমরা দেখিতে পাও। রঙের গুঁড়ার মত আঁইস দিয়াই ঐ-সকল চিত্র আঁকা থাকে। এই গুঁড়াগুলিকে আঁইস বলিয়া হঠাৎ চেনা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখিলে সেগুলি যে আঁইস স্পষ্ট বুঝা যায়।

সাধারণ পতঙ্গদের মত ইহাদের ছয়খানা পা এবং মাথায় দুইটা করিয়া শুঁয়ো থাকে। তা' ছাড়া দু'টা করিয়া চোখও

থাকে। এই চোখ সাধারণ পতঙ্গের চোখের মত হাজার হাজার ছোট চোখ মিলাইয়া প্রস্তুত। ছয়খানা পায়ের মধ্যে সম্মুখের দুখানি পা খুব ছোট থাকে। এই জন্য তাহা দিয়া হাঁটিয়া বেড়াইবার কাজ চলে না।

এই দলের মুখের গড়ন বড় মজার। হাতীর শুঁড় আছে, তোমরা ইহাই জান। কিন্তু ইহাদেরও দুইটি চোখের মাঝে একটা শুঁড়ের মত অংশ জোড়া থাকে। এই শুঁড় দিয়াই এই পতঙ্গেরা ফুলের মধু বা ফলের রস টানিয়া খায়। যদি মধু খুব ঘন হয়, তবে তাহারা সেই শুঁড় হইতে জলের মত এক রকম তরল জিনিস ঢালিয়া তাহা পাত্‌লা করিয়া লয় এবং পরে সেই পাত্‌লা রস টানিতে সুরু করে। যখন শুঁড় ব্যবহার করার দরকার থাকে না, তখন ইহারা সেটিকে ঘড়ির স্প্রীঙের মত গুটাইয়া মুখের নীচে লুকাইয়া রাখে। এই জন্য যখন উড়িয়া বেড়ায়, তখন এই পতঙ্গদের মুখের সে লম্বা শুঁড় দেখাই যায় না।

চিত্র ৫৮—প্রজাপতির মুখ
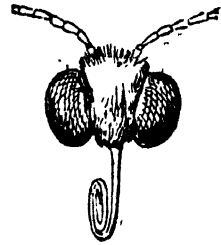
প্রজাপতি

প্রজাপতির কথা তোমাদিগকে আগেই কিছু বলিয়াছি এবং তাহার ছবিও দিয়াছি। ইহারা কখনই রাত্রিতে বাহির হয় না; কেবল দিনের বেলাতেই চারিখানি সুন্দর ডানা মেলিয়া ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের শত্রুও বড় অল্প। যে-সকল প্রজাপতির গায়ে নানা প্রকার রঙ্‌চঙ্‌ থাকে, তাহাদিগকে পাখী বা অন্য প্রাণীতে খায় না; বোধ হয় ইহাদের মাংস মুখে ভাল লাগে না। প্রজাপতিরা বেশী দিন বাঁচে না, দুই চারি দিন মধু খাইয়া তাহারা মারা যায়।

স্ত্রী-প্রজাপতিরা গাছের পাতা বা সরু ডালে ডিম পাড়ে এবং ডিম পাড়িয়াই মরিয়া যায়। এই সকল ডিম ফুটিয়া যে শুঁয়ো-পোকার মত বাচ্চা বাহির হয়, তাহারা জন্মিয়াই ডিমের খোলাগুলি খাইয়া ফেলে এবং তার পরে সেই গাছেরই পাতা খাইয়া বড় হয়। খাবার সন্ধান করিবার জন্য তাহাদিগকে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। ইহাদের শত্রু অনেক,—পাখী টিকটিকি গিরগিটিরা প্রজাপতির বাচ্চা খাইতে বড়ই ভালবাসে। তাই অনেক প্রজাপতির বাচ্চাদেরই গায়ের রঙ্‌ পাতার রঙের মত সবুজ হয়। পাতার রঙের সঙ্গে ইহাদের গায়ের রঙ্‌ এমন মিলিয়া যায় যে, পাখীরা উহাদিগকে প্রজাপতির বাচ্চা বলিয়া চিনিতে পারে না। অনেক বাচ্চার গায়ে চুলের মত শুঁয়ো থাকে এবং

তাহাদের গায়ের রঙ্ও নানা রকম হয়। গায়ে লাল কালো হল্‌দে রঙ্ দেখিলে বা শুঁয়ো দেখিলে পাখীরা তাহাদিগকে ধরে না।

প্রজাপতিরা যখন গাছের ডালে বসিয়া বিশ্রাম করে, তখন তাহাদের ডানা কয়েকখানি কি-রকম থাকে, তোমরা দেখ নাই কি? মাছিরা যেমন ডানা গুটাইয়া পিঠের উপরে ফেলিয়া রাখে, প্রজাপতিরা তাহা কখনই করে না। বিশ্রামের সময়ে ডানা পিঠের উপরে উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া প্রজাপতিদিগকে অন্য শল্ক-পক্ষ পতঙ্গের মধ্য হইতে চিনিয়া লওয়া যায়।

প্রজাপতির ডিম হইতে যে বাচ্চা হয়, তাহাদের দেহেও একটু বিশেষত্ব আছে। বাচ্চাদের দেহের নীচে তিন জোড়া সাধারণ পা ছাড়া আরো দশখানা পা থাকে। এই দশখানা পায়ের আকৃতি বড় মজার। সেগুলি যেন রবারের বাটি। রবারের বাটি উপুড় করিয়া মাটিতে চাপিয়া ধরিলে তাহার ভিতরকার বাতস বাহির হইয়া যায়, ইহাতে বাটি মাটির গায়ে জোরে আট্‌কাইয়া থাকে। প্রজাপতির বাচ্চারা ঐ দশখানা পা দিয়া ঠিক ঐ রকমেই গাছের ডালপালা আট্‌কাইতে আট্‌কাইতে চলা-ফেরা করে। চাপ্ দিলেই পায়ের তলার বাটি হইতে বাতাস বাহির হইয়া যায়, তার পরে উহা ডালপালায় আট্‌কাইয়া থাকে। কিন্তু এগুলি বাচ্চাদের স্থায়ী পা নয়। গাছের পাতা খাইয়া বড় হইলে

পর ইহারা যখন পুত্তলি-অবস্থায় ঘুমাইতে থাকে, তখন ঐ-সকল পা লোপ পাইয়া যায়,—থাকে কেবল সম্মুখের তিন জোড়া পা। এই তিন জোড়া পায়ে ভর করিয়া সম্পূর্ণ আকারের প্রজাপতিরা ফুলের উপরে বসে।

পতঙ্গেরা পুত্তলি-অবস্থায় যখন মড়ার মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, তখন তাহাদের দেহগুলিকে কোনো রকম আবরণে ঢাকিয়া রাখে। দেহের পরিবর্ত্তন সেই ঢাকা অবস্থায় হয়। কিন্তু প্রজাপতির বাচ্চারা ঐ রকমে শরীর ঢাকিয়া রাখে না। কখনো লেজের দিক্‌টা ডাল বা পাতায় আট্‌কাইয়া ঝুলিতে ঝুলিতে ঘুমায়, কখনো বা দেহ হইতে সূতা বাহির করিয়া তাহা ডালে আট্‌কাইয়া ঝুলিতে থাকে। এই রকমে কয়েক দিন কাটিয়া গেলে, তাহারা গায়ের ছাল বদ্‌লাইয়া প্রজাপতি হইয়া দাঁড়ায়।

রাত্রির প্রজাপতি

আমরা কোন্ পতঙ্গদের রাত্রির প্রজাপতি বলিতেছি, তাহা বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পার নাই। ইহারা প্রজাপতি নয়, কিন্তু প্রজাপতিদেরই মত ইহাদের চারিখানি ডানা থাকে এবং ডানার গায়ে রঙের গুঁড়া লাগানো থাকে—কাজেই, ইহারা শল্ক-পক্ষ পতঙ্গ। এই রকম ছোট পোকা রাত্রিতে প্রদীপের কাছে অনেক উড়িয়া বেড়ায়। ইহাদের অনেকেরই ডানার রঙ সাদা বা সাদার উপরে লাল বা কালোর

ছিটে-ফোঁটা দেওয়া। আবার কোনো কোনোটিকে বাদামী বা মেটে রঙেরও হইতে দেখা যায়। ডানায় হাত দিলে তাহার উপরকার রঙের গুঁড়া খসিয়া হাতে লাগে। কোন্ পতঙ্গদের রাত্রির প্রজাপতি বলিতেছি, তোমরা বোধ হয় এখন তাহা বুঝিতে পরিয়াছ। ইংরাজিতে এই পোকাকে Moth বলে।

দিনের বেলায় এই পোকার দল নানা জায়গায় লুকাইয়া থাক, রাত্রিই ইহাদের উড়িয়া বেড়াইবার সময়। বাদুড় পেঁচা যেমন নিশাচর প্রাণী, ইহারাও সেই রকম নিশাচর পতঙ্গ। দিনের বেলায় ঝোপে-জঙ্গলে অবিরাম ঘুরিয়াও তোমরা এই দলের একটি পোকাও দেখিতে পাইবে না।

প্রজাপতিরা যখন পাতা বা ফুলের উপরে বসিয়া বিশ্রাম করে, তখন ডানাগুলিকে পিঠের উপরে উঁচু করিয়া রাখে। ইহা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। কিন্তু রাত্রির প্রজাপতিরা বিশ্রামের সময়ে ডানা চারিটিকে বেশ গুটাইয়া রাখিতে পারে। প্রজাপতিদের মুখের উপরকার শুঁয়ো দুটির আকৃতি কি-রকম তাহা তোমরা দেখিয়াছ কি? বোধ হয় দেখ নাই। একবার পরীক্ষা করিয়ো,—দেখিবে, শুঁয়ো আগাগোড়া এক রকম নয়। ইহার গোড়া অপেক্ষা আগাটা যেন হঠাৎ মোটা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রাত্রির প্রজাপতিদের শুঁয়ো সে-রকম নয়, ইহার আগাগোড়া প্রায় সমান মোটা, বরং আগাটাই যেন একটু সরু।

গুটিপোকা

তোমরা গুটিপোকা দেখিয়াছ কি? ইহাদের আকৃতি বড় প্রজাপতিদের মত। পুত্তলি-অবস্থায় দেহের চারিদিকে সূতা জড়াইয়া যে আবরণ তৈয়ার করে তাহাই রেশমের গুটি। এই গুটির সূতা লইয়া আমরা রেশমী কাপড় তৈয়ার করি। দেখিতে প্রজাপতি হইলেও গুটিপোকারা সাধারণ প্রজাপতির জাতীয় নয়। ইহারা নিশাচর প্রজাপতি-দের দলের পোকা। প্রজাপতিদেরই মত ইহাদের ডানায় রঙের গুঁড়া লাগানো থাকে। ডানায় আঙুল দিলেই গুঁড়া খসিয়া যায়।

গুটিপোকার প্রজাপতিদের মুখে শুঁড় থাকে না। শুঁড়ের দরকারও হয় না। কারণ পুত্তলি-অবস্থার পর প্রজাপতি হইয়া দাঁড়াইলে, ইহারা মোটেই আহার করে না। কয়েক দিন এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া সকলেই মরিয়া যায়। ইহারা প্রাণান্তে দিনে উড়িয়া বেড়ায় না। কাক চিল প্রভৃতি অনেক পাখীই ইহাদের পরম শত্রু।

আমাদের দেশে ছোট বড় নানাজাতীয় গুটিপোকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাদা হল্‌দে লাল্‌চে প্রভৃতি নানা রঙের রেশমী সূতা দিয়া গুটি বাঁধে। তসরের কাপড় তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ, লাল্‌চে রেশমের সূতা দিয়া ইহা প্রস্তুত। এই সূতা এক রকম গুটিপোকা প্রস্তুত করে।

তসরের গুটিপোকা

তসরের পোকা আমাদের দেশের বনে জঙ্গলে শাল কুল প্রভৃতি গাছে জন্মে এবং সেই সকল গাছে আমড়ার আঁটির মত গুটি বাঁধে।

তসর-পোকার প্রজাপতি সাধারণ প্রজাপতির চেয়ে বোধ হয় আট-দশ গুণ বড়। ডানা মেলিয়া থাকিলে লম্বায় ও চওড়ায় ইহাদিগকে এক একটা পাখী বলিয়া মনে হয়। এই পোকারা শাল, কুল প্রভৃতি গাছে মসূর ডালের মত চেপ্‌টা থোকো থোকো ডিম পাড়ে। মসূর ডালের রঙ্‌ লাল, গুটি পোকার ডিম সাদা। যাহাতে বাতাসে পাতা হইতে পড়িয়া না যায়, সেই জন্য ডিমের গায়ে এক রকম আঠা লাগানো থাকে। ইহা শুকাইয়া শক্ত হইলে পাতায় আট্‌কাইয়া যায়। এক-একটি পোকা প্রায় দুইশত ডিম পাড়িতে পারে।

ডিম হইতে যে শুঁয়ো-পোকার আকারের বাচ্চা বাহির হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা সকলে দেখ নাই। বাচ্চাদের রঙ্‌ কতকটা সবুজ ধরণের। তাই ইহারা যখন গাছের সবুজ পাতা খাইয়া বেড়ায় তখন তাহাদিগকে হঠাৎ চেনা যায় না এবং যে-সকল পাখী পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়, তাহারাও সবুজ পাতার মধ্য হইতে সবুজ পোকাগুলিকে চিনিয়া ধরিতে পারে না। গুটিপোকাদের বাচ্চার পিঠে কয়েক গোছা লোম সাজানো থাকে এবং সাধারণ পোকাদের মত ইহাদের

সম্মুখে তিন জোড়া আসল পা এবং পাঁচ জোড়া অস্থায়ী পা থাকে। তা' ছাড়া গায়ের উপরে ছোট রূপার বোতামের মত
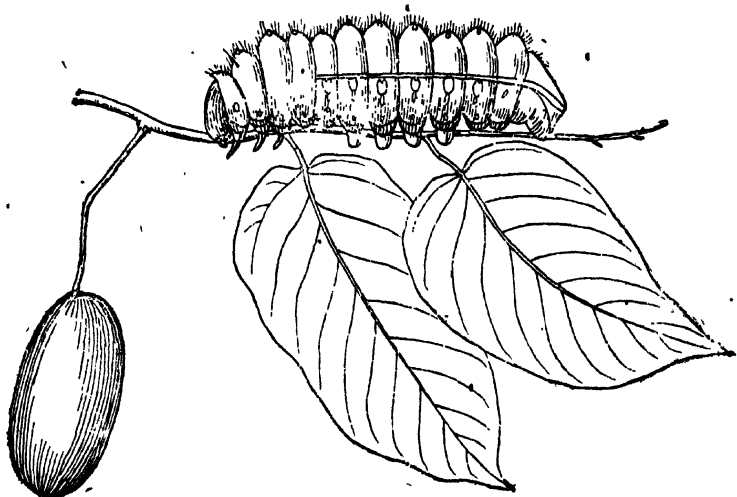
চিত্র ৫৯—গুট পোকা ও গুটি

কয়েকটি বোতাম বসানো থাকে। এইগুলি কেন শরীরে লাগানো থাকে, তাহা বুঝা যায় না। ইহাদের মুখগুলি দেখিতে অতি বিশ্রী ; ঠিক পেঁচার মুখের মত চেপ্‌টা। কিন্তু চোয়ালে যে দাঁত বসানো থাকে, তাহা ভয়ানক ধারালো। সেই দাঁত দিয়া গোটা গোটা পাতা কাটিয়া উহারা দিবারাত্রি আহার করে এবং শীঘ্র বড় হইয়া পড়ে।

বড় হইলেই তসর-পোকার বাচ্চারা গুটি বাঁধিতে সুরু করে। একটা পাতা বা একটা সরু কচি ডালকে আঁক্‌ড়াইয়া

ইহারা নিজের দেহের চারিদিকে রেশমের সূতা জড়ায় এবং ক্রমে তাহা আম্‌ড়ার আঁটির মত বড় হইয়া পড়ে। ইহাই গুটিপোকার গুটি। পোকারা ইহারি মধ্যে পুত্তলি-অবস্থায় ঘুমাইয়া কাটায়। তার পরে যখন শরীর পরিবর্ত্তন করিয়া তাহারা ডানা-ওয়ালা প্রজাপতি হইয়া দাঁড়ায়, তখন সেই গুটি কাটিয়া বাহির হয়। কোনো কোনো পোকা বাহির হইবার সময়ে মুখ হইতে এক রকম লালা বাহির করিয়া গুটির গায়ে লাগাইতে থাকে। ইহাতে গুটির রেশমী সূতা আল্‌গা হইয়া পড়ে। তার পরে পোকারা অনায়াসে সেই আল্‌গা সূতা ঠেলিয়া গুটি হইতে বাহির হয়।

———
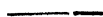
দ্বিপক্ষ পতঙ্গ

(DIPTERA)

এইবার আমরা দ্বিপক্ষ পতঙ্গদের কথা বলিব। এই দলের অনেক পতঙ্গেরই দু'খানা করিয়া পাত্‌লা ডানা থাকে। এই জন্যই আমরা ইহাদিগকে দ্বিপক্ষ নাম দিলাম। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এ-রকম পোকাও দুই চারিটি আছে, যাহাদের কোনো কালেও ডানা গজায় না। মশা মাছি ছারপোকা প্রভৃতি আমাদের জানা-শুনা অনেক পোকাই এই দলের। ইহারা বড়ই অভদ্র। কেহ অন্য বড় প্রাণীর রক্ত চুষিয়া খায়, কেহ পচা মাংসের রস খায় ও তাহাতে ডিম পাড়ে, কেহ-বা পচা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং পচা জিনিস খায়। আবার যে-সব নোংরা ও পচা জায়গায় ব্যারামের বীজ জমা থাকে, সেখানে বেড়াইয়া কোনো কোনো পোকা ব্যারামের বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। ইহাতে শত শত লোক নানা রকম অসুখে পড়িয়া মারা যায়। তাহা হইলে দেখ, ছোট প্রাণী হইয়াও ইহারা বাঘ-ভালুকের চেয়ে মানুষের বেশি অনিষ্ট করে।

অন্যান্য পতঙ্গদের মতই ইহাদের মুখের উপরে দুটা ছোট শুঁয়ো থাকে এবং তাহার গায়ে সরু সরু চুল লাগানো থাকে। তোমরা যদি মাছির শুঁয়ো আতসী কাচে দেখিবার সুযোগ পাও, তবে ঐ-রকম শুঁয়ো স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

অণুবীক্ষণে ফেলিয়া দ্বিপক্ষ পতঙ্গের মুখ পরীক্ষা করিলে, সেগুলিকে অতি বিশ্রী দেখায়। মাথার উপরেই বড় বড় দুটা চোখ দেখা যায়। এই চোখগুলির এক একটা হাজার হাজার ছোট চোখের সমষ্টি। চোখের নীচেই মুখ। উহাতে তরল জিনিস চুষিয়া খাইবার জন্য শুঁড় ও অন্য প্রাণীর গায়ের চাম্‌ড়া কাটিবার জন্য অস্ত্র ইত্যাদি নানা সাজসজ্জা থাকে। ইহাদের ডানা দুখানি থাকে বটে, কিন্তু ডানার কাছে দুটি খুঁটির মত অঙ্গ দেখা যায়। তাহা দেখিয়া পণ্ডিতেরা বলেন, এখনকার দ্বিপক্ষ পতঙ্গদের এককালে চারিখানি করিয়া ডানা ছিল— কোনো কারণে পিছনের ডানা জোড়াটা লোপ পাইয়া গিয়াছে। এখন সেই ডানারই মূল খুঁটির আকারে এই সব পতঙ্গের দেহে রহিয়া গিয়াছে। মরা মশা বা মাছি আতসী পরীক্ষা করিলে তোমরা পিছনের ডানার ঐ-প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাইবে। এই পোকারা যখন ডানা মেলিয়া উড়িতে থাকে, ঐ দুটি খুঁটিও আপনা হইতে নড়াচড়া করিতে থাকে।

সার্‌কাসের খেলোয়াড় যখন তারের উপর দিয়া চলিতে চলিতে খেলা দেখায়, তখন সে কি করে তোমরা দেখ নাই কি? সে তারে উঠিয়াই নিজেকে স্থির রাখিবার জন্য ক্রমাগত

হাত পা নাড়াচাড়া করিতে আরম্ভ করে। হাত বাঁধিয়া তারের উপরে দাঁড় করাইতে গেলে খুব ওস্তাদ খেলোয়াড়ও ধপাস্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। দুই ডানায় ভর দিয়া মশা-মাছিরা যখন উড়িতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের দেহগুলিকে স্থির রাখিবার জন্য হাত পা নাড়ার মত একটা-কিছু করার দরকার হয়। দ্বিপক্ষ পতঙ্গের দেহের ঐ লুপ্ত ডানার খুঁটি হেলিয়া দুলিয়া তাহাদিগকে সোজাভাবে উড়িয়া চলিবার সাহায্য করে।

সাধারণ পতঙ্গের মত দ্বিপক্ষ পোকারা ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম হইতে শুঁয়ো-পোকার আকারের বাচ্চা বাহির হয়। শেষে এই পোকাই পুত্তলি-অবস্থায় শরীর বদ্‌লাইয়া ডানা-ওয়ালা সম্পূর্ণ পতঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সাধারণ শুঁয়ো-পোকাদের যেমন পা ও চোখ থাকে, এই দলের শুঁয়ো-পোকাদের তাহা দেখা যায় না। ইহাদের মুখের গড়ন জটিল নয় এবং মুখের চেয়ে লেজের দিক্‌টাই বেশি মোটা। মুখে বঁড়শির মত বাঁকানো দুটা অস্ত্র থাকে, তাহাই দাঁতের কাজ চালায়।

সম্পূর্ণ আকার পাইলে অনেক পতঙ্গই ডিম পাড়িয়া চারি দিনের মধ্যে মারা যায়, ইহা তোমরা আগে অনেক বার শুনিয়াছ। কিন্তু দ্বিপক্ষ পতঙ্গদের সম্বন্ধে সে-কথা বলা যায় না। ডানা-ওয়ালা সম্পূর্ণ পতঙ্গের আকারে ইহারা অনেক দিন বাঁচে। ডিম হইতে বাচ্চা জন্মিতে এবং বাচ্চা হইতে সম্পূর্ণ পোকা হইয়া দাঁড়াইতে ইহাদের বেশি সময়ের

দরকার হয় না। পুত্তলি-অবস্থায় গুটিপোকা বা অপর পতঙ্গের মত ইহারা বিশেষ কোনো আবরণে গা ঢাকে না। সেই সময়ে তাহাদের গায়ের চামড়াটাই খুব শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই তাহাদিগকে নিরাপদে রাখে। তার পরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গজাইলে, সেই মোটা চামড়া ছিঁড়িয়া তাহারা সম্পূর্ণ আকারে বাহির হইয়া পড়ে।

মৌমাছি, পিঁপড়ে ও উইয়েরা কি-রকমে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে, তাহা তোমরা শুনিয়াছ। কিন্তু দ্বিপক্ষ পতঙ্গেরা একত্রে সে-রকমে বাস করিতে পারে না। যেখানে রাত্রি হয়, সেখানেই রাত্রি কাটায় এবং তার পরে নিজের পেটের জ্বালায় ঘুরিয়া বেড়ায়, দলের অন্যদের দিকে একবার ফিরিয়া তাকায় না।

মাছি

মাছি কত রকমের আছে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়। কোনোটার চোখ লাল, কোনোটার চোখ মেটে রঙের। কাহারো গায়ের রঙ্ সবুজ, কাহারো বা নীল। কেহ খাবারের উপরে বসিয়া খাবার শুষিয়া খায়, কেহ গোরু, ঘোড়া ও কুকুরের গায়ে বসিয়া রক্ত টানিয়া লয়। এত রকম মাছির সব-গুলিরই যদি পরিচয় দিতে হয়, তবে মাছির বিবরণ দিয়াই একখানা প্রকাণ্ড বই লেখার দরকার হইয়া পড়ে। আমরা তোমাদিগকে কেবল কয়েক জাতি সাধারণ মাছির জীবনের কথা বলিব।

গ্রীষ্মকালে ক্রমাগত ভন্ ভন্ শব্দ করিয়া যে মাছিরা আমাদের জ্বালাতন করে, তাহাদিগকে তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। তাড়াইলে একটু দূরে পালায়, কিন্তু আবার তখনি ফিরিয়া গায়ের ঘাম চাটিয়া খাইতে সুরু করে।

এখানে একটা মাছির মুখের ছবি দিলাম। দেখ, মাথার দুই ধারে চোখ দুটা কত বড়। একএকটা চোখে দুই হাজার ছোট চোখ আছে। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, এই মাছিদের প্রত্যেকটিরই চারি হাজারটা চোখ আছে। কোন্ মাছি স্ত্রী এবং কোন্ মাছি পুরুষ তাহা চোখ দেখিয়া বুঝা যায়। স্ত্রী-মাছির চোখ দুটি প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো থাকে। কিন্তু পুরুষদের তাহা থাকে না, ইহাদের চোখ দুটার মধ্যে বেশ একটু ফাঁক্ দেখা যায়।
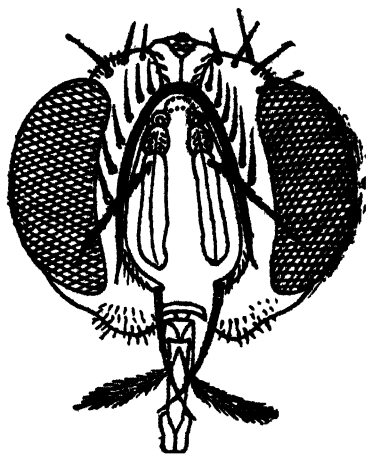
চিত্র ৬০—সাধারণ মাছির মুখ

মাছিদের ডানা কেমন পাত্‌লা, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। উড়িবার সময়ে ইহারা ডানাগুলিকে এমন ঘন ঘন নাড়া দেয় যে, তাহাতে ভন্ ভন্ শব্দ বাহির হয়। মাছিরা মুখ দিয়া শব্দ করে না। ইহাদের পা কয়েকটি বড় মজার। বিড়ালের পায়ের তলায় যেমন উঁচু মাংসপিণ্ড থাকে, ইহাদের পায়ের নীচে সেই রকম দুটি উঁচু অংশ দেখা যায়। সেগুলি ছোট ছোট লোমে ঢাকা থাকে। মাছিরা যখন দেওয়ালের গায়ে পা লাগাইয়া হাঁটিয়া বেড়ায়, তখন ঐ-সকল

লোম হইতে আঠার মত এক রকম জিনিস বাহির হইতে আরম্ভ করে। ইহা পা-গুলিকে দেওয়ালের গায়ে আট্‌কাইয়া রাখে।

মাছির ডিম বোধ হয় তোমরা দেখ নাই। ডিমের রঙ্‌ প্রায় সাদা হয়। মাছিরা সাধারণতঃ পচা গোবর, আবর্জ্জনা বা মরা প্রাণীর পচা দেহে ডিম পাড়ে। এই-সকল ডিম হইতে দুই এক দিনের মধ্যে, কখনো-বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুঁয়ো-পোকার মত বাচ্চা বাহির হয়। পায়খানার ময়লা বা মরা ইঁদুর-বেড়ালের গায়ে তোমরা হয় ত এই রকম মুড়ি-মুড়ি পোকা দেখিয়া থাকিবে। ইহাদের চোখ কান ও পা কিছুই থাকে না এবং গায়ে শুঁয়োও থাকে না। কেঁচোদের মত বুকে হাঁটিয়া ইহারা চলা-ফেরা করে। যে-সকল বিশ্রী জিনিসের মধ্যে মাছির বাচ্চারা জন্মে, সেই-সকল জিনিস খাইয়াই উহারা বড় হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, মাছিরা সংসারের কোনো উপকার না করিলেও, তাহাদের বাচ্চারা দুর্গন্ধ ও ময়লা জিনিস খাইয়া আমাদের কতকটা উপকার করে।

যাহা হউক, পচা জিনিস খাইয়া মাছির বাচ্চারা বড় হইলে ইহারা পুত্তলি-অবস্থায় মাটির তলায় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। আগেই বলিয়াছি, পুত্তলি-অবস্থায় থাকিবার জন্য ইহারা গায়ের উপরে বিশেষ কোনো আবরণ উৎপন্ন করে না। তখন গায়ের চামড়াই শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। ডানা চোখ

ইত্যাদি গজাইয়া উঠিলেই বাচ্চারা সেই আবরণ ছিঁড়িয়া সম্পূর্ণ মাছির আকারে বাহির হইয়া পড়ে। তার পরে ইহারা যে কি উৎপাতটাই করে, তাহা তোমরা সকলেই জান।

মাছিদের সকল উৎপাত সহ্য করা যায়, কিন্তু ইহারা আমাদের রান্নাঘরে ও খাবারের ঘরে ঢুকিয়া সময়ে সময়ে যে অনিষ্ট করে, তাহা অতি ভয়ানক। নোংরা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়ানো এবং নোংরা জিনিস খাওয়াই ইহাদের কাজ। গায়ে ও শুঁয়োতে ইহাদের যে-সকল লোম থাকে, তাহাতে নানা নোংরা জিনিস মাখাইয়া ইহারা যখন খাবারের উপরে বা গায়ের উপরে বেড়াইতে আরম্ভ করে, তখন বিশেষ ভয়ের কারণ হয়। জ্বরাতিসার, কলেরা, ডিপ্‌থেরিয়া ইত্যাদি অনেক রোগের বীজ পচা নর্দ্দামা ইত্যাদিতে জন্মে। মাছিরাও এই সব পচা জায়গায় বাস করে এবং ঐ-সকল রোগের বীজ পায়ে ও গায়ে মাখিয়া আমাদের খাবারের সঙ্গে মিশাইয়া দেয়। তার পরে রোগের বীজ-মিশানো খাবার খাইলেই লোকে প্রায়ই ঐ-সকল রোগে আক্রান্ত হয়।

রান্নাঘরে যাহাতে মাছি না যাইতে পারে এবং তৈয়ারি খাবারের উপরে যাহাতে তাহারা না বসিতে পারে, তোমরা তাহার উপরে নজর রাখিয়ো। দোকানের খাবারের উপরে যে কত রকম-বেরকম মাছি বসে, তাহার হিসাবই হয় না। এই সকল খাবার খাওয়া কখনই উচিত নয়।

কাঁটালে-মাছি

আষাঢ় মাসে কাঁটাল ভাঙ্গিলে ভন্ ভন্ শব্দ করিয়া যে বড় বড় নীল রঙের মাছি আসিয়া জমা হয়, তাহা বোধ হয়, তোমরা দেখিয়াছ। কাঁটাল যদি পচা হয়, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকে না। এই রকম মাছি তখন ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া পচা কাঁটাল প্রায় ঢাকিয়া ফেলে। আমরা এই মাছিদেরই কাঁটালে-মাছি বলিতেছি। ইংরাজিতে ইহাদিগকে (Blue Bottles) বলে।

চিত্র ৬১—কাঁটালে-মাছি

কাঁটালে-মাছির জীবনের ইতিহাস সাধারণ মাছিদের তুলনায় কিছু স্বতন্ত্র। সাধারণ মাছিরা প্রথমে ডিম পাড়ে। তার পরে সেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। কিন্তু কাঁটালে-মাছিরা ডিম পাড়ে না; একবারে ছোট ছোট শুঁয়ো-পোকার আকারের বাচ্চা প্রসব করে। পতঙ্গমাত্রেই ডিম প্রসব করে, কিন্তু ইহারা পতঙ্গ হইয়াও ডিম পাড়ে না,—ইহা খুব অদ্ভুত নয় কি? এই অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা যাহা বলেন, তাহাও আশ্চর্য্যজনক। তাঁহারা বলেন, এই মাছিদের ডিম পেটের ভিতরে ফুটিয়া যায়। তার পরে পেটে থাকিয়া

বাচ্চারা যখন একটু বড় হয়, তখন মাছিরা সেই বাচ্চা প্রসব করে। অর্থাৎ পেটের ভিতরেই ডিম ফুটাইয়া হাঁসেরা যদি প্রতিদিনই এক একটা ছানা প্রসব করিত, তাহা হইলে ব্যাপারটা যেমন অদ্ভুত হইত, কাঁটালে-মাছির বাচ্চা প্রসব করা কতকটা সেই রকমই আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই মাছিরা এক-একবারে পাঁচ-ছয় শত বাচ্চা প্রসব করে, কিন্তু সাধারণ মাছিরা দেড়-শত বা দুই-শতের বেশি ডিম পাড়ে না।

কেবল কাঁটালে-মাছিই যে এই রকমে বাচ্চা প্রসব করে, তাহা নয়। সাধারণ মাছিদের চেয়ে বড় একটু লম্বা আকারের কয়েক জাতি মাছিকেও বাচ্চা প্রসব করিতে দেখা যায়। কসাইখানার মাংসের উপরে বা পায়খানার ময়লায় যে বড় মাছিরা ভন্ ভন্ করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যেও অনেকে একবারে গোটা গোটা বাচ্চা প্রসব করে।

কুকুরে-মাছি

কুকুরের গায়ের মাছি তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহাদের চেহারা যেন গোলাকার, কতকটা কাঁকড়ার আকৃতির মত। গোরুর গায়েও এই রকম মাছি অনেক বসিয়া থাকিতে দেখা যায়।

কুকুরে-মাছির জীবন বড়ই অদ্ভুত। ইহারা ডিম পাড়ে না এবং বাচ্চাও প্রসব করে না। পেটের ভিতরেই ডিম

কোটে। তার পরে মায়ের পেটের খাদ্য খাইয়া বাচ্চারা পেটের ভিতরেই বড় হয় এবং সেখানেই পুত্তলি-অবস্থা পায়। কুকুরে-মাছিরা এই পুত্তলি-সন্তানদিগকেই প্রসব করে। সাধারণ মাছিরা পচা জায়গায় ডিম পাড়ে, কারণ ডিম ফুটিলে যে বাচ্চা হয়, তাহা পচা জিনিসই খায়। কুকুরে-মাছিরা পুত্তলি বাচ্চা প্রসব করে; পুত্তলিরা কিছুই খায় না; খোলসের ভিতরে মড়ার মত পড়িয়া থাকে। এজন্য কুকুরে-মাছিরা পুত্তলি বাচ্চা পচা জায়গায় প্রসব করে না। প্রায়ই শুক্‌নো ধূলামাটির বা আবর্জ্জনার মধ্যে ইহাদিগকে দেখা যায় গোরু, কুকুর প্রভৃতির রক্তই এই মাছিদের প্রধান খাদ্য।

চিত্র ৬২—কুকুরে-মাছি

কেবল কুকুরে-মাছিই যে গোরুর উপরে অত্যাচার করে, তাহা নয়। একজাতীয় মাছি গোরুর গায়ে ঘা করিয়া ভয়ঙ্কর উৎপাত করে। কেবল গোরু নয়, ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদিও ইহাদের হাত হইতে উদ্ধার পায় না।

এই মাছিরা গোরু বা ঘোড়ার গায়ে ডিম পাড়ে। সেগুলি কয়েক দিন গায়ের লোমে জড়াইয়া থাকিয়া ফুটিয়া উঠিলে ছোট বাচ্চা বাহির হয়। গোরুরা কি-রকমে

নিজেদের গা চাটে তাহা তোমরা দেখিয়াছ। গায়ে মাছির বাচ্চা বেড়াইতে আরম্ভ করিলে, তাহারা বাচ্চাগুলিকে গা হইতে চাটিয়া গিলিয়া ফেলে। মাছির বাচ্চার মুখে যে বাঁকানো বঁড়শি থাকে, তাহার কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। গোরুর মুখের ভিতরে গেলেও এই বাচ্চাদের সকলগুলি পেটে গিয়া পৌঁছে না; তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই বাঁকানো বঁড়শি দিয়া গোরুর গলার নালী কাম্‌ড়াইয়া পড়িয়া থাকে এবং ক্রমে গলার মাংস কাটিয়া সেখানে বাসা বাঁধে। এই রকমে আশ্রয় পাইয়া বেশ বড় হইয়া দাঁড়াইলে, বাচ্চারা গলার নালীর মধ্যে থাকিতে চায় না। তখন তাহারা বাহিরে আসে এবং গোরুর পিঠের চাম্‌ড়া কাটিয়া নূতন ঘর বনায়। এই রকমে পোকারা চামড়ার নীচে প্রবেশ করিলে, গোরুর গায়ের সেই জায়গাটা ফুলিয়া উঠে এবং তাহার অসুখ করে।

বাতাসের অক্সিজেন্ না পাইলে কোনো প্রাণীই বাঁচে না। মাছির বাচ্চারা যখন গোরুর পিঠের ঘায়ে বাস করে, তখন তাহাদেরও বাতাসের দরকার হয়। এই জন্য ইহারা কখনই ঘায়ের মুখ বন্ধ হইতে দেয় না। গোরুর গায়ের চাম্‌ড়া গোলাকারে কাটিয়া ঘা খোলা রাখে এবং বাতাস হইতে অক্সিজেন্ টানিতে থাকে।

যাহা হউক, ঘায়ে থাকিয়া বেশ বড় হইয়া পড়িলে, পোকাগুলি আর সেখানে থাকিতে চায় না। তখন ধীরে ধীরে ঘা হইতে বাহির হইয়া কোনো নিরিবিলি জায়গায়

পুত্তলি-অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ডানাওয়ালা মাছির আকারে উড়িতে আরম্ভ করে। এই মাছিরা গোরুদের কি-প্রকার শত্রু, একবার ভাবিয়া দেখ! ইহাদের উৎপাতে দেশের গোরুগুলা জখম হইয়া যায়।

কাঁটালে-মাছিরাও গোরুর কম শত্রু নয়। গায়ের কোনো জায়গায় একটু ঘা দেখিলেই তাহারা ঘায়ে বসিয়া বাচ্চা প্রসব করিতে থাকে। পরে সেই সকল বাচ্চা ঘায়ের পচা মাংস খাইয়া বড় হইলে ঘা বাড়িয়া উঠে এবং শেষে গোরু মারা পড়ে।

ডাঁশ-মাছি

ডাঁশ মাছি তোমরা দেখ নাই কি? ইহাদের আকৃতি সাধারণ মাছিদেরই মত, কেবল আকারে একটু বড়। গোরু ঘোড়া ছাগল, এমন কি মানুষের গায়ে বসিয়াও ইহারা রক্ত শুষিয়া খায়। গোয়ালের গোরুদের উপরে ইহাদের উৎপাত বড়ই বেশি। তাই দুই বেলা খড় জ্বালাইয়া গোয়ালে ধোঁয়া দিতে হয়, ইহাতে ডাঁশ পালাইয়া যায়। স্ত্রী-ডাঁশেরাই রক্ত খায়। পুরুষেরা গাছে ফুল-ফলের রস খাইয়া বেড়ায়।

চিত্র ৬৩—ডাঁশ মাছি

কোনো রোগীর রক্ত সুস্থ লোকের রক্তের সহিত মিশিলে, সুস্থ ব্যক্তি রোগী হইয়া দাঁড়ায়। ডাঁশেরা রোগা গোরুর রক্তের বিষ সুস্থ গোরুর রক্তে মিশাইয়া বড়ই অনিষ্ট করে। ইহাতে অনেক সুস্থ গোরুর দেহে রোগ দেখা দেয়। আমাদের যেমন বসন্ত, হাম, প্লেগ প্রভৃতি ছোঁয়াচে ব্যারাম আছে, গোরুদেরও সেই রকম অনেক ব্যারাম আছে। ডাঁশেরাই এই সব ব্যারাম গোরুদের মধ্যে ছড়ায়।

ডাঁশ-মাছিরা কখনই শুক্‌নো জায়গায় ডিম পাড়ে না। পুকুর বা ডোবার ধারে লতাপাতার গায়ে ইহাদের ডিম দেখা যায়। তার পরে সেই সকল ডিম হইতে শুঁয়ো-পোকার আকারের বাচ্চা বাহির হইলে, সেগুলি পুকুরের ধারের ভিজা মাটি বা কাদায় আশ্রয় লয়। পুকুরের পচা কাদায় ছোট পোকা-মাকড়ের অভাব নাই, ডাঁশের বাচ্চারা সেই সকল পোকা-মাকড় খাইয়া বড় হয়। শেষে পুত্তলি-অবস্থায় থাকিবার সময় হইলে উহারা আর কাদায় থাকে না। তখন বুকে হাঁটিয়া পুকুর হইতে একটু দূরে কোনো শুক্‌নো জায়গায় মাটির তলায় আশ্রয় লয় এবং সেখানে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া গা ঢাকা দিয়া ঘুমায়। তার পরে ডানা পা ইত্যাদি গজাইলে, ইহারা ভোঁ করিয়া উড়িয়া রক্ত খাইবার চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়ে।

মশা

এইবার আমরা মশার কথা বলিব। ছোট দেহে লম্বা লম্বা ছয়খানা পা থাকায় ইহাদিগকে কি বিশ্রীই দেখায়! যেমন চেহারায় বিশ্রী, তেমনি কাজেও বিশ্রী। ইহারা মানুষকে কাম্‌ড়াইয়া অস্থির করে। ইহাদের মুখে নলের মত লম্বা শুঁড় থাকে। তার পরে গায়ের চাম্‌ড়া কাটিয়া রক্ত চুষিয়া খাইবার জন্য ছুঁচের মত চারিটা অস্ত্রও লাগানো থাকে। আবার মাথার দুই পাশে হাজার হাজার চোখ। মশার দাঁত নাই। দাঁত দুটাই লম্বা হইয়া ছুঁচের মত হইয়াছে। এই অস্ত্র দিয়া গায়ের চাম্‌ড়া কাটা হইলে, মশারা মুখ হইতে এক রকম লালা বাহির করিয়া কাটা ঘায়ে লাগাইয়া দেয়। আমাদের শরীরের কোনো জায়গায় ক্ষত হইলে কি হয়, তোমরা তাহা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ,—তখন পাশ হইতে রক্ত আসিয়া বেদনার জায়গায় জড় হয়। কাটা জায়গায় মশার মুখের লালা লাগিলে অবিকল তাহাই হয়। লালায় এক রকম মৃদু বিষ থাকে, কাজেই তাহা জ্বালা-যন্ত্রণার সুরু করে এবং পাশ হইতে তাজা রক্ত আসিয়া সেখানে জমা হয়। মশারা এই রকমে শুঁড়ের কাছে রক্ত পাইয়া তাহা চুষিয়া খাইতে থাকে।

একবার পেট ভরিয়া রক্ত খাইলে মশারা দুই তিন দিন আর কিছু খায় না। এই কয়েক দিন তাহারা চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, তার পরে গা ঝাড়া দিয়া আবার রক্তের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়ে। রক্ত খাইলে যে কেবল ইহাদের শরীরই পুষ্ট হয়, তাহা নয়; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পেটের ভিতরকার ডিমগুলিও পুষ্ট হয়।

স্ত্রী ও পুরুষ মশা

মশাদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। স্ত্রী ও পুরুষের চেহারাতে অনেক তফাতও দেখা যায়। স্ত্রীদেরই মুখে ঐ রকম শুঁড় ও ছুঁচ লাগানো থাকে। পুরুষ মশারা নিতান্ত নিরীহ প্রাণী। তাহারা রক্ত খায় না এবং বেশি দিন বাঁচেও না। ডানা গজাইলে দুই এক দিনমাত্র এদিক্ ওদিক্ উড়িয়া ফুলফলের রস শুষিয়া খায় এবং তার পরে মরিয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রক্ত খাওয়ার জন্য সব মশাকে দোষ দেওয়া যায় না। স্ত্রী-মশারাই দুষ্ট। ইহারাই আমাদের কানের গোড়ায় ভন্ ভন্ শব্দ করিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয় এবং রক্ত খাইয়া হাত পা ফুলাইয়া দেয়।

স্ত্রী ও পুরুষ সকল মশারই দুখানা করিয়া ডানা থাকে। কিন্তু ইহা পিঁপ্ড়ে বা বোল্তাদের ডানার মত স্বচ্ছ নয়।

তা'ছাড়া মাছিদের ডানার গোড়ায় যে দুটি খুঁটির মত অংশ থাকে, মশার ডানার কাছে তাহাও দেখা যায়। উড়িবার সময়ে দেহকে সাম্য অবস্থায় রাখার জন্য ঐ খুঁটি দুটা দরকার হয়।

মশার ডিম ও বাচ্চা

মশার ডিম পাড়া, ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হওয়া এবং সেই বাচ্চা হইতে নূতন মশার উৎপত্তি হওয়া—সকলি বড় আশ্চর্য্য-জনক।

যে প্রাণী ডাঙায় বাস করে এবং ডাঙাতেই চরিয়া বেড়ায় তাহারা প্রায়ই ডাঙাতেই ডিম পাড়ে। কিন্তু মশারা তাহা করে না। পচা পুষ্করিণী বা গর্ত্তের বদ্ধ জলই তাহাদের ডিম পাড়িবার জায়গা। কখনো টবের, নর্দ্দামার ও পাতকূয়োর বদ্ধ জলেও তাহাদিগকে ডিম পাড়িতে দেখা যায়।

ডিম পাড়ার সময় হইলেই মশারা নিকটের নোংরা এবং বদ্ধ জলের দিকে ছুটিয়া চলে এবং তাহাতে ডিম পাড়ে। সেগুলি জলে ভাসিয়া বেড়ায়, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসে না। ডিম পাড়া শেষ হইলে মশারা সেগুলিকে পিছনের পা দিয়া

একত্র করে এবং তার পরে লালার মত এক রকম জিনিস দেহ হইতে বাহির করিয়া, সেগুলিকে পরস্পর আট্‌কাইয়া রাখে। এই রকমে ডিমগুলি একত্র থাকিয়া ভেলার মত জলের উপরে ভাসিয়া বেড়ায়।

মশাদের ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইতে বেশি সময় লাগে না। শীঘ্রই প্রত্যেক ডিম হইতে একএকটি বাচ্চা বাহির হইয়া জলের উপরে কিল্‌বিল করিতে থাকে। এই বাচ্চাদের চেহারা বড়ই অদ্ভুত। মুখে এক এক গোছা চুলের মত লোম লাগানো থাকে। জলের ছোট ছোট পোকা-মাকড়দিগকে ইহারা ঐ চুলের গোছা দিয়া ঠেলিয়া মুখে পুরিয়া দেয়। জলে বাস করিবার সময়ে জলের পোকাই ইহাদের খাদ্য।

মশার বাচ্চা কখনই মাথা উপরে রাখিয়া মাছের মত সাঁতার দেয় না। লেজ উঁচু এবং মাথা নীচু করিয়া সাঁতার দেওয়াই ইহাদের স্বভাব। মাছের মত ইহাদের কান্‌কো নাই। আমরা যেমন নাকের ছিদ্র দিয়া বাতাস টানিয়া বাঁচিয়া থাকি, মশার বাচ্চারাও সেই রকম লেজে-লাগানো সরু নলের মত ছিদ্র দিয়া বাতাস টানিয়া বাঁচিয়া থাকে। এইজন্যই লেজ উপরে রাখিয়া ইহারা সাঁতার দেয় এবং যখন দরকার হয় তখন লেজের ছিদ্রটা জলের উপরে উঠাইয়া বাতাস' টানিয়া লয়। মুখে যেমন চুলের গোছা থাকে, ইহাদের লেজেও সেই রকম কয়েকগাছি চুল দেখা যায়।

এখানে মশার ডিম ও বাচ্চার ছবি দিলাম। তোমরা এই রকম পোকা জলে কখনই দেখ নাই কি? গ্রীষ্ম ও

বর্ষাকালে চৌবাচ্চা বা টবে কিছুদিন ধরিয়া জল পচিতে থাকিলে, তাহাতে এই রকম লম্বা পোকা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষের সাড়া পাইলে বা কোনো শব্দ শুনিলে সেগুলি শরীর ও লেজ নাড়িয়া এবং মুখ বাঁকাইয়া জলের মধ্যে ডুব-সাঁতার কাটে। এইগুলিই মশার বাচ্চা। যে জলে এই রকম মশার বাচ্চা থাকে, তাহাতে একটু কেরোসিন তেল ঢালিয়া দিলে সেগুলি মরিয়া যায়। জলের সঙ্গে কেরোসিন মেশে না। কাজেই জলে ঢালিয়া দিলে তাহা পাত্‌লা সরের মত হইয়া জলের উপরিভাগ ঢাকিয়া রাখে। তার পরে মশার বাচ্চারা বাতাস লইবার জন্য লেজ উপরে উঠাইলেই নিশ্বাস টানিবার নলে কেরোসিন ঢুকিয়া যায়। ইহাতে উহারা দম আট্‌কাইয়া মারা পড়ে।

মশার বাচ্চা প্রায় পনেরো দিন জলে বাস করে এবং এই সময়ের মধ্যে চারি বার খোলস ছাড়ে। তার পরে

গোলাকার পিণ্ডের মত হইয়া পুত্তলি-অবস্থায় থাকার পরে খোলস ছাড়িয়া ডানাওয়ালা মশা হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু খোলস ছাড়িলেই উহারা উড়িতে পারে না। আমরা নৌকায় চড়িয়া যেমন জলের উপরে ভাসিয়া বেড়াই, নূতন মশারাও ঠিক্ সেই রকমে নিজের গায়ের খোলসের উপরে বসিয়া কিছুক্ষণ কাটাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ডানা মেলিয়া গায়ের জল শুকাইতে থাকে। ইহার পরে তাহারা আহারের সন্ধানে উড়িতে সুরু করে।

ম্যালেরিয়ার মশা

তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ, মশারা ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাইলে, ম্যালেরিয়া জ্বরের বীজ রক্তের সঙ্গে তাহাদের পেটের ভিতরে যায়। তার পরে ঐ মশারাই যখন কোনো সুস্থ লোককে কামড়াইতে আরম্ভ করে, তখন তাহারা পেটের ভিতরকার ম্যালেরিয়ার বীজ সেই সুস্থ ব্যক্তির রক্তে মিশাইয়া দেয়। খোস-পাচড়ার বীজ সুস্থ লোকের গায়ে লাগিলে, তাহারো খোস-পাচড়া হয়। হাম বা বসন্তের বীজ কোনো-গতিকে কাহারো রক্তের সঙ্গে মিশিলে তাহারো ঐ-সকল রোগ হয়। মশারা ম্যালেরিয়ার বীজ লইয়া সুস্থ লোকের রক্তে লাগাইলে, তাহারো ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। ডাক্তাররা বলেন,

আমাদের দেশের গ্রামে গ্রামে যে এত ম্যালেরিয়া, তাহা মশারাই ছড়াইয়া দেয়।

যেমন কুকুর বেড়ালের মধ্যে অনেক রকম জাতি থাকে, সেই রকম মশাদের মধ্যেও নানা জাতি আছে। নানা জাতি মশার মধ্যে কেবল এক জাতিই ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়ায়। অপর মশারা ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাইলে, তাহা পেটের ভিতরে নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই, ইহারা সুস্থ লোককে কামড়াইলে, শরীরে ম্যালেরিয়া বীজ প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, ম্যালেরিয়া রোগের জন্য সকল মশার দোষ দেওয়া যায় না। পঞ্চাশ ষাট্ রকম মশার মধ্যে এক জাতিই ভয়ানক অপকারী। ইহারা রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার বীজ খাইলে তাহা হজম করিতে পারে না। বরং পেটের ভিতরে বীজগুলিকে ভয়ানক জোরালো করিয়া তুলে।

তোমরা বোধ হয়, এই মশাদের নাম জান না। ইহাদিগকে ইংরাজীতে এনোফিল্ (Anophele) বলে। ইহাদের জীবনের ইতিহাস সাধারণ মশাদেরি মত। যে-সকল খুঁটিনাটি ব্যাপারে অন্য মশাদের সহিত ইহাদের অমিল আছে আমরা কেবল তোমাদিগকে তাহারি কথা বলিব।

পর পৃষ্ঠায় যে দুইটি মশার ছবি দিলাম, প্রথমটি এনোফিল্ অর্থাৎ ম্যালেরিয়া মশা এবং দ্বিতীয়টি সাধারণ মশার ছবি। ম্যালেরিয়া মশা লেজের দিক্‌টা উঁচু ও মাথাটা

হেঁট করিয়া আছে। যখন গায়ের উপরে বা ডালপালায় বসে, তখন উহারা ঐ-রকমে লেজ উঁচু ও মাথা হেঁট করে।
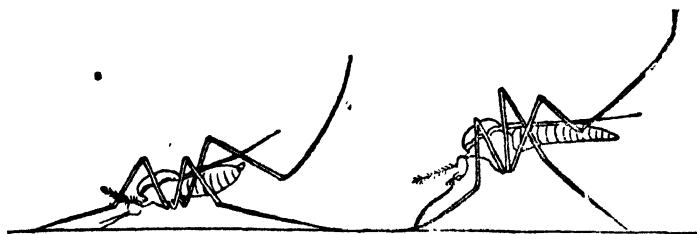
চিত্র ৬৫—ম্যালেরিয়া মশা ও সাধারণ মশা

কিন্তু সাধারণ মশারা কখনই ঐ রকম-ভঙ্গীতে বসে না। তাহারা দ্বিতীয় ছবির মত মাথা ও লেজ মাটির সঙ্গে সর্ব্বদাই সমান্তরাল করিয়া রাখে। সুতরাং, মশারা যখন তোমাদের দেওয়ালের গায়ে বা বাগানের গাছের পাতায় বসিয়া থাকিবে, তখন বসিবার ভঙ্গী দেখিয়া কোন্‌টি কোন্ জাতি মশা, তাহা তোমরা অনায়াসে বুঝিয়া লইতে পারিবে।

নানা রকম মশা যখন বাচ্চা-অবস্থায় জলে ডুবিয়া থাকে, তখন কোন্ বাচ্চারা ম্যালেরিয়ার মশা, তাহাও বুঝা যায়। ইহারা কখনই জলে সম্পূর্ণ ডুবিয়া থাকিয়া বিশ্রাম করে না। যখন অন্য বাচ্চারা জলের গভীর অংশে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, তখন ম্যালেরিয়া মশারা জলের ঠিক্ নীচেই দেহটাকে পাশাপাশিভাবে লম্বা করিয়া ভাসিতে থাকে। ইহা দেখিয়া তোমরা ম্যালেরিয়া মশাদের বাচ্চাকে চিনিয়া লইতে

পারিবে। তা'ছাড়া লেজের ও গায়ের লোম দেখিয়াও ইহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায়। সাধারণ মশার বাচ্চাদের লেজে লোম থাকে বটে, কিন্তু তাহা পরিমাণে বেশি নয়। ম্যালেরিয়া মশার বাচ্চাদের লেজের শেষে এবং গায়ে এমন গোছা গোছা লোম থাকে যে, তাহা খালি-চোখেই নজরে পড়ে। ম্যালেরিয়া-মশাদের ডানায় যে ছিটে-ফোঁটা দাগ থাকে তাহা দেখিয়াও উহাদিগকে চিনিয়া লওয়া যায়।

গান্ধী পোকা

(RHYNCHOTA)

মশা মাছি ডাঁশ ইত্যাদি দ্বিপক্ষ পতঙ্গের কথা বলিলাম। এখন তোমাদিগকে গান্ধী পোকাদের পরিচয় দিব।

এই দলেও নানা আকৃতি ও নানা রকমের পতঙ্গ আছে। অনেকেরই দু'খানা করিয়া স্বচ্ছ ডানা থাকে এবং মুখে মশা-মাছিদের মত শুঁড় থাকে। ইহাদের কতকগুলির মুখের দাঁত লম্বা ছুঁচের মত ধারালো হয়। গাছপালার রস ও বড় প্রাণীদের রক্ত ইহাদেরো খাদ্য। ছারপোকারা এই দলের প্রাণী। ছারপোকার ডানা নাই, সুতরাং সকল গান্ধী পোকারই যে ডানা গজায়, তাহা বলা যায় না।

তোমরা গান্ধী পোকা দেখ নাই কি? বর্ষাকালে এই দলের নানা রকম পোকা আলোর কাছে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাদের গায়ে হাত ঠেকিলে হাতে বিশ্রী গন্ধ হয়। এই গন্ধ কিসে হয়, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। ইহাদের সম্মুখের পায়ের গোড়ায় একএকটি কোষে তেলের মত এক রকম রস জমা হয়। ভয় করিলে বা বিরক্ত হইলে পোকারা ঐ রস ইচ্ছামত শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে পারে।

গান্ধী পোকার গায়ের গন্ধ, ঐ রসেরই গন্ধ। টিক্‌টিকি ব্যাঙ্ বা পাখীরা যখন এই পোকাদের ধরিতে যায়, তখন ঐ বদ্ গন্ধ বাহির করিয়া তাহারা আত্মরক্ষা করে। গায়ের বিশ্রী গন্ধ পাইয়া কোনো প্রাণীই তাহাদের কাছে আসে না।

হঠাৎ দেখিলে এই দলের অনেক পতঙ্গকেই গোবরে পোকার মত কঠিন-পক্ষ প্রাণী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ইহারা সে দলের নয়। স্ত্রী-গান্ধী পোকারা প্রায়ই গাছের গায়ে বা পাতায় ডিম পাড়ে। কিন্তু ডিম হইতে শুঁয়ো-পোকার আকারের বাচ্চা বাহির হয় না। বাচ্চাগুলিকে সম্পূর্ণ আকারের দেখা যায়। কিন্তু এই সময়ে বাচ্চাদের ডানা থাকে না। দুই তিনবার গায়ের খোলস বদ্‌লাইলে ডানা গজায়। তখন ইহারা সম্পূর্ণ পতঙ্গের রূপ পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গান্ধী পোকারা সাধারণ পতঙ্গের মত চেহারা বদ্‌লাইয়া বড় হয় না। কিন্তু তথাপি ইহারা পতঙ্গ। অপর পতঙ্গদেরই মত ইহাদের শরীর অনেক আংটির মত খোলা দিয়া প্রস্তুত।

ছারপোকা

ছারপোকা তোমরা সকলেই দেখিয়াছ এবং তাহাদের কামড়ে হয় ত কষ্টও পাইয়াছ। ইহারা গান্ধী পোকার দলের পতঙ্গ। ইহাদের ডানা নাই। তাই কতকটা রক্ষা পাওয়া যায়। ডানা থাকিলে এক বাড়ীর ছারপোকা উড়িয়া গিয়া আর এক বাড়ীর চেয়ার টেবিলের ফাঁকে বা বিছানা বালিশে আড্ডা করিত। তখন কি ভয়ানক ব্যাপারই হইত। ইহারা খুব সৌখীন পতঙ্গ,—প্রাণীর গরম-গরম রক্ত ছাড়া আর কিছু ইহাদের মুখে রোচে না।

এখানে ছারপোকার একটা বড় ছবি আঁকিয়া দিলাম। তার পরে ইহাদের মুখেরও একটা ছবি দিলাম। সাধারণ পতঙ্গদের মত ইহাদের ছয়খানি পা আছে। মাথা ও বুক খুব ছোট। লেজের অংশটাই চওড়া ও বড়। মাথার নীচে রক্ত শুষিয়া খাইবার যন্ত্রটা কি রকম, ছবি দেখিলেই তোমরা তাহা জানিতে পারিবে।

চিত্র ৬৬—ছারপোকা

ছারপোকারা কি-রকমে ডিম পাড়ে তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। চেয়ার টেবিল বিছানা-বালিশ ও খাট-পালঙের ফাঁকই ইহাদের ডিম পাড়ার জায়গা। পাখীদের মত ইহারা ডিমে তা দেয় না। প্রসবের পর প্রায়ই এক সপ্তাহের

মধ্যে ডিমগুলি আপনা হইতেই ফুটিয়া যায় এবং তাহা হইতে সাদা বালির কণার মত ছারপোকার ছোট বাচ্চা বাহির হয়। সাধারণ পতঙ্গদের ডিম হইতে যেমন প্রথমে শুঁয়ো-পোকার আকারে বাচ্চা জন্মে, ছারপোকার ডিম হইতে তাহা হয় না। ডিম হইতে সম্পূর্ণ আকারেরই ছারপোকা বাহির হয়। তাই ইহারা ডিম ছাড়িয়াই রক্ত খাইতে আরম্ভ করে। যেমন রক্ত খায় তেমনি আকারে বড় হয় এবং বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের খোলস বদ্‌লায়। যেখানে ছারপোকার আড্ডা, সেখানে খোঁজ করিলে তোমরা ছারপোকার গায়ের সাদা খোলস অনেক দেখিতে পাইবে। হঠাৎ দেখিলে সে-গুলিকে ছারপোকার শুক্‌নো মৃত-দেহ বলিয়া মনে হয়।

তিন-চারিবার খোলস ছাড়ার পরে, ছারপোকারা সম্পূর্ণ আকার পায়। কতদিনে ইহারা বড় হয়, তাহা হিসাব করিয়া বলা যায় না। যাহারা তাজা রক্ত খাইবার সুবিধা পায়, তাহারাই শীঘ্র শীঘ্র খোলস বদ্‌লাইয়া বড় হইয়া পড়ে। পেট ভরিয়া রক্ত না খাইলে ইহারা কখনই খোলস বদ্‌লায় না।

মশারা গা হইতে রক্ত টানিয়া লইবার পূর্ব্বে কাটা ঘায়ে এক প্রকার মৃদু বিষ ঢালিয়া দেয়, ইহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। ছারপোকারা মশাদেরই মত ছুঁচের মত দাঁত দিয়া গায়ে ছিদ্র করে এবং তাহাতে ঐ-রকমের মৃদু বিষ ঢালিয়া দেয়। ইহাতে কাটা-ঘায়ে রক্ত জমা হইলে, সেই

রক্তই উহারা চুষিয়া খায়। ছারপোকার কামড়ের জ্বালা-যন্ত্রণা সেই বিষ হইতেই জন্মে এবং বিষেই কামড়ের জায়গাটা ফুলিয়া উঠে।

ম্যালেরিয়া জ্বরের বিষ মশার শরীরে প্রবেশ করিলে খুব জোরালো হয়, ইহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। আসাম ও বাংলাদেশে কালাজ্বর নামে এক-রকম ব্যারামে লোকে বড় কষ্ট পায় এবং তাহাতে অনেক লোক মারাও যায়। ডাক্তাররা বলেন, কালাজ্বরের রোগীর শরীরে যে ব্যারামের বীজ থাকে, রক্তের সঙ্গে ছারপোকার পেটে গেলে তাহাও খুব জোরালো হয়। তার পরে যখন সেই ছারপোকা অপর লোককে কামড়ায় তখন রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করিয়া সুস্থ ব্যক্তিকে অসুস্থ করিয়া তুলে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ছারপোকারা মশাদেরই মত মানুষের পরম শত্রু। এই শত্রুরা যাহাতে আমাদের ঘরে দুয়ারে জায়গা না পায়, তাহার দিকে নজর রাখা সকলেরি উচিত।

ঋজুপক্ষ পতঙ্গ

(ORTHOPTERA)

অনেক পতঙ্গের কথাই বলিলাম। কিন্তু ফড়িং আর্‌সুলা উচ্চিংড়ে ঘুর্‌ঘুরে পোকা প্রভৃতি আমাদের জানাশুনা কতকগুলি পোকা-মাকড়ের কথা এখনো বলা হয় নাই। ইহারা সকলেই ঋজুপক্ষ দলের পোকা।

এই দলের প্রায় সকলেরি চারিখানা করিয়া ডানা থাকে। উপরের ডানা জোড়াটি কঠিন-পক্ষ পতঙ্গদের ডানার মত শক্ত, আর দুখানা বোল্‌তা বা মাছিদের ডানার মত পাত্‌লা। ডানা কঠিন ডানায় ঢাকা থাকে। ইহার আকার কতকটা লম্বা এবং পিঠের উপরে সোজাভাবে পড়িয়া থাকে। এই জন্য এই দলের পতঙ্গদিগকে ঋজুপক্ষ পতঙ্গ বলিতেছি। আর্‌সুলা বা ফড়িঙের অভাব নাই। তোমাদের ভাণ্ডার ঘরে বা বাগানে খোঁজ করিলে ইহাদের সন্ধান পাইবে। ফড়িং ও আর্‌সুলার ডানা কি-রকমে গায়ের উথরে পড়িয়া থাকে দেখিয়ো।

ঋজুপক্ষ পোকাদের ডিম ফুটিয়া বাচ্চা হওয়া এবং বাচ্চা হইতে সম্পূর্ণ পোকার উৎপত্তি হওয়ার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। ইহারা ডিম পাড়ে, কিন্তু ডিম হইতে শুঁয়ো

পোকার মত বাচ্চা বাহির হয় না। সম্পূর্ণ পতঙ্গের যেমন আকৃতি, ডিমের বাচ্চারা প্রায় সেই-রকম চোখ মুখ লেজ ও পা লইয়া জন্মে। এই অবস্থায় তাহাদের কেবল ডানা থাকে না। শরীরের বৃদ্ধির সঙ্গে বার বার গায়ের খোলস ছাড়ে এবং ধীরে ধীরে ডানা গজাইয়া উঠে।

গাছের কচি-পাতা ফুল ও ফল এই পতঙ্গদলের প্রধান খাদ্য। কেহ কেহ ছোট পোকা-মাকড় ধরিয়াও খায়,—কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প।

ফড়িং

ফড়িং তোমাদের খুব জানাশুনা পোকা। রাত্রিতে সবুজ ফড়িংরা হঠাৎ আলোর কাছে আসিয়া কি-রকম নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকে, তোমরা দেখ নাই কি? বসিয়াই ইহারা ঘোড়ার মাথার মত লম্বা মাথাটা গম্ভীরভাবে নাড়িতে থাকে। কখনো আবার সম্মুখের পা দুখানি মুখের মধ্যে পুরিয়া আস্তে আস্তে চিবাইতে থাকে। মুখের কাছে পাতা বা অন্য কিছু রাখিলে ভয় পায় না; বেশ নিশ্চিন্ত-ভাবে সেগুলিকে মুখের ভিতরে পূরিয়া দেয়। তার পরে হঠাৎ ফড়্-ফড়্ করিয়া যেখানে-ইচ্ছা উড়িয়া যায়।

আতসী কাচ দিয়া একটা ফড়িঙের মুখের আকৃতি একবার দেখিয়া লইয়ো। মুখের উপরে ও নীচে দুখানা ওষ্ঠ, খাদ্য চিবাইয়া খাইবার জন্য দুটা করাতের মত দাঁত এবং চিবাইবার জন্য দুইটি চোয়াল স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। পতঙ্গমাত্রেরই মুখে এই ছয়টা অঙ্গ থাকে, একথা তোমাদিগকে আগেই বলিয়াছি। মশা মাছি প্রজাপতি ইত্যাদির মুখের এই অঙ্গগুলি কোনোটা লম্বা হইয়া, কোনোটা ছুঁচ্‌লো হইয়া শুঁড়, ছুঁচ্ ইত্যাদির আকার পাইয়াছে। কিন্তু ফড়িঙের মুখের অঙ্গ বেশি বদ্‌লায় নাই।

এখানে ফড়িঙের একটা ছবি দিলাম। বুকের তিনটি আংটি হইতে কি-রকমে তিন জোড়া পা বাহির হইয়াছে, ছবি দেখিলেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে। ফড়িঙের সম্মুখের দুই জোড়া পা ছোট। এইগুলি দিয়া ইহারা চলিতে পারে। পিছনের দুখানা পা খুব লম্বা। ইহারা এই পায়ের উপরে জোরে ভর দিয়া লাফালাফি করে; এই লম্বা পায়ে হাঁটার সুবিধা হয় না।

ফড়িঙের মাথার দুই পাশে যে দুটা চোখ আছে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহাদের চোখ মাছির চোখের মত বড় নয়। প্রধান চোখ ছাড়া ইহাদের মাথার উপরে আরো তিনটা ছোট চোখ আছে। সকল ফড়িঙের মাথাতেই দুটা শুঁয়ো লাগানো থাকে। স্ত্রী-ফড়িঙের লেজের শেষে হুলের মত একটা অঙ্গ দেখা যায়। ইহা ডিম পাড়িবার যন্ত্র। এই হুল মাটির তলায় প্রবেশ করাইয়া প্রত্যেক ফড়িং প্রায় এক-শত দেড়-শত ডিম পাড়ে। কিছু দিন মাটির তলায় থাকার পরে, সেগুলি হইতে ফড়িঙের ছোট বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চাদের প্রথমে ডানা থাকে না।
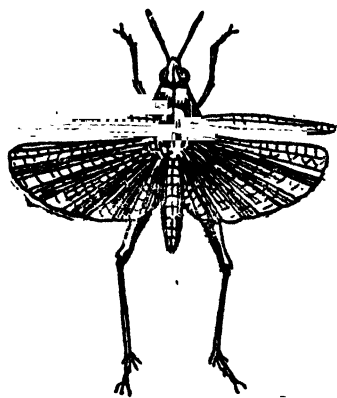
চিত্র ৬৭—ফড়িং

কাজেই তাহারা উড়িতেও পারে না; কেবল লাফাইয়া চলা-ফেরা করে। কচি ঘাস-পাতাই বাচ্চাদের প্রধান আহার। খাইয়া মোটা হইলেই ইহারা খোলস ছাড়িতে আরম্ভ করে। পাঁচ-ছয় বার খোলস ছাড়ার পরে, বাচ্চাগুলি ডানাওয়ালা সম্পূর্ণ পতঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

ফড়িঙের কান বড় মজার জিনিস। বড় প্রাণীদের কান মাথার উপরেই লাগানো থাকে, কিন্তু ফড়িংদের কান দেহের সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। সাধারণ ফড়িঙের সম্মুখের পা পরীক্ষা করিলে, তাহাতে একটু নীচু গোলাকার জায়গা দেখা যায়। ইহাই ফড়িঙের কান। কোনো ফড়িঙের কান আবার পায়ের গোড়ায় অর্থাৎ বুকের উপরেও বসানো থাকে।

সকল ফড়িঙেরই যে রঙ্ সবুজ ও পিছনের পা লম্বা, তাহা নয়। মেটে, লাল্‌চে, ধোঁয়াটে প্রভৃতি নানা রঙের ফড়িং দেখা যায়। আবার সম্মুখের পা লম্বা ও পিছনের পা ছোট এ-রকম অনেক ফড়িং আছে। গাছের তাজা পাতা ও কচি ঘাস যে-সকল ফড়িঙের খাদ্য, তাহারা প্রায়ই সবুজ রঙের হয় এবং মাঠের শুক্‌নো ঘাস ও খড়ের মধ্যে যাহারা লুকাইয়া থাকে, তাহাদের রঙ্ মাটি ও শুক্‌নো ঘাসের রঙের মত হয়। পাখী ব্যাঙ্ প্রভৃতি প্রাণীরা ফড়িঙের পরম শত্রু। তাই ঘাস পাতার সঙ্গে রঙ্ মিলাইয়া ইহারা শত্রুদের ফাঁকি দেয়।

গঙ্গা ফড়িং তোমরা দেখ নাই কি? ইহাদের সম্মুখের দুখানা পা খুব লম্বা। সরু গলার উপরে ছোট মাথাটি বসানো থাকে। আমরা ঘাড় বাঁকাইয়া যেমন পাশের জিনিস-পত্র দেখি, ইহারাও সেই রকমে ঘাড় বাঁকাইয়া চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া লয়। ছোট পোকা-মাকড় সম্মুখে পাইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া খাইয়া ফেলে। ইহাদের সম্মুখের পায়ে করাতের দাঁতের মত ধারালো কাঁটা লাগানো থাকে। ছোট পোকা সম্মুখে পাইলে তাহারা সেই কাঁটা-লাগানো পায়ে চাপিয়া পোকাগুলিকে পিষিয়া নষ্ট করে। জাঁতির মধ্যে সুপারি দিয়া আমরা যেমন সুপারি কাটি, ধারালো পায়ের ফাঁকে ফেলিয়া উহারা সেই রকমে পোকা-মাকড়কে মারিয়া ফেলে। এই রকমে গঙ্গা ফড়িংরা প্রতিদিন গাদা গাদা পোকা মারিয়া খায়।

গঙ্গা ফড়িংরা বড় ঝগড়াটে। দুইটা ফড়িং একত্র হইলে পরস্পর ভয়ানক লড়াই বাধিয়া যায় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত দুইয়ের মধ্যে একটা না মারা পড়ে, ততক্ষণ পূরা দমে লড়াই চলে। লড়াইয়ে জিতিয়া ইহারা বিপক্ষের মৃত দেহ ফেলিয়া রাখে না। আধ-মরা অবস্থাতেই সেটিকে পায়ের ফাঁকে পিষিয়া খাইয়া ফেলে। ইহারা ছোট প্রজাপতির ভয়ানক শত্রু, প্রজাপতি ধরিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে খাইয়া ফেলে। যদি তোমরা এই ফড়িং ধরিবার চেষ্টা কর, তবে সাবধানে থাকিয়ো। সুবিধা পাইলে কামড়

দিতে ছাড়িবে না। বিদেশী মানুষকে একা পাইলেই আফ্রিকার অসভ্য লোকেরা তাহাদিগকে খাইয়া ফেলিত। তোমরা হয় ত অনেক বইয়ে এই-রকম মানুষ-খেগো লোকের গল্প শুনিয়াছ। এখন আর মানুষকে মানুষ খাইতে দেখা যায় না; কিন্তু ইতর প্রাণীদের মধ্যে এই স্বভাব আজও আছে।

এখানে আর এক-রকম ফড়িঙের ছবি দিলাম। তোমরা নিশ্চয়ই এই রকম পোকা বাগানের শুক্‌নো ঘাসের মধ্যে দেখিয়াছ। দেখিলে মনে হয় যেন, ইহারা এক একটি শুক্‌নো ঘাস। কিন্তু ভালো করিয়া দেখিলে ইহাদিগকে ফড়িং ভিন্ন আর কিছুই মনে হইবে না। শুক্‌নো ঘাসের রঙের সঙ্গে নিজের গায়ের রঙ্ মিলাইয়া ঠিক ঘাসের মত চেহারায় ইহারা মাঠে পড়িয়া থাকে। এই জন্য পাখী ব্যাঙ প্রভৃতি শত্রুরা ইহাদিগকে প্রাণী বলিয়া চিনিতে পারে না। এই ফড়িংরাও ছোট পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়।
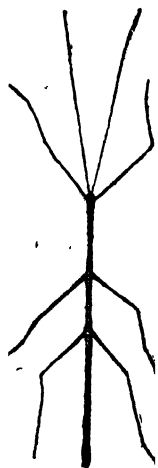
চিত্র ৬৮—ঘাসের মত ফড়িং

গোবরে পোকা ও মাছির বাচ্চারা নোংরা জিনিস খাইয়া আমাদের অনেক উপকার করে। কিন্তু ফড়িংদের কাছে আমরা সে-রকম কোনো উপকারই পাই না। অপকার করাই ইহাদের স্বভাব বাগানের গাছপালা ইহাদের জ্বালায় নষ্ট হইয়া যায়। হয় ত তোমরা

পঙ্গপাল দেখিয়া থাকিবে। লক্ষ লক্ষ ফড়িং লইয়া ইহাদের এক একটা দল হয়। যখন পঙ্গপাল আকাশ দিয়া উড়িয়া চলে, তখন মনে হয় যেন একখানা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। কোনো শস্যের ক্ষেত্রে পড়িলে সেখানকার একটি গাছও আস্ত রাখে না। সাধারণ ফড়িং ও পঙ্গপালের অত্যাচারে পৃথিবীর নানা দেশের যে কত ক্ষতি হয়, তাহার হিসাবই হয় না।

ফড়িংরা যখন সন্ধ্যার সময়ে উড়িতে আরম্ভ করে তখন একবার ফড়্-ফড়্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই শব্দ ইহারা মুখ দিয়া করে না। উড়িবার সময়ে উহাদের পায়ের গায়ে সম্মুখের ডানা জোড়াটা ঘষা পাইয়া ঐ রকম শব্দ উৎপন্ন করে।

উচ্চিংড়ে ও ঘুর্‌ঘুরে পোকা

উচ্চিংড়ে ফড়িংজাতীয় পতঙ্গ কিন্তু ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি ও জীবনের ইতিহাস সকলি পৃথক্। ইহাদের চেহারা অতি কদর্য্য। দুটা লম্বা শুঁয়ো মাথা হইতে বাহির হইয়া পিঠের উপরে পড়িয়া থাকে। কয়েক জাতি ছোট উচ্চিংড়ের শুঁয়ো দেহের চেয়েও লম্বা হইতে দেখা যায়। ইহাদের প্রায় সকলেরি পিছনের পা দুটা লম্বা। এই পা দিয়া তাহারা ফড়িঙের মত লাফাইয়া চলে। ইহাদেরো দুখানা মোটা এবং দুখানা পাত্‌লা ডানা আছে। পাত্‌লা ডানা জোড়াটি এ-রকমভাবে পিঠের উপরে ভাঁজ করা থাকে যে, তাহার পিছনের অংশ দেখিলে মনে হয় যেন উহা হুল। কিন্তু ইহাদের পিছনে সত্যই হুল থাকে, তাহা দিয়া উহারা মাটির তলায় ডিম পাড়ে।
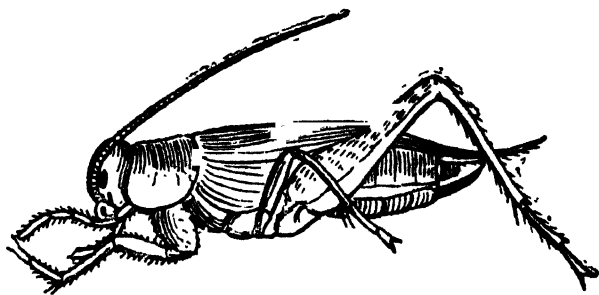
চিত্র ৬৯—উচ্চিংড়ে

এখানে উচ্চিংড়ের একটা ছবি দিলাম। দেখ, ইহার মাথাটা ফড়িঙের মাথার চেয়ে কত মোটা।

সন্ধ্যা হইলেই বাগানের ঝোপ-ঝাপ ও জঙ্গল হইতে যে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ বাহির হয় তাহা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। এই শব্দের বিরাম দেখা যায় না। ঠিক কোন্ জায়গা হইতে শব্দ বাহির হইতেছে, তাহাও ভালো বুঝা যায় না। ঘরের বা বারান্দার কোণে যদি ময়লা জমা থাকে, তবে সেখান হইতেও এই ঝিঁ ঝিঁ শব্দ শুনা যায়। ঝিঁঝিঁর শব্দ মন্দ লাগে না, কিন্তু এক এক সময়ে সেই শব্দ এমন জোরে আসিয়া কানে ঠেকে যে, তাহাতে কষ্ট বোধ হয়। তোমরা যদি লক্ষ্য কর, তবে দেখিবে, বর্ষার শেষেই ঝিঁঝিঁর শব্দ বেশি শুনা যায়। কোন্ পোকারা এই শব্দ করে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। আমরা যাহাদিগকে উচ্চিংড়ে বলিতেছি, তাহারাই বন-জঙ্গলে ও গর্ত্তে থাকিয়া ঐ শব্দ করে। স্ত্রী-উচ্চিংড়েরা নিরীহ প্রাণী; পুরুষেরাই অবিরাম শব্দ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটায়।

উচ্চিংড়েরা কি রকমে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করে, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। বেহালা বা এস্‌রাজের তারের উপরে ছড় ঘষিলে, কেমন সুন্দর শব্দ বাহির হয় তাহা তোমরা জান। তারের উপরে ছড় টানিলে, তার কাঁপিতে থাকে এবং ইহাতে শব্দ উৎপন্ন হয়। উচ্চিংড়েরা এই রকমে তাহাদের একখানা ডানার গায়ে আর একখানা ডানা ঘষিয়া ঝিঁ ঝিঁ শব্দ বাহির করে। উহারা মুখ দিয়া শব্দ করে না।

ছোট আকারের উচ্চিংড়েরা ঘরের কোণে, দেওয়ালের ফাটলে বা আধপচা লতাপাতা প্রভৃতি আবর্জ্জনার তলায় লুকাইয়া দিন কাটায় এবং রাত্রি হইলেই সেই সব জায়গায় থাকিয়া ঝিঁ ঝিঁ শব্দ করে। বড় উচ্চিংড়েরা এ-রকম জায়গায় থাকে না। তাহারা মাটির তলায় রীতিমত গর্ত্ত করিয়া বাস করে। তোমরা উচ্চিংড়ের গর্ত্ত দেখ নাই কি? একটা আধুলির যতটা ফাঁদ প্রায় সেই রকম ফাঁদের যে-সব গর্ত্ত বাগানের বা মাঠের সমতল জায়গায় দেখা যায়, সেগুলি প্রায়ই উচ্চিংড়ের গর্ত্ত। সম্মুখের পা ও মুখ দিয়া ইহারা অল্প সময়ের মধ্যেই এই-রকম গর্ত্ত খুঁড়িতে পারে। গর্ত্তে খানিকটা জল ঢালিয়া দিলে উচ্চিংড়েরা তাড়াতাড়ি গর্ত্তের বাহির হইয়া পড়ে।

আমাদের ঘরের ভিতরে যে-সকল উচ্চিংড়ে থাকে তাহাদিগকে কখনো কখনো দুধের বাটিতে ও তেলের পাত্রে পড়িয়া মরিতে দেখা যায়। ইহাতে মনে হয়, উচ্চিংড়েরা পিঁপ্‌ড়ের মত দুধ ও মিষ্টান্ন খাইতে ভালবাসে। কচি ঘাস পাতা বা গাছের কচি শিকড় প্রভৃতিও ইহাদের প্রিয় খাদ্য।

ইহারা ফড়িংদের মতই মাটির তলায় ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়া বাচ্চা রাহির হইতে এবং সেই বাচ্চাদের সম্পূর্ণ আকার পাইতে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া যায়।

ঘুর্‌ঘুরে পোকা (Mole Crickets) তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ইহারা উচ্চিংড়েদেরই জ্ঞাতি। কিন্তু আকারে ইহারা প্রকাণ্ড হয় এবং সম্মুখের দুখানি পায়ে বড় বড় দাঁত

লাগানো থাকে। এই পা দিয়া ইহারা চট্‌পট্‌ মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্ত তৈয়ার করিতে পারে। রাত্রিতে ইহারা ঘরে দুয়ারে আসিয়া ঘুর্‌-ঘুর্‌ করিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। বোধ হয় এই জন্যই ইহাদিগকে ঘুর্‌ঘুরে পোকা বলা হয়। বারো চৌদ্দ হাত গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া ইহারা মাটির তলায় বাস করে এবং মাটির তলায় যে-সব ছোট পোকা-মাকড়ের বাসা থাকে, মাটি খুঁড়িয়া সেগুলিকে খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। ঘুরঘুরে পোকারাও গাছপালার পরম শত্রু। বাগানের গাছের কচি শিকড় কাটিয়া খাইয়া ইহারা বড় ক্ষতি করে।

আর্‌সুলা

এইবার আর্‌সুলার কথা বলিব। ইহারাও ফড়িংদের দলের প্রাণী। এখানে আর্‌সুলার একটা ছবি দিলাম। ইহাদের ছয়খানা পায়ের মধ্যে কোনটাই ফড়িঙের পায়ের মত লম্বা নয়। এইজন্য আর্‌সুলারা লাফাইতে পারে না, খুব তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া বেড়ায়। ইহাদের মুখ মাথার
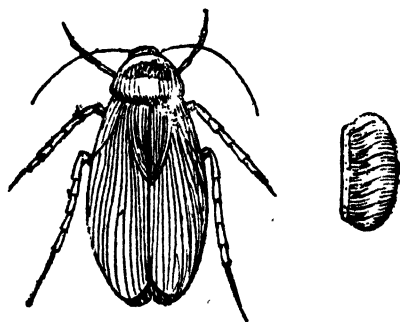
চিত্র ৭০—আর্‌সুলা, ও ডিম

নীচে লাগানো থাকে, উপর হইতে মুখ দেখাই যায় না। যদি আর্‌সুলার মুখের আকৃতি দেখিতে চাও, তবে তোমরা ইহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া দেখিয়ো। ইহাদের মাথার উপরকার শুঁয়ো দুটি ভয়ানক লম্বা হয়। আর্‌সুলারা নিশাচর প্রাণী; রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক্ শুঁয়ো দিয়া ছুঁইতে ছুঁইতে চলা-ফেরার পথ আবিষ্কার করে।

আর্‌সুলার গায়ে তোমরা হাত দিয়া দেখিয়াছ কি? ইহাদের গা খুব তেলা। তাই ধরিতে গেলে প্রায়ই হাত হইতে ফস্‌কাইয়া যায় এবং দেওয়ালের সামান্য ফাটলের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া থাকিতে পারে।

যাহাদের ডানা হয় না, এ-রকম আরসুলাও আছে। আমরা যে ছবিটি দিয়াছি, তাহা ডানাওয়ালা আরসুলার ছবি। তোমাদের ভাণ্ডার ঘরে খোঁজ করিলে, এই রকম আরসুলা অনেক দেখিতে পাইবে।

অন্য পোকা-মাকড় খাদ্যাখাদ্য বিচার করিয়া চলে, কিন্তু আরসুলাদের সে বিচার-শক্তি নাই। পৃথিবীর কোনো জিনিসই ইহাদের অখাদ্য নয়। ভালো বাঁধানো বইয়ের পাতা ও মলাট ইহারা কি রকমে কুরিয়া খায়, তাহা তোমরা দেখ নাই কি? মানুষ অকাতরে রাত্রিতে ঘুমাইতেছে এবং আরসুলারা আসিয়া ঘুমন্ত মানুষের আঙ্গুলের মাংস ধীরে ধীরে কুরিয়া খাইতেছে, ইহাও আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

তোমরা হয় ত আরসুলার ডিম দেখিয়াছ। যদি না দেখিয়া থাক, তবে তোমাদের ভাণ্ডার ঘরে খোঁজ করিয়ো;—দেখিবে, যেখানে আরসুলা আছে তাহারি কাছে দেওয়ালের গায়ে সীমের বীজের মত লম্বা বাদামী রঙের কতকগুলি জিনিস আট্‌কানো আছে। এইগুলিই আরসুলাদের ডিমের কোষ। আরসুলারা ইহা প্রসব করিয়া দেওয়ালে বা বাক্স-পেটরার গায়ে আঠার মত একরকম জিনিস দিয়া আট্‌কাইয়া রাখে। এই কোষের ভিতরে উহাদের আট দশটা ডিম বেশ পৃথক্ ভাবে থাকে-থাকে সাজানো দেখা যায়।

ডিম ফুটিয়া বাচ্চা জন্মিলে, তাহারা আর কোষের ভিতরে থাকিতে চায় না। তখন মুখ হইতে এক রকম রস

বাহির করিয়া তাহারা কোষের প্রাচীর গলাইয়া বাহিরে আসে।

আর্‌স্নুলার বাচ্চা তোমরা দেখ নাই কি? ইহারা ফড়িংদের মতই ডিম হইতে প্রায় সম্পূর্ণ আকারে বাহির হয়। তখন ইহাদের ডানা থাকে না। জন্মিয়াই ইহারা খুব খাইতে আরম্ভ করে এবং শীঘ্র আকারে বড় হইয়া বার-বার গায়ের খোলস ছাড়ে। যে-সকল জায়গায় বেশি আর্‌স্নুলা আছে, সেখানে তোমরা খোঁজ করিয়ো। দেখিবে, বাদামী রঙের আর্‌স্নুলা ছাড়া সেখানে অনেক সাদা রঙের আর্‌স্নুলাও আছে। ইহারাই সদ্য খোলস-ছাড়া আর্‌স্নুলা। পুরানো খোলস খসিয়া পড়িলে, উহাদের গায়ের নূতন আবরণটা ঐ রকম সাদা দেখায়। যাহা হউক, আর্‌স্নুলারা পাঁচ-ছয় বার গায়ের খোলস বদ্‌লাইয়া বড় হইলে, তাহাদের ডানা গজায়। এই অবস্থাতেই তাহারা সম্পূর্ণ পতঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। যাহাদের ডানা হয় হয় না, এই রকম আর্‌স্নুলাও কয়েক রকম দেখা যায়। ইহারা কিন্তু আকারে খুব বড় হয় না।

লূতা

(ARACHNIDS)

পতঙ্গদের কথা মোটামুটি শেষ করিলাম। এখন আগেকার কথা মনে কর। ষষ্ঠ শাখার প্রাণীদিগকে আমরা চারিভাগে ভাগ করিয়াছিলাম। প্রথম ভাগে চিংড়ি মাছের দল ছিল এবং দ্বিতীয় ভাগে পতঙ্গেরা ছিল। এখন তৃতীয় ভাগের কথা তোমাদিগকে বলিব। এই দলের নাম লূতা-বর্গ —মাকড়সা, কাঁকড়া-বিছা প্রভৃতি এই দলের প্রাণী।

পতঙ্গের দেহে মাথা, বুক ও লেজ এই তিনটা অংশ আছে। মাকড়সার দলে তাহা দেখা যায় না। সোজা কথায় বলিতে গেলে, ইহাদের দেহে মাথা ও লেজ এই দুইটি অংশ আছে। পতঙ্গদের দেহে ছয়খানা পা থাকে এবং অনেকের ডানাও দেখা যায়। মাকড়সার দলের প্রাণীদের ডানা থাকে না; মাথার অংশ হইতে আটখানা পা বাহির হয়।

মাকড়সা

তোমরা সকলেই মাকড়সা দেখিয়াছ। ইহারা ঘরের কোণে, বাগানের গাছে এবং কখনো কখনো ঘাসের উপরে জাল বুনিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তার পরে মশা, মাছি প্রভৃতি ছোট পোকা জালে আট্‌কাইলে শিকারগুলিকে আক্রমণ করে। কি বিশ্রী চেহারা! উহাদের কয়খানি পা দেখিলেই ভয় করে। মাকড়সা গায়ের উপরে লাফাইয়া পড়িলে কি রকম অশান্তি হয়, তাহা তোমরা জান।

তোমাদের ঘরের কোণে যে মাকড়সাটি শিকার ধরিবার জন্য বসিয়া আছে, একবার সেটিকে ভালো করিয়া দেখিয়ো। তখন দেখিবে, তাহার দেহ দুই ভাগে বিভক্ত। সম্মুখের ভাগে মুখ ও আটখানা পা আছে। পিছনের ভাগে কেবল জাল বুনিবার জন্য সূতা প্রস্তুতের যন্ত্র আছে। পতঙ্গদের শরীর যেমন কতকগুলি আংটির মত নরম হাড় দিয়া প্রস্তুত, ইহাদের দেহ সে-রকম নয়। সমস্ত দেহ খুঁজিলেও মাকড়সার দেহে আংটির সন্ধান পাওয়া যায় না। ইহাদের দেহ খুব ছোট সরু লোমে ঢাকা থাকে; পায়েও লোম দেখা যায়। আতসী কাচ দিয়া পরীক্ষা করিলে তোমরা মাকড়সার গায়ের ও পায়ের লোম এবং লেজের দিকে সূতা প্রস্তুতের

যন্ত্র দেখিতে পাইবে। কিন্তু দেহের কোনো জায়গায় ডানা খুঁজিয়া পাইবে না।

আমরা এখানে মাকড়সার একটি ছবি দিলাম। দেখ, ইহার দেহ সত্যই দুই ভাগে ভাগ করা আছে। সম্মুখের ভাগ হইতেই পা বাহির হইয়াছে। মুখের কাছে আরো দুখানি পায়ের মত যে অঙ্গ দেখিতেছ, তাহা পায়ের মত দেখাইলেও পা নয় বা শুঁয়ো নয়। ইহাদের মুখের চোয়াল লম্বা হইয়া এই রকম হইয়াছে। মাকড়-সারা যখন পোকা-মাকড় খায়, তখন ঐ চোয়াল দিয়া শিকারকে চাপিয়া ধরে এবং গায়ে দাঁত বসাইয়া তাহা-দিগকে মারিয়া ফেলে। ইহাদের মুখের দাঁত ভয়ানক অস্ত্র। ভীমরুলের মত বলবান্ প্রাণীরাও এই দাঁতের আঘাতে মারা যায়।
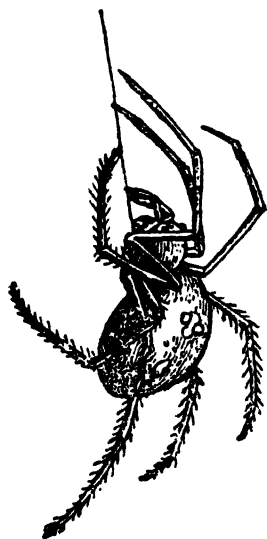
চিত্র ৭১—মাকড়সা

কেবল ইহাই নয়, মাকড়সাদের মুখে বিষের থলি থাকে। তাহাতে আপনা হইতেই বিষ জমা হয়। মাকড়সারা কোনো প্রাণীর গায়ে দাঁত ফুটাইবার সময় একটু বিষও ঢালিয়া দেয়। দাঁতের আঘাত ও বিষের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সকল রকম পোকাই মারা যায়।

মাকড়সার চোখের কথা এখনো বলা হয় নাই। শরীর পরীক্ষা করিলে ইহাদের মাথার উপরে যে আটটি দাগ থাকে, সেইগুলিই উহার চোখ। পতঙ্গদের তুইটা চোখে যেমন হাজার হাজার ছোট চোখ থাকে, ইহাদের চোখে তাহা দেখা যায় না। মাকড়সাদের যে আটটি ছোট চোখ থাকে তাহা দিয়াই ইহারা দেখার কাজ চালায়।

মাকড়সার লেজের কাছে যে কয়েকটি কালো দাগ দেখা যায়, সেই গুলিই মাকড়সার সূতা প্রস্তুতের ছিদ্র। এইগুলির তলায় সর্ব্বদাই এক রকম লালার মত জিনিস জমা থাকে। মাকড়সারা ঐ সকল ছিদ্র দিয়া সূতার মত করিয়া লালা বাহির করে। পরে বাতাসে শুকাইয়া শক্ত হইলেই তাহা দিয়া মাকড়সারা জাল বোনার কাজ চালাইতে থাকে। এই ছিদ্রগুলির আকৃতি খালি চোখে ভালো দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ বা বড় আতসী কাচে সেগুলিকে গোরুর বাঁটের মত দেখায়। মাকড়সার শরীরের তলায় এই রকম ছয়টা বাঁট থাকে। গোরুর প্রত্যেক বাঁটে একটার বেশি ছিদ্র থাকে না, কিন্তু মাকড়সার ছয়টা বাঁটের প্রত্যেকটিতে ঝাঁঝরির মত শত শত ছিদ্র থাকে। এই সকল ছিদ্র দিয়া মাকড়সারা অনেক সরু সূতা বাহির করে এবং সেগুলি একত্র করিয়া যে একটি সূতা হয়, তাহা দিয়া জাল বোনে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, মাকড়সার জালের সূতাগুলি একএকটি সূতা নয়,—অনেক সরু সূতা একত্র করিয়া এগুলি প্রস্তুত।

এখানে মাকড়সার একখানি পায়ের ছবি দিলাম। দেখ,—পায়ে যেন বাঘের নখের মত নখ রহিয়াছে। জালে শিকার পড়িলেই আটখানা পায়ের ঐরকম ধারালো নখ দিয়া তাহারা শিকারকে চাপিয়া ধরে। প্রত্যেক নখে যে চিরুণীর মত দাঁত লাগানো আছে, সেগুলি দিয়া ইহারা অনেক কাজ করে। কয়েকগাছি লম্বা সূতা জড়াইতে গেলে কি রকম বিপদে পড়িতে হয়, তাহা তোমরা জান। প্রায়ই সূতায় সূতায় গিঁট বাঁধিয়া যায়, কখনো আবার খেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তখন ভয়ানক বিরক্তি লাগে এবং শেষে টানাটানি করিতে করিতে সূতায় সূতায় এমন জড়াজড়ি বাধিয়া যায় যে, সেগুলিকে আর পৃথক্ করা যায় না। মাকড়সারা যে-সকল সরু সূতায় জাল বোনে, তাহাতে জড়াজড়ি বাঁধার খুবই সম্ভাবনা থাকে। তাই উহারা নখের দাঁতগুলির ফাঁকে ফাঁকে সূতা বাধাইয়া জাল বোনে। ইহাতে সূতায় সূতায় গিঁট বাঁধিতে পায় না।
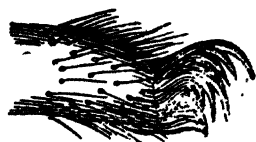
চিত্র ৭২—মাকড়সার পা

আমাদের মধ্যে অনেক রকম কারিগর আছে। কেহ কাঠের কাজ, কেহ কামারের কাজ, কেহ রাজমিস্ত্রির কাজ করে। কিন্তু সকলেরই কাজ যে ভালো হয়, তাহা নয়। যে ছুতার কেবল ঢেঁকি তৈয়ারি করে, তাহার কাজের চেয়ে, যে চেয়ার-টেবিল তৈয়ারি করে, তাহার কাজ ভালো। কাজেই,

ঢেঁকিওয়ালা ছুতারের চেয়ে চেয়ারওয়ালা ছুতার বেশি ওস্তাদ্। মাকড়সার মধ্যে এইরকম কাঁচা ও পাকা কারিগর দেখা যায়। আমাদের ঘরের কোণে ও কড়ি কাঠে যে মাকড়সারা জাল বোনে, তাহারা নিতান্ত কাঁচা কারিগর। কোনো-গতিকে কতকগুলি সূতা এদিকে ওদিকে আট্‌কাইয়া ইহারা জাল প্রস্তুত করে। এই সকল জালে কোনো কারিগরী নাই। ঘাসের উপরে বা গর্ত্তের ভিতরে থাকিয়া এক রকম ছোট মাকড়সা যে জাল প্রস্তুত করে, তাহা তোমরা বোধ হয় দেখিয়াছ। রাত্রির শিশিরের জল সূতার উপরে জমা হইলে, এই জালগুলিকে প্রাতঃকালে মাটির উপরে স্পষ্ট দেখা যায়। ইহাতেও বিশেষ কারিগরীর পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু বাগানের গাছের ডালে মাকড়সারা চাকার মত যে ছোট-বড় জাল বোনে, তাহা দেখিলে বাস্তবিকই অবাক্ হইতে হয়। এই জালগুলিই মাকড়সার মধ্যে যাহারা পাকা কারিগর তাহারা প্রস্তুত করে।

পর পৃষ্ঠায় বাগানের মাকড়সাদের জালের একটা ছবি দিলাম। তোমরা একদিন ভোরে উঠিয়া বাগানে বেড়াইতে যাইও। তখন দেখিবে, এক গাছ হইতে আর এক গাছে, বা এক ডাল হইতে আর এক ডালে, এই রকম জাল বাঁধিয়া ছোট মাকড়সা জালের ঠিক্ মাঝখানে বা বাহিরে বসিয়া আছে।

এই মাকড়সারা কি-রকমে জাল বোনে, তোমরা বোধ

হয় তাহা দেখ নাই। ইহারা এত তাড়াতাড়ি কাজ করে যে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। দেড় হাত বা দুই হাত
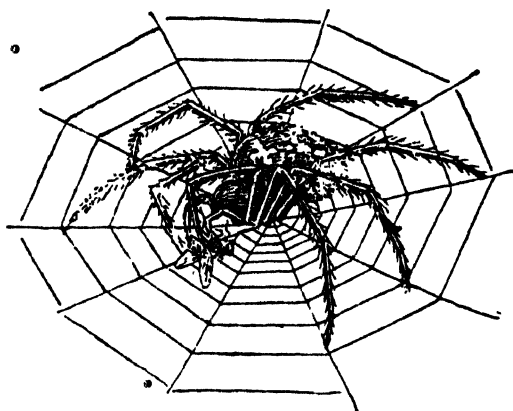
চিত্র ৭৩—মাকড়সার জাল

চওড়া জাল বুনিতে ইহারা কখনই এক ঘণ্টার বেশি সময় লয় না। উই পিঁপ্ড়ে বা মৌমাছির মত দলবদ্ধ হইয়া মাকড়সারা বাস করে না। কাজেই প্রত্যেক মাকড়সাকেই তাহার নিজের জাল নিজেই বুনিতে হয়। জাল বুনিবার সময়ে মাকড়সারা বেশ একটি ভালো জায়গা বাছিয়া প্রথমে পেটের তলা হইতে একগাছি সূতা বাহির করে। হাল্কা সূতা দেহ হইতে বাহির হইয়া স্থির থাকে না। কিছুক্ষণ বাতাসে এদিকে ওদিকে নাড়াচাড়া করিয়া শেষে গাছের ডালে বা পাতায় লাগিয়া যায়। এই সূতায় জালের ভিত্ পত্তন

হয়। মাকড়সারা ইহারি উপর দিয়া এক ডাল হইতে অন্য ডালে যাতায়াত আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক লম্বা সূতা ডালে ডালে যোগ করিতে থাকে। তার পরে এই সকল ফাঁক্ ফাঁক্ সূতার মাঝ-জায়গাটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহারা চাকার মত গোলাকার জাল বুনিয়া ফেলে। তোমরা যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, জালের টানা সূতাগুলি যত মোটা, গোলাকারে ঘুরানো সূতা সে-রকম মোটা নয়; এই-গুলিই সকলের চেয়ে সরু। মাকড়সারা পেটের তলার সেই ছিদ্র দিয়া ইচ্ছামত মোটা ও সরু সূতা তৈয়ার করিতে পারে।

কয়েকজাতীয় মাকড়সা আবার জালের সূতার গায়ে এক রকম আঠার মত জিনিস বিন্দু বিন্দু লাগাইয়া রাখে। এগুলি শীঘ্র শুকায় না। মশা মাছি প্রভৃতি জালে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকিলে সেই আঠা পোকাদের পায়ে ও ডানায় লাগিয়া যায়। কাজেই তাহারা আর পলাইতে পারে না।

মাকড়সারা কি-রকমে পোকা শিকার করে, তোমরা কোনো জালের কাছে দাঁড়াইয়া দেখিয়ো। ইহারা শিকারের জন্য প্রায়ই জালের ঠিক্ মাঝখানটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কখনো কখনো আবার জাল ছাড়িয়া কোনো পাতার আড়ালে লুকাইয়া অপেক্ষা করে। জাল হইতে দূরে থাকিলে জালের একটি সূতা প্রায়ই তাহাদের পায়ে লাগানো দেখা যায়। জালে পোকা পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকিলে, সেই

পায়ের সূতায় টান পড়ে। তখন মাকড়সারা বাঘের মত লাফাইতে লাফাইতে শিকারের ঘাড়ে চাপিয়া বসে।

পেটে ক্ষুধা থাকিলে মাকড়সাদের দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। তখন শিকারের ঘাড়ে চাপিয়াই তাহারা লম্বা দাঁত দিয়া শিকারকে মারিয়া ফেলে এবং দেহের ভিতরকার সারবস্তু শুষিয়া খাইয়া খোলাটা ফেলিয়া দেয়। যাহা দরকার তাহার চেয়ে বেশি কিছু পাইলে আমরা তাহা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখি। যাহারা বেশি টাকা উপার্জ্জন করে, তাহারা এই রকমে অনেক টাকা জমায় এবং চাষ-আবাদ করিয়া যাহারা বেশি ফসল পায়, তাহারাও এই রকমে গোলা গোলা ধান জমা করিয়া রাখে। পেট ভরা থাকিলে মাকড়সারা জালের পোকা-মাকড়দিগকে ঠিক্ ঐ-রকমেই জ্যান্ত অবস্থায় সঞ্চিত করিয়া রাখে। কুমুরে-পোকা ও কাঁচপোকারা কি রকমে বাচ্চাদের জন্য পোকা-মাকড় ধরিয়া রাখে, তাহা তোমরা জান। মাকড়সারা কতকটা সেই রকমেই ভবিষ্যতের জন্য জীবন্ত পোকা ধরিয়া রাখে। কিন্তু কুমুরে-পোকাদের মত ইহারা শিকারের গায়ে হুল ফোটায় না। পেটের তলা হইতে সূতা বাহির করিয়া মাকড়সারা বড় বড় মাছি বা বোল্‌তার সমস্ত দেহটাকে এমন জড়াইয়া ফেলে যে, সেই সূতার বাঁধন ছিঁড়িয়া কেহই পলাইতে পারে না। তার পর যখন জালে পোকা আট্‌কায় না, তখন মাকড়সাবা ঐ-সকল সূতা-জড়ানো বন্দী পোকাদের খাইতে আরম্ভ করে।

তোমরা কোনো মাকড়সার বড় জাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। তখন দেখিবে, সাদা সূতা-জড়ানো দুই-একটি পোকার খোলা বা জীবন্ত পোকা জালের গায়ে লাগানো আছে। আমাদের ঘরের ভিতরে যে মাকড়সারা জাল বোনে, তাহারাও ভবিষ্যতের জন্য খাবার সঞ্চয় করে। ইহাদের জালে খোঁজ করিলেও তোমরা সূতা-জড়ানো পিঁপ্‌ড়ে বা মাছি দেখিতে পাইবে।

পিঁপ্‌ড়ে, মৌমাছি প্রভৃতি পতঙ্গদের পুরুষেরা কি রকম অকর্ম্মা তাহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। মাকড়সা-দের পুরুষেরাও ঠিক্ সেই রকম অকেজো। ইহারা আকারে ছোট হইয়া জন্মে এবং প্রায়ই জাল বুনিতে পারে না। স্ত্রীরা যদি খাবার মুখের কাছে দেয়, তবেই ইহারা খাইতে পায়, নচেৎ ক্ষুধায় মরিয়া যায়। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, আমরা জালের উপরে যে-সকল মাকড়সা দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই পুরুষ থাকে না। স্ত্রী-মাকড়সারাই জাল বোনে ও মশা-মাছি শিকার করে। যাহারা সংসারে কোনো কাজ না করিয়া কেবল পরের উপরে নির্ভর করে, ভবিষ্যতে তাহাদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। পুরুষ-মাকড়সারা স্ত্রীদের উপরে নির্ভর করে বলিয়া ইহারাও শেষে বড় কষ্ট পায়। কিছুদিন একত্র থাকার পরে স্ত্রী-মাকড়সারা পুরুষদের উপরে এমন বিরক্ত হইয়া পড়ে যে, তাহাদিগকে আর কাছে ঘেঁসিতে দেয় না। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, তাই পদে

পদে অপমানিত হইয়াও একটু খাবার পাইবার জন্য পুরুষেরা স্ত্রীর কাছ ছাড়া হইতে চায় না। তখন স্ত্রীরা পুরুষদের উপরে এত বিরক্ত হইয়া পড়ে যে, তাহারা এক একটি পুরুষকে ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করে। এই রকমে পুরুষ-মাকড়সারা নিজেদেরি স্ত্রীর হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

এখন আমরা মাকড়সার বাচ্চাদের কথা বলিব। পতঙ্গদের মত মাকড়সারাও ডিম পাড়ে এবং সেই ডিম হইতে বাচ্চা হয়। ইহারা যে-রকমে ডিম পাড়ে, তাহা বড় মজার। প্রসবের সময় হইলে, স্ত্রী-মাকড়সারা শরীর হইতে সূতা বাহির করিয়া এক একটা থলি প্রস্তুত করে এবং তাহা পেটের তলায় রাখিয়া দেয়। শেষে প্রসবের পর ডিমগুলিকে সেই থলির মধ্যে রাখিয়া দেয়। এক একটা থলিতে কখনো কখনো ছয়-সাত শত ডিম জমা থাকে। আমাদের ঘরের ভিতরে যে-সকল মাকড়সা জাল বোনে, তাহাদের পেটের তলায় ঐ-রকম ডিমের থলি প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু বাহিরের ছোট মাকড়সারা এই রকম থলি পেটের তলায় রাখিয়া বিব্রত হইতে চায় না। তাহারা দেওয়ালের ফাটলে বা গাছের ছালের তলায় ডিমের থলি লুকাইয়া নিশ্চিন্ত থাকে।

মাকড়সাদের ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইতে অনেক সময় লাগে। কখনো কখনো তিন চারি মাস না গেলে ডিম হইতে বাচ্চা হয় না। পতঙ্গের বাচ্চারা নানা পরিবর্ত্তনের

পরে সম্পূর্ণ আকার পায়। ইহা তোমরা জান। কিন্তু মাকড়সাদের ডিম হইতে যে বাচ্চা বাহির হয়, তাহা ছোট মাকড়সার আকারেই জন্মে। সুতরাং বলিতে হয়, ডিম হইতে বাহির হওয়ার পরে, ইহাদের চেহারার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। কেবল বার বার গায়ের খোলস ছাড়িয়া ইহারা আকারে বড় হয় মাত্র।

কাঁকড়া-বিছা

তোমরা হয় ত কাঁকড়া-বিছা দেখিয়াছ। ইহাকে কেহ কেহ বিচ্ছুও, বলে। পর পৃষ্ঠায় কাঁকড়া-বিছার একটা ছবি দিলাম। কি বিশ্রী প্রাণী! দেখিলেই ভয় করে। তার পরে যদি কাছে আসিয়া গায়ে হুল ফুটাইয়া দেয়, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ! ইহাদের হুলে ভয়ানক বিষ। কিন্তু ইহারা মাকড়সাদের দলেরই প্রাণী।

বাংলাদেশের সকল জায়গায় কাঁকড়া-বিছা দেখা যায় না। শুক্‌নো জায়গাতেই ইহারা বাস করে, তাই বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ইহাদের উৎপাত বেশি। কখনো কখনো খড়ের ঘরের ছাদে কাঁকড়া-বিছা দেখা যায়। কিন্তু বনে-জঙ্গলে এবং ছোট ঝোপের তলাতেই ইহারা বেশি থাকে এবং বর্ষাকালে ঘরে-দুয়ারে আসিয়া উৎপাত করে।

কাঁকড়া-বিছার গায়ের রঙ্ প্রায় কালো। বাদামী রঙের বিছাও দেখা যায়। ইহারা আকারে কখনো কখনো আট-দশ ইঞ্চি পর্য্যন্তও লম্বা হয়। পতঙ্গদের মত ইহাদের শরীর কতকগুলি আংটির মত অংশ দিয়া প্রস্তুত। মাকড়সাদের দেহে যেমন মাথা ও লেজ ছাড়া আর কিছুই নাই, ইহাদের দেহ ঠিক্ সেই রকম নয়। ইহাদের দেহের পিছনকার অংশে লেজ ও পেট থাকে। মাথায় কাঁকুড়ার দাড়ার মত এক জোড়া দাড়া থাকে। বেড়াইবার সময়ে
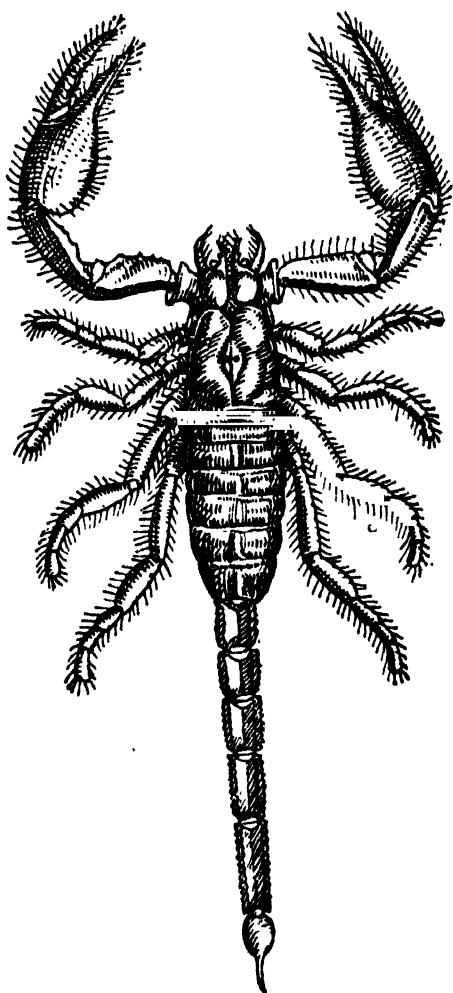
চিত্র ৭৪—কাঁকড়া-বিছা

ইহারা ঐ দাড়া উঁচু করিয়া এবং নখ ফাঁক করিয়া ছুটিয়া চলে। পথের মাঝে ফড়িং, গোবরে পোকা বা অন্য ছোট পোকা-মাকড় পাইলে বিছারা নখের ফাঁকে শিকারদের চাপিয়া ধরে এবং লেজ বাঁকাইয়া শিকারের গায়ে লেজের হুল ফুটাইয়া দেয়।

কাঁকড়া-বিছার হুলই ভয়ানক অস্ত্র। তেঁতুলের বিচির মত ছয়টি গাঁইট লইয়াই ইহাদের লেজ। লেজের শেষ গাঁইটে ধারালো হুল লাগানো থাকে এবং সেখানেই থলির মত একটি কোষে ভয়ানক বিষ জমা থাকে। বিছারা হুলের ঠোকা দিয়া শিকারের গায়ে ছিদ্র করে এবং তাহাতে বিষ ঢালিয়া দেয়। তোমরা যদি মরা কাঁকড়া-বিছা পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাও, তবে তাহার লেজের হুলটা ভালো করিয়া দেখিয়ো। হুলটাকে ঠিক্ লোহার বড়শির মত শক্ত ও উপরদিকে বাঁকানো দেখা যায়। তাই বিছারা হুল ফুটাইবার সময়ে লেজটাকে উঁচু করিয়া উঠায় এবং লেজ দিয়া শিকারের গায়ে জোরে ছোবল মারে এবং সঙ্গে সঙ্গে গায়ে বিষ ঢালিয়া দেয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, ইহাদের লেজই সর্ব্বস্ব। মুখে দাঁত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে বিষ নাই।

মাকড়সাদের মতই কাঁকড়া-বিছাদের মাথার উপরে দুইটা বড় চোখ এবং কয়েকটা ছোট চোখ আছে। কিন্তু এগুলি পতঙ্গদের চোখের মত ছোট চোখের সমষ্টি নয়। কাঁকড়া-বিছাদের দৃষ্টিশক্তি খুব প্রবল বলিয়া বোধ হয় না।

দাড়া দিয়া বিছারা কখনই চলার কাজ করে না। চলিয়া বেড়াইবার জন্য মাথার অংশ হইতে ইহাদের চারি জোড়া পা আছে। এই সকল পা জোরে চালাইয়া ইহারা এমন ছুট্ দেয় যে, ইহাদিগকে চলিবার সময়ে দেখাই যায় না। ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে মাকড়সার মত লোম আছে। কিন্তু লোমগুলি মোটা এবং গায়ে ফাঁক-ফাঁক করিয়া বসানো থাকে।

পতঙ্গদের মাথায় যে শুঁয়ো থাকে, কাঁকড়া-বিছাদের তাহা নাই। শুঁয়োর জায়গায় সরু দাঁত বসানো থাকে। ইহা দিয়াই তাহারা গোবরে-পোকা বা ফড়িং ইত্যাদির শরীর ছিঁড়িয়া ভিতরের সারবস্তু শুষিয়া খায়।

মাকড়সাদের মধ্যে যাহারা পুরুষ হইয়া জন্মে, স্ত্রীদের হাতে তাহাদিগকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। শেষে রাক্ষসী স্ত্রীরা নিজের স্বামীদিগকে খাইয়া ফেলে। কাঁকড়া-বিছাদের মধ্যেও সেই রকম মারামারি ঝগড়াঝাঁটি দেখা যায়। স্ত্রী-বিছারা কিছুদিন পুরুষদের সঙ্গে শান্তিতে বাস করে। কিন্তু শেষে তাহারা এমন চটিয়া যায় যে, পুরুষদের অনিষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। স্ত্রীর মেজাজ বুঝিয়া পুরুষেরা যদি এই সময়ে পলাইয়া যায়, তবেই তাহারা রক্ষা পায়। নচেৎ স্ত্রী-বিছারা পুরুষদের ধরিয়া খাইয়া ফেলে।

কাঁকড়া-বিছারা ডিম প্রসব করে না। ইহাদের ডিম পেটের ভিতরেই শেষ পর্য্যন্ত থাকে এবং সেখানেই ফুটিলে বাচ্চা বাহির হয়। পতঙ্গদের বাচ্চা ডিম হইতে বাহির

হইয়া যেমন নিজেরাই দেখিয়া শুনিয়া খাওয়া-দাওয়া করে, বিছার বাচ্চারা তাহা পারে না। বাচ্চা-অবস্থায় ইহারা বড়ই নিঃসহায় থাকে এবং মায়ের কাঁধে-পিঠে চাপিয়া বেড়ায়। সদ্য বাচ্চা হওয়ার পরে, যদি তোমরা কোনো বিছা পরীক্ষা কর, তবে দেখিবে, তাহার পিঠ অনেক ছোট বাচ্চাতে ভরিয়া আছে।

বিছারা প্রায় দুই সপ্তাহ ঐ-রকমে বাচ্চা পিঠে করিয়া তাহাদিগকে খাবার দেয়। ইহার পরেই বাচ্চারা সাবালক হইয়া পড়ে এবং ছোট লেজগুলিকে পিঠের উপরে উঁচু করিয়া মায়ের কোল হইতে দূরে দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়ে।

সহস্রপদী

(MYRIAPODS)

তেঁতুলে-বিছা

তেঁতুলে-বিছা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। বড় জাতের বিছা সাত আট ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়। খোলা ছাড়াইলে পাকা তেঁতুলকে যে রকম দেখায়, ইহাদের গায়ের রঙ্ ও আকৃতি সেই রকম বলিয়াই ইহাদিগকে তেঁতুলে-বিছা বলে।

বিছার মুখে দুইটি শুঁয়ো থাকে। তার পরে খাবার ধরিবার জন্য চোয়াল ও একজোড়া দাঁতও থাকে। ইহাদের দেহ যতগুলি আংটি জুড়িয়া প্রস্তুত হয়, তাহার প্রত্যেক আংটি হইতে এক এক জোড়া পা বাহির হয়। প্রথম পা জোড়াটি আকার বদ্‌লাইয়া দাঁত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দাঁত দুটির রঙ্ প্রায়ই কালো হয় এবং ভয়ানক ছুঁচ্‌লো থাকে।

বিছাতে কামড়াইলে ভয়ানক জ্বালা করে। ইহাদের দাঁতের আগায় খুব সরু ছিদ্র এবং দাঁতের গোড়ার বিষের থলি থাকে। কামড়াইলেই ঐ থলি হইতে বিষ আসিয়া দাঁতের ছিদ্র দিয়া কামড়ের জায়গায় লাগে। ইহাই জ্বালা-যন্ত্রণা সুরু করে।

বিছাদের মাথার দুই পাশে দুইটা করিয়া কালো চোখ থাকে, হঠাৎ দেখিলে এগুলিকে সাধারণ চোখ বলিয়াই মনে

হয়। কিন্তু তাহা নয়। তোমরা যদি আতসী কাচ দিয়া পরীক্ষা কর, তবে প্রত্যেক চোখের কালো দাগের উপরে চারিটা করিয়া ছোট চোখ সাজানো দেখিতে পাইবে। সুতরাং বলিতে হয়, বিছার আটটি করিয়া চোখ আছে। এই সকল চোখ দিয়া দেখিয়া ও শুঁয়ো দিয়া ছুঁইয়া অন্ধকার রাত্রিতেও বিছারা খাবার সংগ্রহ করিতে পারে। শুঁয়ো দুটির প্রত্যেকটিতে কুড়িটা করিয়া জোড় আছে, তাই ইহারা যেদিকে-ইচ্ছা শুঁয়ো নড়াইতে পারে।

দাঁতের আকৃতি এবং দাঁতের তলাকার বিষের থলির কথা শুনিলেই বুঝা যায়, বিছারা হিংস্র প্রাণী। ইহারা গাছপালা বা নিরামিষ খাবার প্রায়ই খায় না, রাত্রি হইলেই বন-জঙ্গল বা ঘরের কোণ হইতে বাহির হইয়া কেবল ছোট পোকা-মাকড় ধরিয়া খায়।

কেন্নো

কেন্নো বিছাদের জাতীয় পোকা। ইহাদের দেহও অনেক আংটি দিয়া প্রস্তুত। ভয় পাইলেই ইহারা শরীর গুটাইয়া চাকার মত করে। অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও প্রায় বিছাদেরি মত। ইহাদের দেহের অধিকাংশ আংটি হইতে দুই জোড়া করিয়া পা বাহির হয়। কেন্নোর পায়ের সংখ্যা অনেক। এই জন্যই ইংরাজীতে ইহাদিগকে সহস্রপদী (Millipoda) বলা হয়। ইহাদের দাঁতে বিষ নাই। ইহারা কচি গাছপালা দাঁত দিয়া কাটিয়া আহার করে।

চিত্র ৭৫—কেন্নো

ছোট-বড় অনেক রকমের কেন্নো আছে। ইহাদের গায়ের রঙও বিচিত্র। কিন্তু জীবনের ইতিহাস সকলেরি প্রায় একই। জোনাক্ পোকার দেহ হইতে যে-রকম আলো বাহির হয়, কোনো কোনো কেন্নোর শরীরে রাত্রিতে সেই রকম আলো দেখা যায়। কিন্তু সে আলোক জোনাক্ পোকার আলোর মত উজ্জ্বল নয়। ভিজে ও সেঁতসেঁতে

জায়গাতেই কেন্নো বেশি দেখা যায়। শুক্‌নো জায়গায় ইহারা থাকিতে পারে না।

কেন্নো বা বিছারা পতঙ্গদের মত আকৃতি বদ্‌লাইয়া বড় হয় না। ছোট বেলায় ইহাদের দেহের আংটির সংখ্যা অল্প থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে পা-ওয়ালা নূতন আংটি দেহে যুক্ত হয়। পতঙ্গেরা যেমন গায়ের ছিদ্র দিয়া বাতাস টানিয়া নিশ্বাস লয়, ইহাদেরও শ্বাস-প্রশ্বাস সেই-রকমে চলে।

সপ্তম শাখার প্রাণী

কোমলাঙ্গী

(MOLLUSCA)

শঙ্খ, শামুক, গুগ্‌লি

ষষ্ঠ শাখার প্রাণীদের পরিচয় দিলাম। এখন সপ্তম শাখার পোকা-মাকড়ের কথা তোমাদিগকে বলিব। ইহারা কিম্ভূত-কিমাকার প্রাণী। সাধারণ প্রাণীদের মত হাত, পা, ডানা কিছুই নাই। আছে কেবল গায়ের উপরে শক্ত খোলা এবং তাহারি ভিতরে নরম শরীর। গুগ্‌লি, শামুক, ঝিনুক, কড়ি, শঙ্খ সকলই এই শাখার প্রাণী। ইহাদের দেহে হাড় নাই। মাংসপিণ্ড লইয়াই ইহাদের দেহ। এই জন্যই এই দলের প্রাণীকে কোমলাঙ্গ বলিলাম।

তোমরা কখনো শামুক, গুগ্‌লি বা ঝিনুকের গায়ের খোলা ভাঙিয়া দেখিয়াছ কি? খোলা ভাঙিলেই লুকানো দেহটা বাহির হইয়া পড়ে। ইহাদের এই দেহের যন্ত্র খুব জটিল এবং সকলের ঠিক একরকমও নয়। যাহা হউক, শামুক-গুগ্‌লিদের খোলা ভাঙিলে ইহাদের সমস্ত দেহের উপরে একটা পাত্‌লা পর্‌দা নজরে পড়ে। আমরা যেমন শীতের সময়ে গায়ের আগাগোড়া কম্বলে ঢাকিয়া ঘুমাই,

শামুক-গুগ্‌লিরা খোলার তলাকার সেই পাত্‌লা পর্দ্দায় দেহ-গুলিকে ঢাকিয়া রাখে। ইহাদের সকল অঙ্গই পর্‌দার ভিতরে লুকানো থাকে। যখন দরকার হয়, তখন সেই পর্‌দার ভিতর হইতে অঙ্গ বাহির করে।

ঐ পর্‌দার গুণ বড় আশ্চর্য্যজনক। শামুক-গুগ্‌লিদিগকে বাচ্চা বেলায় মটর বা কলাইয়ের মত ছোট দেখায়। তখন ইহাদের গায়ের খোলাও খুব পাত্‌লা থাকে। যেমন বয়সের সঙ্গে দেহ বাড়ে, পর্‌দাগুলিও বড় হইয়া খোলার বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই সময়ে দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে খোলা বড় হয় না। জলাশয়ের জল হইতে চূণ টানিয়া লইয়া ঐ পর্‌দাই খোলাগুলিকে বাড়াইতে আরম্ভ করে।

তোমরা হয় ত ভাবিতেছ, পুকুর বা নদীর জলে আবার চূণ কোথায়? কিন্তু সকল জলে সত্যই অল্প পরিমাণে চূণ মিশানো থাকে। সকল মাটিতেই কম বা বেশি চূণ আছে। এই চূণই জলে গোলা থাকে।

দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে কি-রকমে নূতন খোলার সৃষ্টি হয় তোমরা যদি একটি গুগ্‌লি বা শামুকের খোলা পরীক্ষা কর, তবে তাহা জানিতে পারিবে। গাছের গুঁড়ি করাত দিয়া চিরিলে কাঠের গায়ে যে গোলাকার দাগ সাজানো থাকে, তাহা হয় ত তোমরা দেখিয়াছ। গাছের গুঁড়ি প্রতিবৎসরে যেমন এক-একটু মোটা হয়, তেমনি কাঠে ঐ-রকম এক-একটা দাগ রাখিয়া দেয়। শামুক-গুগ্‌লির খোলা গাছের

মতই ধীরে ধীরে বাড়ে এবং অনেক সময়ে বাড়ার দাগও খোলার গায়ে আঁকা থাকে।

শঙ্খ ও কড়ি সমুদ্রের প্রাণী। কড়ি ছোট বড় কত রকমের হয়, তোমরা অবশ্যই দেখিয়াছ। গেঁটে কড়ির গায়ে গাঁটের মত উঁচু উঁচু অংশ থাকে। শঙ্খেরও ঐ-রকম নানা আকৃতি দেখা যায়। কোনো শঙ্খের খোলায় ঢেউ-খেলানো সুন্দর উঁচু উঁচু অংশ সাজানো দেখা যায়। কোনো শঙ্খের খোলা আবার শিঙের মত চূড়াওয়ালা দেখা যায়। শঙ্খের গায়ের খোলার এই বিচিত্র আকৃতি ভিতরকার সেই পাত্‌লা পরদার গুণেই হয়। আমাদের আঙুল ও হাত-পায়ের তেলোর চামড়া কেমন কোঁচ্‌কানো থাকে তাহা তোমরা অবশ্যই দেখিয়াছ। কড়ি, গুগ্‌লি ও শঙ্খের গায়ের পর্‌দা ঐ-রকমে প্রায়ই কোঁচ্‌কাইয়া যায়। ইহাতে গায়ের উপরকার খোলাটিও ভিতরকার পর্‌দার মত কোঁচ্‌কাইয়া উৎপন্ন হইতে থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, গায়ের পর্‌দা যে কেবল খোলাই উৎপন্ন করে, তাহা নয়; খোলার বিচিত্র আকৃতিও ঐ পর্‌দা দিয়া উৎপন্ন হয়।

মুক্তা খুব মূল্যবান্‌ জিনিস। মুক্তা যত বড় হয়, তাহার মূল্যও তত বাড়ে। কিন্তু জিনিসটা চূণ দিয়াই প্রস্তুত। ঝিনুকের শরীরের ভিতর মুক্তা হয়। আমরা ছেলেবেলায় গল্প শুনিয়াছিলাম, স্বাতী নক্ষত্রে বৃষ্টির জল হাতীর মাথায় পড়িলে গজমোতি হয় এবং ঝিনুকের গায়ে

পড়িলে মুক্তা জন্মে। কিন্তু ইহা সত্য নয়। আমাদের গায়ের কোনো জায়গায় আঘাত লাগিলে যেমন সেইখানে রক্ত জমা' হয়, ঝিনুকদের শরীরের ভিতরকার পর্‌দায় কোনো রকম উত্তেজনা আসিলে ঠিক সেই প্রকারে রস বাহির হয়। এই রস জমাট বাঁধিয়া ক্রমে মুক্তা হইয়া দাঁড়ায়। বালির কণা বা অন্য কোনো ছোট জিনিস দেহের ভিতরে আট্‌কাইলেও পর্‌দার উত্তেজনা হয়।

আমাদের দেশের পুকুরের পাঁকের মধ্যে গুগ্‌লি পাওয়া যায়। কয়েকটি গুগ্‌লি ধরিয়া কাঁচের পাত্রের জলে ছাড়িয়া দিয়ো এবং জলের তলায় বালি ছিটাইয়া রাখিয়ো। এই অবস্থায় গুগ্‌লির অনেক চাল-চলন তোমরা দেখিতে পাইবে। ইহাদের মাথার উপরে শিঙের মত দুইটা শুঁয়ো থাকে এবং তাহারি পিছনে আরো দুইটি শুঁয়োর মাথায় দু'টা কালো চোখ থাকে। গুগ্‌লিদের পা নাই। দেহের তলাকার একখণ্ড চেপ্‌টা মাংসই ইহাদের পা। মাংসপিণ্ড হইলেও তাহাতে অনেক মাংসপেশী লাগানো থাকে এবং খোলার মধ্যেও একটা দড়ির মত মোটা মাংসপেশী লাগানো দেখা যায়। ইচ্ছা করিলেই ঐ-সকল পেশীর জোরে তাহারা মুখ চোখ পা এবং শুঁয়ো খোলার মধ্যে টানিয়া লইতে পারে।

ডাঙায় যে-সকল শামুক বেড়ায় তাহারা ধীরে ধীরে চলিতে থাকিলে পিছনে এক রকম ভিজে দাগ রাখিয়া যায়।

তোমরা বোধ হয়, ইহা দেখিয়াছ। মুখের গ্রন্থি হইতে লালা বাহির হইয়া যেমন আমাদের মুখ ভিজাইয়া রাখে, ইহাদের শরীর হইতে সেই রকম লালার মত জিনিস পা ভিজাইয়া রাখে। এই লালা দিয়া তাহারা অনায়াসে পিছ্‌লাইয়া চলিতে পারে। জলের শামুক-গুগ্‌লির পায়ের তলা হইতেও ঐ রকম লালা বাহির হয়।

শামুক-গুগ্‌লিদের মুখ তোমরা দেখ নাই। ব্যাঙাচির মুখের মত ইহাদের মুখ মাথার নীচে থাকে। এই মুখে ছুঁচের মত অনেক দাঁত লাগানো আছে। খাবার জিনিসের উপরে চাপিয়া এই দাঁত দিয়া উহারা খাবার কাটিয়া খায়। বুড়ো হইলে আমাদের দাঁত পড়িয়া যায় এবং দাঁতের ক্ষয়ও হয়। এই রকমে নষ্ট হইয়া গেলে আমাদের আর নূতন দাঁত গজায় না। তাই বুড়োরা শক্ত জিনিস খাইতে পারে না। শামুক-গুগ্‌লিদের দাঁত মানুষের দাঁতের মত শক্ত নয়। কাজেই শেওলা প্রভৃতি খাইতে খাইতে তাহাদের দাঁত শীঘ্রই ক্ষয় হইয়া যায়। কিন্তু দাঁত নষ্ট হইলে অন্য প্রাণীর যে রকম অসুবিধা হয়, ইহাদের তাহা হয় না। এক প্রস্ত দাঁত ক্ষয় হইলেই আর এক প্রস্ত দাঁত মুখে আসিয়া হাজির হয়। মজার ব্যাপার নয় কি ?

যে ব্যবস্থায় নূতন দাঁত মুখে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা আরো মজার। শামুক-গুগ্‌লিরা অনেক ছোট দাঁত দেহের মধ্যে জড়াইয়া রাখে। ইহার খানিকটা নষ্ট হইয়া গেলেই

আর খানিকটা তাজা দাঁত আপনা হইতেই বাহির হইয়া মুখে উপস্থিত হয়।

যাহারা জলে বাস করে তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা কি রকম, তাহা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। চিংড়ি মাছ জলে বাস করে। কান্‌কো দিয়া জলে-মিশানো অক্সিজেন্ টানিয়া ইহারা বাঁচিয়া থাকে। শামুক-গুগ্‌লিদের মধ্যে কয়েক জাতি ঐ-রকমে কান্‌কো দিয়া অক্সিজেন্ টানে, আবার কতক বড় প্রাণীদের মত ফুস্‌ফুস্ দিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়।

সাধারণ শামুক-গুগ্‌লিকে ডাঙায় উঠাইয়া রাখিলে, খোলার ঢাক্‌নিগুলিকে তাহারা জোরে বন্ধ করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে খোলার ভিতরে খানিকটা জলও আট্‌কাইয়া রাখে। এই আবদ্ধ জলের অক্সিজেন্ টানিয়া ইহারা ডাঙার উপরেও দুই এক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। তোমরা জল হইতে গুগ্‌লি উঠাইয়া খোলার ঢাক্‌নি খুলিয়া পরীক্ষা করিয়ো,—দেখিবে, খোলার ভিতরে অনেকটা জল জমা আছে।

শামুকজাতীয় সকল প্রাণীই জলে বাস করে না। ডাঙায় জন্মিয়া এবং ডাঙার গাছপালা খাইয়া জীবন ধারণ করে, এ-রকম শামুকও অনেক দেখা যায়। ইহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিলে বাঁচে না। নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, হুগলি প্রভৃতি জেলায় কিছু দিন এক রকম বড় ডাঙার শামুকের ভয়ানক উপদ্রব হইয়াছিল। ইহাদের জ্বালায়

বাগানের গাছপালা রাখা যাইত না। তোমরা এই রকম ডাঙার শামুক হয় ত দেখিয়াছ। ইহারা আমাদেরি মতো
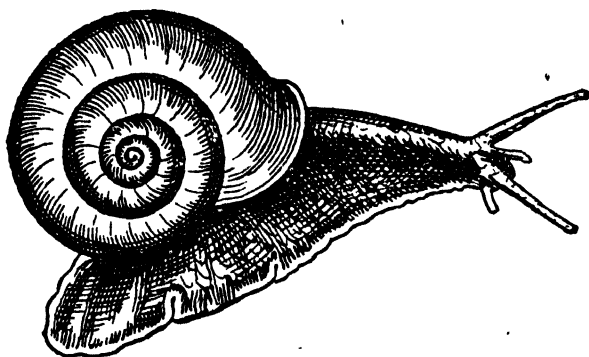
চিত্র ৭৬—ডাঙার শামুক

ফুস্‌ফুস্‌ দিয়া নিশ্বাসের কাজ চালায়। যদি ইহাদের দেহ পরীক্ষা করিতে পার, তবে দেখিবে, ইহাদের ঘাড়ের কাছে একটা লম্বা ফাটাল আছে। ঐ ফাটাল দিয়া বাহিরের বাতাস তালে তালে ইহাদের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে। জলের শামুকদের মধ্যেও দুই এক জাতি এই রকমে নিশ্বাস লয়। আমাদের দেশের ডোবা ও ধানের ক্ষেতের অল্প জলে এক রকম শামুক দেখা যায়। ইহারা জল ও স্থল দু'জায়গাতেই চরিয়া বেড়ায়। তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা ঠিক ঐরকমের। তোমরা বর্ষার শেষে এই শামুক ধরিয়া একটি পাত্রে রাখিয়া দিয়ো,—দেখিবে, সে মাঝে মাঝে পাত্রের উপর হইতে খোলার ভিতরে বাতাস ভরিয়া লইতেছে এবং কিছুক্ষণ জলে ভাসিয়া

আবার ডুব দিতেছে। বাতাসে খোলা ভর্ত্তি থাকিলে দেহটা হাল্‌কা হয়। তাই তখন ইহারা অনায়াসে ভাসিতে পারে।

আমরা এ-পর্য্যন্ত কেবল পুষ্করিণী ও ডাঙার শামুকদের কথা বলিলাম। এখন তোমাদিগকে সমুদ্রের শামুকদের কথা বলিব। কড়ি ও বাজাইবার শাঁখ তোমরা দেখিয়াছ। এগুলি সমুদ্রের শামুকদের গায়েরই খোলা। তোমরা যে শাঁখ বাজাও, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, শঙ্খের খোলা ঠিক গুগ্‌লি বা শামুকের খোলার মত নয়। ইহার এক দিক্‌টা যেন সরু হইয়া নলের মত হইয়াছে। কড়ি পরীক্ষা করিলেও তোমরা তাহাই দেখিতে পাইবে, কিন্তু কড়ির খোলা লেজের মত সরু হইয়া আসে না। ইহার এক প্রান্ত যেন একটু কাটা থাকে। সমুদ্রের শামুকদের খোলায় এই সরু অংশের প্রয়োজন কি, তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। উহাদের গায়ের পর্‌দা নলের আকারে ঐ পথ দিয়া দেহের বাহিরে আসে। শঙ্খেরা ঐ পথ দিয়া দেহের ভিতরে জল প্রবেশ করায়। এই রকমে জলে-মিশানো বাতাসের অক্সিজেন্‌ টানিয়া লইয়া উহারা বাঁচিয়া থাকে।

শঙ্খ বা কড়ি দেখিতে সুন্দর। কিন্তু যখন জীবন্ত থাকে, তখন ইহাদের দেখিয়া ছোট জলচর প্রাণীরা ছুটিয়া পলাইয়া যায়। আমাদের পুষ্করিণীর শামুক-গুগ্‌লিরা শেওলা বা জলের পচা জিনিস খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু

শঙ্খের দল মাংস ভিন্ন অন্য কিছু খায় না। সমুদ্রের ছোট শামুক বা ঝিনুকরা উহাদের অত্যাচারে অস্থির হইয়া পড়ে। ছুতোর মিস্ত্রিরা আগর দিয়া কি রকমে কাঠে ছিদ্র করে, তোমরা বোধ হয় তাহা দেখিয়াছ। মিস্ত্রিরা এই যন্ত্র দিয়া

চিত্র ৭৭—কড়ি

খুব শক্ত কাঠেও অল্প সময়ের মধ্যে ছিদ্র করিয়া দিতে পারে। শঙ্খদের মুখে আগরের মত এক একটা শুঁড় লাগানো থাকে। ইচ্ছা করিলে সেটিকে ইহারা হাতীর শুঁড়ের মত যে দিকে খুসী নাড়াইতে পারে। হাতীর শুঁড়ে দাঁত লাগানো থাকে না। শঙ্খের শুঁড়ের শেষে করাতের দাঁতের মত অনেক ধারালো দাঁত সাজানো থাকে। শামুক গুগ্‌লি, ঝিনুক বা খোলাওয়ালা অপর প্রাণী কাছে পাইলেই, তাহারা সেই শুঁড় দিয়া খোলাতে ছিদ্র করিয়া ফেলে এবং সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া সকল প্রাণীর নরম মাংস খাইয়া ফেলে। শুঁড়ের ধার এত বেশি যে, তাহা দিয়া পাথরের মত শক্ত জিনিসেও ছিদ্র করা যায়। ঝিনুকের খোলার মত গোলাকার ছোট পাথর সমুদ্রের তলায় অনেক পড়িয়া থাকে। শঙ্খের দল ঝিনুক ভাবিয়া প্রায়ই এই সকল পাথরের গায়ে ছিদ্র করিয়া ফেলে। এই রকম ছিদ্রযুক্ত অনেক পাথর সমুদ্রের তলায় পাওয়া যায়। যাহা হউক

শঙ্খদের শুঁড়ে কত ধার, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। ইহারা সামান্য প্রাণী নয়।

কড়ির গা কেমন চক্‌চকে এবং তাহাতে কেমন সুন্দর রঙ্‌ লাগানো থাকে, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। লক্ষ্মীপূজার সময়ে যে বড় বড় কড়ি সাজাইয়া রাখা হয়, দেখিলে মনে হয় যেন সেগুলিতে রঙ্‌ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জীবন্ত কড়ির গায়ে একটা সরু চাম্‌ড়া লাগানো থাকে। এই জন্য উহাদের খোলায় কোনো আঘাত লাগিতে পারে না। ইহাতেই কড়ির উপরটা বেশ চক্‌চকে থাকে।

শামুক, গুগ্‌লি, শঙ্খ ও কড়িদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। ইহাদের ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হয়। কাহারো আবার দেহের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। কোনো কোনো জাতি, পতঙ্গদের মত নিরাপদ জায়গায় ডিম পাড়িয়া চলিয়া যায়। আবার কোনো শামুককে এক রকম থলিতে ডিম পাড়িতে দেখা যায়।

শামুক, গুগ্‌লি, শঙ্খ প্রভৃতির দেহের উপরে একটিমাত্র খোলা থাকে। গুগ্‌লি ও শামুকের খোলার এক-একটা ঢাক্‌নি থাকে বটে, কিন্তু ইহাকে খোলা বলা যায় না। ডাঙার শামুকদের খোলায় প্রায়ই ঢাক্‌নি দেখা যায় না। শীতকাল আসিলে শরীর হইতে এক রকম রস বাহির করিয়া ইহারা ঢাক্‌নি প্রস্তুত করিয়া লয় এবং শত্রুদের ভয়ে খোলা ও ঢাক্‌নি দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মড়ার মত পড়িয়া থাকে। তোমরা যদি

খুব শীতের সময়ে ডাঙার শামুক কাছে পাও, তাহা হইলে উহার ঢাকনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়ো। দেখিলে মনে হইবে, যেন শামুক মরিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। সমস্ত শীতকাল ধরিয়া ইহারা কিছুই খায় না। আগে বেশি রকমে খাইয়া যে বল সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাতেই উহাদের জীবনের কাজ দুই তিন মাস অনায়াসে চলিয়া যায়, এবং ঢাক্‌নির ফাঁক দিয়া যে একটু বাতাস ভিতরে প্রবেশ করে, তাহাতে নিশ্বাসের কাজও এক রকম চলিতে থাকে।

এখন তোমাদিগকে ঝিনুকদের কথা বলিব। ইহাদের দেহের উপরে দুইখানা খোলা থাকে। সাধারণ শামুকদের যেমন মুখ, শুঁয়ো, চোখ ইত্যাদি আছে; ইহাদের তাহা নাই। তোমাদের পুকুর হইতে একটা ঝিনুক আনিয়া কাঁচের পাত্রে রাখিয়া পরীক্ষা করিয়ো। দেখিবে, দুই খোলার জোড়ের জায়গা হইতে ঠোঁটের মত কতকটা মাংস বাহির হইয়াছে।

ঝিনুকের খোলা গ্রীষ্মকালে পুকুরের জল শুকাইলে অনেক পাওয়া যায়। তোমরা দু'খানা খোলা লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে, খোলার ভিতরে এক একটি করিয়া দাগ আছে। ঐ দাগের জায়গায় ঝিনুকদের দেহের মোটা মাংসপেশী লাগানো থাকে। ইহা সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিয়া ঝিনুকেরা ইচ্ছামত খোলার মুখ খুলিতে বা বন্ধ করিতে পারে।

দেহের মধ্যে ঝিনুকদের কান্‌কো আছে এবং তাহার সহিত কতকগুলি শুঁয়োর মত অংশ লাগানো আছে।

এই গুলিকে নাড়িলে খোলার ফাঁক দিয়া কান্‌কোর উপরে জলের স্রোত বহিতে থাকে। ঝিনুকেরা এই রকমে কান্‌কোর সাহায্যে জলে-মিশানো অক্সিজেন্‌ টানিয়া লয়। সাধারণ শামুকদের মত ঝিনুকের দল পেটুক ও হিংস্র নয়। জলের স্রোতের সঙ্গে যে জলচর পোকা-মাকড় উহাদের দেহের ভিতর প্রবেশ করে, ঝিনুকেরা তাহা খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে।

অন্য শামুকদের মতই ঝিনুকেরা ডিম পাড়ে। কিন্তু ইহাদের ডিম বড় অদ্ভুত। প্রত্যেক ডিমের গায়ে এক-একটা শুঁয়ো লাগানো থাকে। মায়ের পেট হইতে পড়িয়া শুঁয়ো নাড়িয়া সেগুলি ভাসিয়া বেড়ায় এবং শেষে জলের তলায় পড়িয়া যায়। জলের তলাতে ডিম ফুটিলে ঝিনুকের বাচ্চা বাহির হয়।

আমাদের দেশে সকলে ঝিনুকের মাংস খায় না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় এই মাংসের বড়ই আদর। ঐ সকল দেশে হাজার হাজার লোক সমুদ্র হইতে ঝিনুক ধরিয়া বাজারে বিক্রয় করে। আমেরিকার এক নিউ-ইয়র্ক সহরেই বৎসরে প্রায় পঞ্চাশ্‌ লক্ষ টাকার ঝিনুকের মাংস বিক্রয় হয়।

সমাপ্ত

পোকা-মাকড়